







মধ্যশিক্ষা পৰ্য্যন্ত কর্তৃক নির্দেশিত সিলেবাস অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে  
নবম ও দশম এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের  
নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য লিখিত ।

## প্রাথমিক বাণিজ্যিক তত্ত্ব

• ( নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী )

স্রীরথীন্দ্রনাথ সেন এম. এ. ; বি. কম.

অধ্যাপক, সিটি কলেজ ( বাণিজ্য বিভাগ ), কলিকাতা ; ভূতপূর্ব অধ্যাপক  
দেশবন্ধু গার্লস্ কলেজ, কলিকাতা ; ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, ত্রিপুরা ;  
জঙ্গীপুর কলেজ, মশিদাবাদ : ও পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫১১ এ, কলেজ রো,

কলিকাতা—২



প্রকাশক :

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৫।১ এ, কলেজ রো,

কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

মুদ্রাকর :

শ্রীরতিকান্ত ঘোষ

১৭।১, বিম্বু পালিত লেন

দি অশোক প্রিটিং ওয়ার্কস

কলিকাতা—৬

## ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকে সিলেবাস-নির্দিষ্ট বিষয় সমূহ যথাসাধ্য সহজভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষার জটিলতা কোথাও যেন বিষয় বস্তু উপলব্ধির অন্তরায় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি এবং পরিভাষা সংক্রান্ত যে অসুবিধা এই জাতীয় পুস্তক রচনায় বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় তাহাও যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হওয়ায় কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও অগ্ৰাণ্য ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে পুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিব।

এই পুস্তক রচনার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিয়া, বিষয়বস্তুর বিচারের পরিকল্পনা দিয়া এবং আরও নানাভাবে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য দান করিয়াছেন আমার সহকর্মী ও বন্ধু অধ্যাপক শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসু। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক রচনা করা সম্ভব হইত না।

যাহাদের জন্য এই পুস্তক রচিত হইল তাহাদের প্রয়োজনে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম অধ্যায় :</b>	
কারবার সংগঠনের গোড়ার কথা	১—১৬
মাল্হুয়ের অভাববোধ ও তাহার তৃপ্তি	
<b>দ্বিতীয় অধ্যায় :</b>	
বাণিজ্যের নানাপ্রকার বিভাগ	১৭—২৮
<b>তৃতীয় অধ্যায় :</b>	
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	২৯—৫১
<b>চতুর্থ অধ্যায় :</b>	
পণ্য জন্ম বিক্রয়	৫২—৬২
<b>পঞ্চম অধ্যায় :</b>	
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত নথিপত্র ও বাণিজ্যিক পত্রাদি	৬৩—৭৭
<b>ষষ্ঠ অধ্যায় :</b>	
মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা	৭৮—৯২
<b>সপ্তম অধ্যায় :</b>	
কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ	৯৩—১৬৩
<b>অষ্টম অধ্যায় :</b>	
কারখানা ও অফিস সংগঠন	১৬৪—১৮৮
<b>নবম অধ্যায় :</b>	
ব্যাক ব্যবসায়	১৮৯—২০৪
<b>দশম অধ্যায় :</b>	
বীমা	২০৫—২১৯
<b>একাদশ অধ্যায় :</b>	
যানবাহন ব্যবস্থা	২২০—২৩১

## একাদশ শ্রেণী

বৈদেশিক বাণিজ্য	১—৪৮
-----------------	------

বাজার

মালগুদাম

বিশেষ ও বিদেশি কার

সরকার এবং বাণিজ্য জ

## দ্বিতীয় খণ্ড

### প্রথম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য উহার প্রকৃতি ও কারণ	...	১
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি	...	৩
ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য	...	৮
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে পত্রাদি	...	১২
বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজ-পত্র এবং সংজ্ঞাপ্রকরণ	...	১৮
বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক	...	২৪
শুল্ক নির্ধারণের পদ্ধতি ও ভিত্তি	...	২৯
বাণিজ্য ও ছাড়	...	৩৩
মুদ্রার বিনিময়ের হার	...	৩৮
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের স্ববিধা ও অস্ববিধা	...	৪৪
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূল্য প্রদান ও বিনিময়-সংক্রান্ত প্রথা	...	৪৫
অগ্রিম চুক্তি	...	৫৬

### দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজার	...	৫৩
বাজারের শ্রেণী বিভাগ	...	৫৩
শেয়ার বাজার	...	৫৬
শেয়ার বাজারের বিভিন্নরূপ ও ফাটকাবাজ	...	৬৮
শেয়ার বাজারে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দ	...	৭০
ফাটকা লেনদেনের গুণ ও দোষ	...	৮৫
অগ্রিম চুক্তি আইন	...	৮৭
নৌলাম বাজার	...	৯০

### অধ্যায়

মাল ওদাম

## চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়েব দক্ষতা	...	১০
বিজ্ঞাপনের শ্রেণী বিভাগ	...	১০০
বিজ্ঞাপনের স্থবিধা ও কাযদাবিতা	...	১০১
বিক্রয় দক্ষতা বা বিক্রয়বাব	...	১১১

## পঞ্চম অধ্যায়

সবকাব ও বাণিজ্যনীতি	....	১১৬
শিল্পনীতি গ্রহণ	...	১১৭
শিল্প ও বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ	...	১১৮
জাতীয়করণেব স্থবিধা	..	১১৯
শিল্প সংবক্ষণ নীতি	....	১২৭
শিল্প, বাণিজ্য ও সবকাবী বিভাগ	...	১৩৩
বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তর	...	১৩৩
অর্থমন্ত্রী দপ্তর	...	১৩৫
শ্রম ও নিয়োগ-মন্ত্রীদ দপ্তর	...	১৩৬
রেলওয়ে মন্ত্রী দপ্তর	...	১৩৬
পরিবহণ ও সংযোগবক্ষাব মন্ত্রীদ দপ্তর	...	১৩৬
প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রী দপ্তর	..	১৩৭
শিক্ষা দপ্তর	...	১৩৭
আভ্যন্তরীণ শাসন মন্ত্রী দপ্তর	...	১৩৭

# SYLLABUS

## ELEMENTS OF COMMERCE

(Including Business Method and Correspondence)

Classes IX & X

### 1. Introductory :

Human needs and their satisfaction : Division of Labour ; Specialisation and Exchange ; National and international inter-dependence and co-operation through Commerce ; Complex process through which human wants are satisfied giving rise to various types of business activities and occupations.

Classification of business activities and service—Industry, trade and commerce ; Distribution of the Working population over these. Meaning of the word “Commerce” : Commerce in a broader sense comprises all those activities which are concerned with distribution of the goods and services so that these may reach the consumers with a minimum of inconvenience.

### 2. Divisions and Sub-divisions of Commerce :

Trade, transport, banks, insurance, warehousing, advertising, stock and commodity markets, post office. Direct services specially professional and Governmental services for regulation and information.

(General idea about the purposes and functions is only to be given with reference to conditions in West Bengal and India.)

### 3. Home Trade :

(a) **Retail** : Function of the retailer—factors to consider in organising a retail business—types of retail business ; Unit retailer, Multiple shop, Chain store, One price shop, Departmental store, Mail Order house. Retail Co-operative Society.

(b) **Wholesale Trade** : Function of the wholesaler—His role as a middleman—Organisation of the wholesale business.

(The purposes and functions of the different units of trade are only to be discussed and not the procedures and methods adopted.)

### 4. Buying and Selling Goods :

(a) Three aspects of a buying-selling transaction—delivery of goods and payment.

(b) **Goods** : Quality, Trade Mark or Brand, Unit of sale, Packing, etc.

(c) **Delivery of Goods** : Time of delivery—Mode of carriage—distance, speed and cost of carriage determining the mode. Firm's home delivery service, railway, road, steamer and air.

(d) **Payment** : (i) Price-Catalogue and price list, trade and cash discounts.

(ii) Time of Payment—Ready, prompt, credit, deferred; instalment, hire purchase.

(iii) Method of Payment—Cash, postal orders, telegraphic money orders, money orders, treasury chalang, cheques, bills of exchange or hundi, promissory notes, bank drafts.

Common trade terms like quotation, tender, contract, etc. are to be explained.)

## **5. Illustrative Development of a transaction in Home Trade and Documents and Correspondence Used :**

Letter of enquiry, reply, orders, packing sheet, invoice and statements, debit or credit notes, letter of remittance and the forms of the instruments of remittance, receipt.

## **6. Capital, Turnover and Profit :**

(a) Functions, types and forms of capital for a trader—means of raising capital.

(b) Turnover—means of increasing turnover, buying for a large turnover.

(c) Profits—Gross and net profits, Marking goods or "Mark up", ascertained gross profits over a period—net profit as a percentage on turnover—gross profits as a percentage on turnover expense as a percentage on turnover.

(d) Profits and Capital.

## **7. Different Forms of Business Units : Sole trader—Family business, Partnership, Private and Public Limited Companies—Government Companies, Co-operative Societies—State Undertakings.**

The distinctive features of each with particular reference to ownership, methods of raising capital and distribution of profits or surplus.

(The idea of limited liability to be introduced and the types of capital and/or shares are to be briefly explained. The details of organisation should be avoided and only the broad purposes of these different forms are to be discussed.

In the case of companies a brief idea about Memorandum of Association and Articles of Association, Prospectus and the divorce between ownership and control are to be indicated.)

## **8. Internal Organisation of a Merchant's Office :**

(i) The functions of the office ; a general view of its work. The work in a small office. The work in a large office. The allocation of duties and the services performed by Juniors.

(ii) Various departments and sections—Cash, Accounts, Purchase, Sales, Despatch, Record, Filing, Stores, etc.

• (iii) **Office Routine** : Treatment of incoming letters, receiving orders, indexing of letters, pre'cis-writing. office notes, despatch. filing, etc.

(iv) **Communications** : Telephones, Teleprinters, Telegrams, Cablegrams, Simple codes, Phonograms.

(v) **Commercial Correspondence** : Features of business letters. Need for simplicity and precision. Drafting of advertisements, announcements and telegrams, notices of meetings and minutes.

(vi) **Usual office equipment and organisation of office works** : Typewriters, Duplicating Machines, Telephones, various types of files, Dictaphone, Speakophone, Franking Machines, Stock recorders, various calculating machines and accounting machines.

(vii) **Postal Communication and Services** : As means of communication and making payments. General Knowledge about the rules as to posting, registration, parcel, express delivery, etc.

## **9. Banking :**

(i) **Saving Banks** ; Saving Bank Accounts :

(ii) **Commercial Banks** : Functions—Deposit and current A/cs.—Loans and Overdrafts. Cheque system—various kinds of cheques. Banking Clearing system.

## **10. Transport :**

Development and functions of transport—suitability of different forms of transport ; Railway, Road, Inland Waterway, Sea and Air.

A brief outline of the procedure for booking goods for Railway transport and the documents used.

## **11. Insurance :**

• General principles underlying different types of insurance—Fire, Marine and Accident as means for spreading of business risks Fidelity Guarantee Bond. Cash in transit Insurance, Workmen's Compensation, Employees' State Insurance. The Procedure followed in taking out a policy and in making a claim.



The idea of 'insurable interest' and of utmost good faith in Insurance contracts,

## Class XI

**1. Reasons for Foreign Trade :** Nature, extent and general pattern of foreign trade of India—Outline of the general procedure in the Import and Export of goods, Organisation of Foreign Trade—Document used in Import and Export Trade.

Customs and Exercise Duties *Advalorem* and Specific basis of levy. Purpose of the levies. Different types of invoices on the basis of apportionment of delivery cost between the importer and exporter.

Method of payment in foreign trade—Bills of Exchange, Letters of Credit.

**2. Special Markets**—Commodity Exchanges, Auctions and Stock Market.

**3. Warehousing of Goods :** Services of a warehouse and their importance in business.

**4. Salesmanship and Advertisement :** Personal qualities of a good salesman.

Objects of advertisement and publicity—different media of advertisement.

**5. Government and the Business World :** Influence of Government over business—Maintenance of security Promotion of goodwill at home—Encouragement to business enterprises—Passing laws to facilitate business, Equitable taxation, Establishment of a sound monetary system—Organisation of Departments to guide regulate and control business activities.

(Some idea about the fact that there are various laws relating to business and there are various Government departments directly connected with the business world, should be provided to the pupils. It should be indicated how State control aids, and owns commercial enterprises.)

---

# বাণিজ্যিক তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

কারবার সংগঠনের গোড়ার কথা

মানুষের অভাববোধ ও তাহার তৃপ্তি

(Human wants and their satisfaction)

মানুষের সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাহার অভাববোধ এবং অভাব দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা। বর্তমান সভ্যতার যে সকল সুখ-সুবিধা আমরা ভোগ করিতেছি, যে সভ্যতার সৌধ নির্মাণ করিবার জন্ত মানুষ দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সেই সভ্যতার স্বাদ আমরা পাইতাম না যদি মানুষের অভাববোধ না থাকিত। কিন্তু অভাবের প্রকৃতি এবং এই অভাব-নিবৃত্তির উপায় যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। সুতরাং সভ্যতার আদিকালে মানুষের অভাব ও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে বর্তমান যুগের অভাব ও তাহার প্রকৃতির অনেক পার্থক্য। একথা সত্য হইলেও সভ্যতার সব যুগের সামাজিক মানুষের গোটাকতক অভাব দেখা যায়, যাহাদের মৌলিক অভাব বলা চলে। আহাৰ, বাসস্থান ও পরিধেয়র অভাব এই প্রকার মৌলিক অভাব। ইহাদের প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হইলেও ইহারা চিরকালের এবং সৃষ্টির আদিকাল হইতেই ইহাদের কোনও না কোন একটি নিবৃত্তির জন্ত মানুষকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। মানুষের অভাব বস্তুগত (material) ও অবস্তুগত (non-material) উভয়বিধ হইতে পারে। যেমন, খাদ্য-বস্তুর অভাব বস্তুগত অভাব, সেইরূপ সঙ্গীত উপভোগের আকাঙ্ক্ষাকে অবস্তুগত অভাব বলিতে পারি। মৌলিক অভাব ছাড়াও মানুষের আরও নানাবিধ অভাব আছে এবং বলিতে গেলে মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই এবং নাই বলিয়াই এ কথা সত্য যে, যতদিন সভ্যতার সীমার মধ্যে মানুষ জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার অতৃপ্তি থাকিবে, আর নূতন নূতন সৃষ্টির মাধ্যমে, অতৃপ্তির নিবৃত্তির জন্ত মানুষের দিবারাত্রির চিন্তা, চেষ্টা এবং শ্রমেরও শেষ হইবে না।

সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের অভাবের সীমা না থাকিলেও পৃথক পৃথক ভাবে কোন মানুষের কোনও একটি বস্তুর অভাব অসীম নয়। কারণ কোনও মানুষের কোনও একটি বস্তুর জন্ত অভাববোধের তীব্রতা

প্রথম সংগ্রহের পরে কতকটা কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তির ভাল কাপড় একটিও নাই, প্রথম জোড়া সংগ্রহের পরে দ্বিতীয় জোড়া কাপড়ের জন্ম সেই ব্যক্তির চাহিদার তীব্রতা অনেকটা কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। আর পর পর কয়েক জোড়া কাপড় ক্রয় করিবার পর সাময়িকভাবে তাহার কাপড়ের অভাব না থাকাটাই সম্ভব। তখন তাহার অল্প বস্তুর অভাব হইবে এবং সে তাহা পূরণের জন্ম সচেষ্ট হইবে।

মানুষের এই অভাববোধ হইতেই চাহিদার সৃষ্টি। কিন্তু কোন ব্যক্তির কোনও বস্তুর জন্ম চাহিদা তখনই যথার্থ হয় যখন সেই চাহিদা মিটাইবার মত তাহার সামর্থ্য থাকে। আমরা ত অনেক সময় নানারূপ স্থখ সন্তোগের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু তাহার জন্ম যথার্থ কোন চাহিদা থাকে কি? যেমন, কলিকাতায় ট্রামে বাসে বুলবুল অবস্থায় চলাচল করিবার অশেষ দুর্গতির মধ্যে আমরা অনেকেই সঙ্কতিহীন হইয়াও যদি নিজস্ব মোটরযানে গমনাগমনের স্বপ্ন দেখি তাহা হইলে ইহাকে যথার্থ অভাব বলিতে পারি না। কেননা এই অভাব বোধ অবাঞ্ছন্য অর্থাৎ এই অভাবের তৃপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, ধরিয়া ও যদি লই যে, কলিকাতায় হাজার হাজার নতুন মোটর গাড়ী উৎপাদিত হইল কিন্তু সেট গাড়ী ক্রয় করিবার ক্ষমতাত আমাদের নাই। সুতরাং অভাব এবং তাহার তৃপ্তির সম্ভাবনা—ইহাদের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক। যেখানে অভাব আছে সেখানে তাহার পূরণের যথাযোগ্য সামর্থ্যও থাকিবে। তাহা না হইলে সে অভাবকে অভাব বলিব না। (Economically effective demand is one which is backed by the means to purchase commodity for the satisfaction of the demand).

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং দেশগত ও কালগত দূরত্বের ক্রমহ্রাসের ফলে অভাবের প্রকৃতির পরিবর্তন :

আদিমকালে মানুষ যখন একক ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল তখন তাহার অভাবও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার একক চেষ্টাতেই সেই অভাব পূরণ করা হইত। আহাৰ্যের অভাবই তখন সর্বব্যাপক ছিল। বাসস্থানের অভাবের তীব্রতা ছিল তখন অনেক কম। পরিবেশের অভাব ত ছিলনা বলিলেই চলে। কিন্তু সে যুগ অনেক কাল হইল গত হইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইতিহাসের নানা যুগবিবর্তনের দ্বারা অনুসরণ করিয়া আজ মানুষ যে স্তরে উপনীত হইয়াছে সেখানে তাহার আর একক জীবন যাপন সম্ভব নয়।

মানুষের আজ অনেক অভাব এবং সুসজ্জত সামাজিক জীবনের প্রয়োজনেই তাহার এই বহু সংখ্যক অভাব। আজ শুধু আহাৰ, বাসস্থান ও পরিধেয়র অভাবই মানুষের সব অভাব নয়। ইহা ছাড়াও অগ্ৰ অভাব আছে, যাহা পূরণ না করিলে সামাজিক জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান এই অভাব পূরণ করা মানুষের একার পক্ষে আর সম্ভব নয়। বহুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই অভাব পূরণের উপায় নাই। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতা আজ জীবন ধারণের তাগিদেই অবশ্যস্বাবী। কিন্তু এই নির্ভরতা ও সহযোগিতা নিতান্তই সহজ সরল নয়। ইহার প্রকৃতি বিচিত্র ও জটিল। একে এই বিচিত্র ও জটিল প্রকৃতির অন্তর্শীলন করিলেই বর্তমান সমাজবদ্ধ মানুষের অভাব কত বিচিত্র, এবং কত বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অভাবের তৃপ্তি সাধন হইতেছে ( অর্থাৎ উৎপাদন কি ও কেন, ব্যবসায় কি এবং কোন উপায়ে ইহা সংঘটিত হয় ) তাহার একটা পূর্ণাঙ্গচিত্র পাওয়া সম্ভব।

**উৎপাদনের মাধ্যমে অভাব পূরণ :-- ( Satisfaction of wants through Production of wealth )**

আদিম যুগে মানুষের অভাব যখন নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল তখন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিয়াই তাহার সে অভাব মিটিত। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব নয়। এখন কেবল মাত্র প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করিলে চলে না। এখন অভাব পূরণের জন্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদন অপরিহার্য। এই ‘উৎপাদন’ কথাটি একটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। উৎপাদনের অর্থ উপযোগিতা সৃষ্টি। উৎপাদন ‘উপযোগিতা’ সৃষ্টি করে—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদের আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে ; যেমন, তুলা হইতে কাপড় তৈরি করিয়া,

(২) স্থান-গত দূরত্ব হ্রাসের মাধ্যমে, যেমন, আমেদাবাদের কাপড় কলিকাতায় যোগান দিয়া।

(৩) কালগত ব্যবধান হ্রাসের মাধ্যমে, যেমন, ভবিষ্যতে কোন বস্তুর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে উৎপাদন করিয়া।

**উৎপাদনের উপাদান ( Factors of Production )**

অভাব মিটাইবার জন্তই উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন করিতে হইলে

কয়েকটি বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। এই উপাদানগুলি হইল—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ বা কাঁচামাল ( Natural resources, raw-materials )

(২) শ্রম ( Labour )

(৩) মূলধন ( Captial )

(৪) উদ্যোগ ( Enterprise ) বা সংগঠন ( Organisation )

১। প্রাকৃতিক সম্পদ—প্রকৃতি অরূপ হাতে আমাদের অভাব মিটাইবার জন্ত নানাবিধ সম্পদ দান করে। প্রকৃতির এই দান না থাকিলে মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হইত। অরণ্যে, খনিতে, নদী ও সমুদ্রে, আবহাওয়ায় সর্বত্র এই প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়াইয়া আছে। কিন্তু যে আকারে আমরা এই সম্পদ পাই তাহাতেই আমাদের অভাব মেটে না। ইহাকে অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা কাঁচামাল বলিতে পারি। আবার, ব্যাপক ভাবে, যে দ্রব্য দ্বারা মানুষের অভাব মিটাইবার উপযোগী বস্তু উৎপাদন করা হয় তাহাকে কাঁচামাল বলা চলে। যেমন, বস্ত্র-বয়নের জন্ত চাই ‘তুলা’। তুলা প্রকৃতি হইতে আসত এক অপরিবর্তিত সম্পদ বা কাঁচামাল। কিন্তু তুলাকে দ্বারা আমাদের বস্ত্রের অভাব মেটে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুলাকে বস্ত্রে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই এই অভাব মিটিবে। এই রূপান্তরের জন্ত প্রয়োজন শ্রমের। সুতরাং উৎপাদনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শ্রম।

২। শ্রম—শ্রমের অর্থ সর্বপ্রকার কায়িক, বাস্তবিক বা মানসিক ক্রিয়া যাহার দ্বারা ‘সম্পদের’ সৃষ্টি করা হয়। তুলা হইতে বস্ত্ররূপ ‘সম্পদ’ সৃষ্টিতে মানুষের কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ যে কার্যকলাপ তাহাকে ‘শ্রমের’ পর্যায়ভুক্ত করা হইবে।

৩। মূলধন—‘প্রাকৃতিক সম্পদ’ এবং ‘শ্রম’ এই দুইটি উৎপাদনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইলেও অর্থনৈতিক উন্নতির গোড়ার দিকেই আরও যে একটি উপাদানের গুরুত্ব দেখা দেয়, তাহা মূলধন।

শুধু হাতে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যের উপযোগিতা অনেকক্ষেত্রে অনেকগুণ বেশি, এই সত্য মানুষ অনেক পূর্বেই নুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং উৎপাদনের গোড়ার দিকের

## বাণিজ্যিক উৎপাদন

ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও না কোনও প্রকার যন্ত্র, তাহা যতই সহজ সরল হোক না কেন, তার প্রয়োগে উৎপাদনের ব্যবস্থা মাহুষ করিয়া লইয়াছিল। এই যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা বস্তুর অধিক উৎপাদন ও ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি “(More production and increased utility)” সম্ভব হইয়াছে। এই যন্ত্রকে আমরা মূলধনের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি।

মূলধন হইল মানুষের অর্জিত সম্পদের সঞ্চিত অংশ যাহা সে আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্ত বিনিয়োগ করে।

৪। উদ্যোগ বা সংগঠন :—উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তার প্রয়োজন বর্তমান যুগেই বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা একতাই জটিল যে উৎপাদনের জন্ত কাঁচামাল, শ্রমিক ও মূলধন সংগ্রহ করিয়া উহাদের যথাযথ প্রয়োগের জন্ত বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। এইরূপ বিশেষ দক্ষ লোককেই উদ্যোক্তা বা সংগঠক বলা হয়। কাঁচামাল, শ্রমিক ও মূলধন সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ সমন্বয় সাধন করিয়া, নার্বক উৎপাদনের বিধি ব্যবস্থা করাই উদ্যোক্তার কাজ।

**শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ ( Division of Labour and Specialisation ) :**

মানুষ যদি তাহাব সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেই উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে শ্রমবিভাগের কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের অভাব এত বিচিত্র ধরণের এবং উৎপাদনের ব্যবস্থাও এতই জটিল যে কোন একজন লোকের পক্ষে তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য একাই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এই কারণেই আজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ অপরিহার্য।

প্রাচীনকালে যখন উৎপাদন পারিবারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তখনও শ্রমবিভাগ লক্ষ্য কবা যায়, যদিও এই শ্রমবিভাগ সহজ ও সবল ছিল। তখন পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকিত এবং তাহাদের সম্মিলিত শ্রমের দ্বারা যাহা উৎপাদিত হইত তাহার দ্বারাই সমস্ত পরিবারের অভাব মিটিত। বর্তমানে এই শ্রমবিভাগ অনেক জটিল হইয়াছে। যে কোন বস্তুর উৎপাদন এখন নানান্তরে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। শ্রমিকের সহজাত দক্ষতা ও প্রবণতা, তাহার শিক্ষা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাকে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত করা হয়। অধিক

৫ সের চাউল পাওয়া যায় তাহা হইলে যে ব্যক্তির একটি কাপড় উদ্ধৃত আছে এবং তাহার পরিবর্তে চাউল সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে এমন একজনের সম্মান করিতে হইবে যাহার নিকট ৫ সের বা তদতিরিক্ত উদ্ধৃত চাউল আছে। ৫ সেরের কম চাউলের পরিবর্তে একটি কাপড় বিনিময় করিতে হইলে তাহাতে ক্ষতি, অথচ একটি কাপড়কে ছিঁড়িয়া বিভিন্ন ভাগে ভাগ করাও সম্ভব নয়। ইহা প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার দ্বিতীয় ক্রটি।

(৩) তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও অস্ববিধা-জনক। যেমন, কাপড়, তৈল, লবণ, চাউল ইহাদের পারস্পরিক বিনিময়-হার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। সুতরাং কেহ কাপড়ের পরিবর্তে অন্য বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে চাহিলে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন বিনিময়-হার স্থির করিতে হইবে।

### পরোক্ষ-বিনিময় :—

মানুষের অভাব যত বাড়িয়াছে বিনিময়ের ক্ষেত্রও তত প্রশস্ত হইয়াছে। আর এই বিনিময়-ক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার ক্রটিগুলিও বিশেষ ভাবে অল্পভূত হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে তখন এমন বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছে যাহাতে এই ক্রটিগুলি নাই। বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিনিময়-মাধ্যমের (Medium of exchange) সাহায্যে সকল দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। ইহাকেই পরোক্ষ বিনিময় প্রথা অথবা দেওয়া হইয়াছে। আর বিনিময় মাধ্যমটিকে টাকাকড়ি (Money) বলা হয়। এখন আর কাপড়ের পরিবর্তে খাদ্য-বস্তু সংগ্রহেব প্রয়োজন নাই। এখন কাপড় বিক্রয় করিয়া টাকা পাই আবার সেই টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করি। সুতরাং এই দুইটি বস্তুর মধ্যে সরাসরি আদান-প্রদান না হইয়া টাকার মাধ্যমে হইতেছে। বিনিময়ের মূল সূত্রটি ঠিক থাকিলেও বিনিময়ের আকৃতিতে এখন পরিবর্তন আসিয়াছে।

### প্রত্যক্ষ বিনিময়

দ্রব্য→দ্রব্য

### পরোক্ষ বিনিময়

দ্রব্য→টাকা→দ্রব্য

এখন বিনিময় যদিও দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়, যেমন, কাপড় এবং চাউল, তাহা হইলেও বিনিময়ের রাত্তাটি একটু ঘুরিয়া গিয়াছে। এবং এই ঘুর পথে টাকা আসিয়া দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ দ্রব্য টাকায় রূপান্তরিত হয়, এবং সেই টাকাই আবার অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। আর, এই টাকার আবির্ভাবের পর বিনিময় ব্যবস্থাও আর পূর্বের মত সহজ সরল নাই।

এখন যাহারা দ্রব্য বিনিময় করিতে চায় তাহারা একটি সহজ পন্থা জানে মিলিত হইয়া নিজের নিজের উদ্ভূত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। আবার, সেই টাকার পরিবর্তে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। এই সম্মিলনের স্থানটিকে বলা হয় বাজার।

**জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা :**

• (National and international interdependence and Co-operation.)

মানুষের বহু রকম অভাব আছে এবং এই সকল অভাব পূরণের জন্য মানুষ নানাপ্রকার উৎপাদনকর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, এই অভাব বহু ও বিচিত্র হওয়ার জন্য কোন মানুষের পক্ষেই আজ আর একক প্রচেষ্টার দ্বারা তাহার সকল অভাব মিটান সম্ভব নয়। পারস্পরিক নির্ভরতা আজ অপরিহার্য। মানুষ তাহার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আর স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলিয়াই এই পরনির্ভরতা। এই পরনির্ভরতা যে শুধু একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে একটি সমগ্র দেশের পক্ষেও ইহা সমান সত্য। কোনও দেশ আজ আব স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং দেশের সামগ্রিক অভাব মিটাইবার জন্যও অন্য দেশের উপর নির্ভর কবিতে হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরতা হইতেই দ্রব্য-বিনিময়ের উদ্ভব। আর দ্রব্য-বিনিময়কে অর্থনৈতিক দিক হইতে সৃষ্টভাবে পরিচালিত করিবাব জন্য বিশেষ কাবণেরও প্রয়োজন হইয়াছে।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইতে বিনিময়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই বিনিময় ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। বাজনৈতিক কাবণে সহযোগিতাব অভাব হেতু দ্রব্য-বিনিময় অচল হইয়া পড়িয়াছে এই দৃষ্টান্ত বিবল নয়। সাম্প্রতিক কালে ভাবতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসায় সম্পর্ক ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পারস্পরিক সহযোগিতাব ফলে শুধু বিনিময় ব্যবস্থাই নয়, অর্থনৈতিক কাঠামো স্ফূট করাও সম্ভব। যুদ্ধোত্তর কালে বহু অল্পমত অথবা অর্ধ-উন্নত দেশ উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো স্ফূট করিয়া তুলিতেছে। সহযোগিতাব অভাব দেখা দিলে ভারতবর্ষ তাহার পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে বহু বাধাব সম্মুখীন হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।



**অভাব পূরণ ব্যবস্থার জটিলতা ও বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ :**

**(Complex process through which human wants are satisfied giving rise to various business activities and occupations.)**

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব যেমন বাড়িয়াছে তাহা পূরণের ব্যবস্থার মধ্যেও সেইরূপ নানা জটিলতা দেখা দিয়াছে। অভাব বাড়িয়াছে বলিয়াই আমরা পূর্বে দেখিয়াছি কি ভাবে শ্রম-বিভাগ বিশেষীকরণ ও বিনিময় অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

আদিম-যুগে মানুষের অভাব যখন কম ছিল তখন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও এত জটিলতা আসে নাই। তখন অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। পরবর্তী যুগে দেখা গেল প্রকৃতির দানে মানুষের সব অভাব মেটে না। তখন কৃষি কার্যের দ্বারা ফসল ফলাইয়া অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা হইল। এই ভাবে ক্রমবর্ধমান অভাব মিটাইবার জন্য প্রয়োজন হইল কুটিব-শিল্প, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি। আমরা ইহাও জানি যে বর্তমানে যে কোন দ্রব্য-উৎপাদন নানা স্তরে বিভক্ত। উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তর সম্পূর্ণ না হইলে দ্রব্য ভোগযোগ্য হয় না। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন স্তরে বাহারা নিযুক্ত তাহারাও সম্পূর্ণ দ্রব্যটির ধোন ও না কোন অংশ উৎপাদন করিতেছে। ইহাদের পরোক্ষ উৎপাদন বলা হয়। অর্থাৎ যে উৎপাদনের দ্বারা দ্রব্য সরাসরি ভোগযোগ্য হয় না তাহাই পরোক্ষ উৎপাদন।

বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যেমন জটিলতা আসিয়াছে, উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টনেও ক্ষেত্রেও সেইরূপ নানাবিধ কার্যকলাপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। উৎপাদন-স্থান এবং ভোগ-স্থানের মধ্যে দূরত্ব অধিক হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্য স্বল্পভাবে বণ্টনের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য উৎপাদনের পরেই সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রব্যের বিলি ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অথচ পচনশীল দ্রব্য তাড়াতাড়ি বণ্টন না করিলেও ক্ষতি অনিবার্য। সুতরাং সে ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের সহস্র বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে প্রয়োজনবোধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আবার অনেক সময় ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দ্রব্য-উৎপাদনের পর কিছুকাল সে দ্রব্য মজুদ রাখিতে হয়। দ্রব্য মজুদ রাখিবার জন্য গুদামের প্রয়োজন। যে সকল ব্যবসায়ী দ্রব্য ক্রয় করিয়া

তাহা ভোগস্থানে বটন করে, দ্রব্য বিক্রয় না করা পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিয়োজিত অর্থ ফেরৎ পায় না। অথচ দ্রব্য গুদামজাতকরণের জন্ত অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক-সংগঠন সরবরাহ করে। এই সব আর্থিক-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও সে ক্ষেত্রে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিলিব্যবস্থা আর আজ পূর্বের মত সহজ সরল নাই। ইহা খুবই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

### মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ :

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে কি ভাবে পরোক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে বর্তমানে মানুষ তাহার অভাব পূরণ করে। পরোক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় একটা সঞ্চয়নগ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যমের প্রয়োজন। এই বিনিময় মাধ্যমকে আমরা টাকা-কড়ি ( Money ) এই আখ্যা দিয়াছি। অভাব পূরণের জন্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই টাকা-কড়ির প্রয়োজন এবং ইহার পরিবর্তে আমরা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি। সুতরাং সমাজে সকলেই এখন কোনও একটা বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিয়া টাকাকড়ি উপার্জনের চেষ্টা করে।

উপরিউক্ত বৃত্তি বা পেশাকে সাধারণত ৩টি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

#### ১। প্রাথমিক স্তরের বৃত্তি ( Primary Occupation ) :

প্রাথমিক বৃত্তিধারী প্রকৃতি হইতে দ্রব্য-সংগ্রহের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে। কিন্তু প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত সেই সকল দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া ইহাদের ভোগযোগ্য করিয়া তুলিবার কাজ তাহাদের নয়। এই রূপ কাজে প্রাকৃতিক প্রভাবই বেশী কার্যকরী, মানুষের চেষ্টার প্রভাব গৌণ। যেমন, যাহারা খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের কাজে ব্যাপৃত অথবা মাঠে যাহারা চাষ করিয়া ফসল ফলায় অর্থাৎ যাহারা কৃষিজীবী, তাহাদের বৃত্তিকে প্রাথমিক বৃত্তি বলা হয়। খনিতে খনিজ না থাকিলে, জমিতে উর্বরতা না থাকিলে অথবা প্রাকৃতিক অবস্থা অমুকুল না হইলে মানুষের প্রচেষ্টায় এই বৃত্তি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

২। দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তি ( Secondary Occupation ) : প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া ভোগযোগ্য দ্রব্যে পরিণত করিবার কাজে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের বৃত্তিকে দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তি এই আখ্যা দেওয়া যায়। শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপ বৃত্তিধারী। কেননা শিল্পে কৃষিজ বা খনিজ দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের ভোগযোগ্য করা হয়।

৩। তৃতীয় স্তরের বৃত্তি ( Tertiary Occupation ) : সমাজে এমন বৃত্তিধারী আছে যাহারা কোন দ্রব্য উৎপাদনের (Material goods) কাজে ব্যাপৃত নয়। মানুষের অবস্তুগত অভাব (non material wants) পূরণের জন্তেই এই শ্রেণীর লোক নিজেদের শ্রম নিয়োগ করে। যেমন, সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষক, ডাক্তার এই শ্রেণীর বৃত্তিধারীরা কেহই বস্তু (Material goods) উৎপাদন করেনা। ইহাদের শ্রম বেশীরভাগ মানসিক এবং এই প্রকাণ্ড শ্রমজাত ফল (effect) মানুষের অবস্তুগত অভাব মিটায়।

সমাজের অধিকাংশ কর্মক্ষম মানুষ উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর কোন না কোন একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া টাকাকড়ি উপার্জন করে এবং ঐ অর্জিত টাকাকড়ির বিনিময়ে নিজেদের অভাব পূরণের উপযুক্ত দ্রব্য-সংগ্রহ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কোন দেশের কর্মক্ষম জন-সংখ্যার কত অংশ কি বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিয়া টাকা-কড়ি উপায় বা উপার্জন কবে তাহার হিসাব হইতে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা স্বদৃঢ় তাহার পরিমাপ করা সম্ভব। কোন দেশের বেশির ভাগ লোক যদি প্রাথমিক স্তরের বৃত্তিধারী হয় তাহা হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অল্পমাত্র বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে কোন দেশের অধিকাংশ লোক যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের বৃত্তিধারী হয় তাহা হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত ধরনের তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্প প্রধান দেশ অর্থনৈতিক দিক হইতে অনেক উন্নত। গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের উদাহরণ লইলে এই কথা পরিষ্কার হইবে। ভারতবর্ষ হইতে গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা যে অনেক উন্নত ইহা তর্কের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন শিল্প প্রধান দেশ এবং ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেনের অধিকাংশ লোক শিল্পকাষে নিযুক্ত, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। ১৯৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৬৯.৮ ভাগ কৃষি-কাজে নিযুক্ত আর গ্রেটব্রিটেনের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৩.২ ভাগ কৃষিজীবী। সুতরাং কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজন। আর শিল্প প্রসার ঘটিলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপও কমিয়া যায়, অর্থাৎ অনেকে তখন কৃষি কাজ ছাড়িয়া শিল্পে নিযুক্ত হয়। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে শিল্প-প্রসারের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে কৃষির উপর জনসংখ্যার

অত্যধিক চাপ অনেকটা কমিবে, শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে আর এইরূপ স্বেচ্ছাস্থ ব্যবস্থার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি সংগঠিত হইবে।

**কারবারের বিভাগ—শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্য ( Division of Business—Industry, Trade and Commerce ) :**

মানুষের অভাব পূরণের উপযুক্ত বস্তুগত ( material ) এবং অবস্তুগত ( non-material ) দ্রব্য উৎপাদনের জন্ত সর্ববিধ কার্যিক এবং মানসিক কার্যকলাপকেই কারবারের অন্তর্গত বলা যায়। মিলে যে কাপড় উৎপাদন হইতেছে তাহা যেমন কারবারের অন্তর্গত সেই উৎপাদিত কাপড় বাজারে আনিয়া বিক্রয় করাটাকেও কারবার আখ্যা দেওয়া যায়। তবে সমুদয় কারবারকে সাধারণ ভাবে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১। শিল্প ( Industry )—সম্পদ সৃষ্টিকে ( Production of wealth ) শিল্প আখ্যা দেওয়া যায়। স্তত্রাং উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী শিল্পের অন্তর্গত। মানুষ যখন শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁচা মালকে ( raw material ) কে রূপান্তরিত করিয়া ভোগ্য বস্তুতে ( finished goods ) পরিণত করে, তখন এইরূপ কার্যকলাপ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। স্তত্রাং কাপড়ের মিলে তুলা হইতে যে কাপড় উৎপাদিত হইতেছে তাহাকে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করিব।

২। বাণিজ্য ( Commerce )—উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বণ্টন ও বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীকে বাণিজ্য নামে অভিহিত করা যায়। Stephenson বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রব্য বণ্টন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ( person ), স্থানগত ( place ) এবং কালগত ( time ) সকল প্রকার বাধা দূর কারবার উদ্দেশ্যে মানুষের সকল প্রকার কার্যকলাপকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া যায়।

উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপনের দ্বারা ব্যক্তিগত ( personal ) বাধা দূরীভূত হয় এবং ব্যবসায়ের ( trade ) দ্বারা এই বাধা দূরীভূত হয়। আমরা ইহাও জানি যে উৎপাদন স্থান ও ভোগস্থানের মধ্যে যদি দূরত্ব থাকে তাহা হইলে এই দূরত্ব অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের অভাব মিটিবে না। পরিবহন ব্যবস্থা ও বীমাসংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে এই স্থানগত দূরত্বের বাধা দূর করা যায়। স্তত্রাং পরিবহন ও বীমাসংক্রান্ত কার্যাবলীও

বাণিজ্যের অঙ্গীভূত। পূর্বে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বর্তমানে বস্তু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। সুতরাং উৎপাদিত বস্তু সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এই সংরক্ষণের জন্য গুদাম-ঘরের প্রয়োজন। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, মাল গুদামজাত করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠান সর্ববরাহ করিয়া থাকে। সুতরাং গুদামঘর ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কার্যাবলীও বাণিজ্যের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে।

৩। **ব্যবসায় ( Trade )** :—ব্যবসায় বস্তুতঃ বাণিজ্যেরই একটি বিভাগ। উৎপাদক ও সন্তোষকারীর মধ্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে সকল কার্যকলাপ অপরিহার্য তাহাকেই ব্যবসায় বলে।

### বাণিজ্যিক তত্ত্ব ও অর্থশাস্ত্র ( Commerce and Economics )

অর্থশাস্ত্র যেমন সমাজ বিজ্ঞানের অংশবিশেষ, বাণিজ্যিকতত্ত্বও সেইরূপ অর্থশাস্ত্রের অংশ বিশেষ। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে আমরা জানিতে পারি (১) কি ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সম্পদ ( wealth ) সৃষ্টি হইতেছে।

(২) এই উৎপাদিত সম্পদ বিভিন্ন মাছুষ অথবা জাতির মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হয়।

(৩) যে সব বিভিন্ন লোক দ্রব্য-উৎপাদন ব্যাপারে লিপ্ত তাহারা নিজেদের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করে, এবং (৪) বাহারা এই সম্পদ আহরণ করে তাহারা ই বা কিভাবে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা দৌধ ভাবে এই সম্পদ ভোগ করে।

অর্থশাস্ত্রে এই সব বিষয়গুলি সমগ্র মানব জাতি সম্পর্কে কি ভাবে প্রযোজ্য সেইদিক হইতে আলোচনা করা হইয়া থাকে। বাণিজ্যিকতত্ত্বেও এই সব বিষয়গুলি আলোচ্য। তবে সেখানে শুধু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এই সব বিষয় কিভাবে কার্যকরী তাহার আলোচনা হইয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযুক্ত হয় তাহারই সম্ভাবনাই বাণিজ্যিকতত্ত্বে। সুতরাং এই অর্থে বাণিজ্যিকতত্ত্বকে ফলিত অর্থশাস্ত্র ( Applied Economics ) বলা যায়।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, অর্থশাস্ত্র ও বাণিজ্যিক তত্ত্বের মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক। এই কারণে ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থশাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি ( উৎপাদন, বিনিময় এবং সন্তোষ ) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দুই একটি উদাহরণ লইলে এই কথাটির যথার্থতা

প্রমাণিত হইবে। উৎপাদকের নিকট হইতে প্রকৃত সম্ভোগকারীর নিকট দ্রব্য-সামগ্রী পৌছাইয়া দেওয়া ব্যবসায়ীর কাজ। সুতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে জানা প্রয়োজন কোন দ্রব্য কোথায় উৎপন্ন হয় বা হওয়া সম্ভব (যাহা বস্তুতঃ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু)। দ্বিতীয়ত, লাভজনক ব্যবসায় নির্ভর করে দ্রব্য-মূল্যের উপর। সাধারণত দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া গেলে চাহিদা (Demand) ক্রিয়া যায় এবং চাহিদা কমিয়া গেলে বিক্রয়জাত লাভও (profit) কমিয়া যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে আমরা জানিতে পারি কি ভাবে চাহিদা (Demand) এবং যোগানের (Supply) পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্য মূল্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভজনক ব্যবসায় পরিচালিত করিতে হইলে কি ভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্য মূল্য নিরূপিত হয় এই তত্ত্বটি জানা আবশ্যক। কিন্তু ইহা অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। এই সব ছাড়া আমরা আরও জানি যে, বর্তমানে দ্রব্য উৎপাদন ব্যাপক ভাবে সংগঠিত হয়, আর ইহাও আমাদের জানা যে, এই ব্যাপক উৎপাদনের জগৎ প্রচুর অর্থ-বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন ব্যবসায়ীর পক্ষেই এখন আর তাহার নিজের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা এই ভাবে ব্যাপক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে টাকা ধার করিতে হয়। সুতরাং তাহার জানা প্রয়োজন কোথায় সহজে টাকা ধার পাওয়া যায়, সেই টাকা কিভাবে পরিশোধ করিতে হয়, আর সেই টাকার সুদই বা কত ও কিরূপে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ এক কথায় টাকার বাজার (money market) সম্পর্কেও ব্যবসায়ীর সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং কোন ব্যবসায়ীর যদি অর্থশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে বাস্তব ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলি যথাযথ প্রয়োগ করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। দ্বিতীয়ত, যে ব্যবসায়ীর অর্থশাস্ত্রে এইরূপ জ্ঞান আছে তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের নানা দিকের কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ ও উপলব্ধি সহজ হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অর্থশাস্ত্র বিশারদ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অর্থশাস্ত্রে ভাল জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অনেকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সেই কারণে বলা হয় 'Captains of Industry are born and not made।' তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান ব্যবসায়ীকে সার্থক ব্যবসায় পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

## অনুশীলনী

(1) What do you understand by the following terms :

(a) Commerce (b) Industry (c) Trade.

(ক) 'বাণিজ্য' (খ) 'শিল্প' এবং (গ) 'ব্যবসায়' বলিতে কি বুঝায় ?

(2) How business activities of man are classified ?

মানুষের বৃত্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার কিরূপ শ্রেণীকরণ করা হয়।

(3) What is the relation between (a) Economics and Commerce (b) Industry and Trade ?

(ক) অর্থশাস্ত্র এবং বাণিজ্যিকতত্ত্ব (খ) শিল্প এবং ব্যবসায়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ?

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বাণিজ্যের নানা প্রকার বিভাগ

(Divisions and Sub-divisions of Commerce).

পূর্ব অধ্যায়ে ‘বাণিজ্যের’ সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দ্রব্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে কার্যাবলী সংগঠিত হয় তাহাদের সামগ্রিক ভাবে বাণিজ্য বলা হয়। সুতরাং এই সংজ্ঞা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাণিজ্যের নানা প্রকার বিভাগ আছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চলতি কথায় ‘ব্যবসায়’ শব্দটি ব্যাপক অর্থেই আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং বাণিজ্যের নানা প্রকার বিভাগকেও আমরা ‘ব্যবসায়’ এই আখ্যা দিয়া থাকি। যেমন আমরা বলি পরিবহন-ব্যবসায় (Transport), ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় (Banking) ইত্যাদি। যদিও আমরা জানি প্রকৃতপক্ষে পরিবহন বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্যাবলী ব্যবসায় (trade)-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাকে প্রধানতঃ কয়েকটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন,—

১। দ্রব্য বা পণ্যের (Goods) আদান-প্রদান সংক্রান্ত ব্যবসায় (trade)

২। পরিবহন ব্যবসায় (Transport)

৩। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় (Banking)

৪। বীমা-ব্যবসায় (Insurance)

৫। বিজ্ঞাপন ও প্রচার-ব্যবসায় (Advertisement and Publicity)

৬। মালগুদামের-ব্যবসায় (Ware housing)

৭। শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজার সংক্রান্ত ব্যবসায় (Stock and Commodity Markets)

দ্রব্য বা পণ্যের আদান-প্রদান সংক্রান্ত ব্যবসায় (Trade)—  
আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে উৎপাদক ও সন্তোগকারীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন সরাসরি যোগাযোগ আর নাই। সমাজে তাই এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাহারা উৎপাদক ও সন্তোগকারীর মধ্য সংযোগ



স্থাপন করে। ইহারা উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রকৃত সম্ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে, আর এইরূপ দ্রব্য বা পণ্য ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। যাহারা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত তাহাদের ব্যবসায়ী বলা হয়। মানুষের অভাবের তৃপ্তি সাধনের জন্ত দ্রব্য বিনিময় (Exchange of Goods) অপরিহার্য। সুতরাং সমাজে যে শ্রেণীর লোক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থাকে স্ফূর্তভাবে পরিচালিত করিতেছে, তাহারা যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সংসাধন করিতেছে ইহা তর্কাতীত। 'এই শ্রেণীর লোক, যাহাদের আমরা ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়াছি, তাহারা তাহাদের কার্যের পরিবর্তে যাহা অর্জন করে তাহাকে মুনাফা (profit) বলে। ব্যবসায়ীর বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাহাতে অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া বেশি মূল্যে তাহা বিক্রয় করা যায়। তাহা না হইলে তাহাদের মুনাফা (profit) হইবে না।

**পরিবহন ব্যবসায় (Transport)**—বর্তমানে যে ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্ফূর্ত বিনিময় সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্ত উন্নতপরিবহন ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী। উৎপাদক এবং সম্ভোগকারীর মধ্যে আজ স্থানগত দূরত্ব এত অধিক যে যানবাহনের সুব্যবস্থার দ্বারা সেই দূরত্ব হ্রাস করা সম্ভব না হইলে উৎপাদন ও যেমন ব্যাহত হইত, দ্রব্য-উৎপাদনের দ্বারা অভাব তৃপ্তিরও সম্ভাবনা থাকিত না। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলে যে কাপড় উৎপাদিত হইতেছে, কলিকাতায় আমরা সেই কাপড় ক্রয় করিয়া আমাদের বস্ত্রের অভাব মিটাইতেছি। কলিকাতা এবং বোম্বাই অথবা আমেদাবাদের মধ্যে যানবাহনের দ্বারা সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে বলিচাই এই উভয় স্থানের মধ্যে বস্ত্রের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত যান-বাহনের স্ব-বন্দোবস্ত না থাকিলে বোম্বাই বা আমেদাবাদেও আজকের মত এত অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদিত হইত না। কারণ, ভারতবর্ষের অগ্ৰাণ্য অংশের বিরাট চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উপরিউক্ত দুই স্থানে এত অধিক বস্ত্র উৎপাদিত হয়। যদি যান-বাহনের অভাব বা অল্পবিধার জন্ত এই দুই স্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের অগ্ৰাণ্য অংশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত তাহা হইলে বস্ত্রের জন্ত এত বিরাট চাহিদাও থাকিত না আর উৎপাদন এই কারণেই অনেক কমিয়া যাইত।

তৃতীয়ত শুধু চাহিদার অভাবের জন্তই যে বহুল উৎপাদন বন্ধ হয়

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

তাহা নয়—উৎপাদনের উপযোগী দ্রব্য-সম্ভার সহজে ও স্থলভে যদি উৎপাদন স্থানে অর্থাৎ যেখানে কলকারখানা অবস্থিত সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া না যায় তাহা হইলেও উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যা ও আসামে প্রধানত পাটের চাষ হয়। কিন্তু পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের মিলগুলি অধিকাংশই হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। যদি এই মিলগুলিতে প্রয়োজনীয় পাটের যোগান দেওয়া না যায় তাহা হইলে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা আছে বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা অথবা আসাম হইতে পাট হুগলীর তীরে অবস্থিত মিল-গুলিতে যোগান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে আর সেই কারণেই এই পাট কলগুলিতে বহুল উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হইয়াছে। অত্যাধিক চিন্তা করিলে ইহাও প্রমাণিত হইবে যে পাটের চাষও যান-বাহনের দ্বারা প্রভাবিত। দূর দূর গ্রামাঞ্চলে যে সকল কৃষক পাটের চাষ করে তাহারা যদি বুঝিত যে যানবাহনের অভাবের জন্ত তাহাদের উৎপাদিত পাট বিক্রয় হইবে না তা হইলে তাহারা কি এত পরিশ্রম করিয়া পাটের চাষ করিত? তাহাদের উৎপাদিত পাট সহজে এবং স্থলভে পাট কলগুলিতে পৌঁছানোর উপযোগী যানবাহনের ব্যবস্থা আছে এ কথা জানে বলিয়াই তাহারা পাটের চাষ করে। শুধু পাটের ক্ষেত্রে নয় অত্যাধিক সকল কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমান সত্য।

চতুর্থত একথা ও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন ব্যবসায়-বাণিজ্য কেবল দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন দেশই আর আজ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। স্বতরাং দেশের সামগ্রিক অভাব মিটাইবার জন্ত অপর দেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটাইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করাও সম্ভব। কিন্তু এই বৈদেশিক বাণিজ্যও বহুলাংশে নির্ভর করে স্থল যানবাহন-ব্যবস্থার উপর। দার্জিলিং ও আসামের চা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় হয়, দূর ও নিকট প্রাচ্যের বহু দেশে ভারতের সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি চালান যায়। যান-বাহনের সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যান বাহনের সুযোগ খুব না থাকার জন্তই নেপাল অথবা সিকিমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বিশেষ প্রকার লাভ করিতে পারে নাই।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, স্থল পরিবহন-ব্যবস্থার উপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও বহুল অংশে নির্ভর

করে। আবার এ কথাও সত্য যে পণ্য বিনিময়ের সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা থাকিলে যানবাহনের ও উন্নতি ঘটে। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে যানবাহনের যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তাহা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় এবং তাহা ভারতের অপরাপর বহু স্থানে চালান দেওয়া হয়। এই পরিবহন-ব্যবস্থা নানা প্রকার হইতে পারে। যেমন :

- ১। রেল-পরিবহন (Rail Transport)
- ২। সড়ক-পরিবহন (Road Transport)
- ৩। নৌ-পরিবহন (Water Transport)
- ৪। বিমান-পরিবহন (Air Transport)

**ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় (Banking)**—ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্য বিনিময়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে বহুল পণ্য-উৎপাদনই করা হইয়া থাকে। আবার ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বর্তমানে উৎপাদন করা হয়। কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় না করা পর্যন্ত উৎপাদনে তাহার নিয়োজিত অর্থ কেবল পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যে কোন শিল্পপতিকেই আজ প্রথমত নিজের অর্থ খরচ করিয়া পণ্য-উৎপাদন করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া তবে সে তাহার নিয়োজিত অর্থ ফেরৎ পাইবে। আবার আমরা জানি যে বহুল উৎপাদন (large scale production) না করিতে পারিলে লাভ (profit) আশাশ্রয় হইবে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বহুল উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কোন শিল্পপতির পক্ষেই এখন তাহার নিজস্ব সঞ্চয়ের দ্বারা এই প্রভূত অর্থের সংস্থান করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাহাকে ধার করিতে হয় কোন ব্যক্তি-বিশেষ হইতে অথবা এমন কোন সংস্থা (institution) হইতে যাহার কাজ মূলত অর্থের লেনদেন করা। সমাজে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা এইরূপ অর্থ ধার দিয়া থাকে। তাহাদের বলা হয় মহাজন (Money Lender)। এই শ্রেণীর লোক 'সুদের' (Interest) পরিবর্তে টাকা ধার দিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে অর্থের প্রয়োজন এতই অধিক যে কয়েকজন মহাজনের সাহায্য অর্থের দ্বারা তাহা মিটান সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্ভব হইয়াছে ব্যাঙ্ক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের। এই

সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইল ব্যাপক ভাবে অপরের নিকট হইতে অর্থ ধার করা আবার সেই অর্থই অপরকে প্রয়োজনানুসারে ধার দেওয়া। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যোগান দিয়া থাকে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে আজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এতই অধিক যে অনেক সময় দেখা যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের যথাযথ উন্নতি না হওয়ার জন্য কোন দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়। ভারতবর্ষে শিল্পের অনগ্রসরতার একটি কারণ, এখানে আশানুরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয় নাই।

আমরা দেখিলাম যে বর্তমানে উৎপাদনের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন এবং সেই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, পণ্য লেন-দেনের ক্ষেত্রেও আজ প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। আর সে ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হইতেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য চাহিদার কথা স্মরণ রাখিয়া এক সঙ্গে বহু পণ্য মজুত রাখিতে হয় যাহাতে কোন ক্রেতা পণ্যের অভাবে ফিরিয়া না যায়। কিন্তু এইরূপ পণ্য মজুত রাখিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। আর, এই অর্থ সাধারণত ব্যাঙ্ক হইতে ধার হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। প্রসঙ্গত ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ ধার পাওয়ায় যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয় সেইরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানেরও উন্নতি হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাজারে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশীয় মুদ্রার দ্বারা তাহার মূল্য পরিশোধ করা যায়। যেমন, ভারতীয় বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভারতীয় মুদ্রায় তাহার মূল্য পরিশোধ করা হয়। কিন্তু কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী যদি আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাকে সেই দ্রব্যের মূল্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রায় অর্থাৎ ডলারে পরিশোধ করিতে হইবে। কেননা সেই দেশের বিক্রেতা ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিবেনা, সুতরাং ভারতীয় ক্রেতাকে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলার সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সাধারণত ব্যাঙ্ক হইতে সে এইরূপ ডলার ক্রয় করিয়া থাকে। এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের কাজ বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন করা। এইরূপ ব্যাঙ্ক হইতেই প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়।

স্বতরাং বলা চলে যে উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

### বীমা ব্যবসায় ( Insurance )

বীমা ( Insurance ) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটা চুক্তি যাহার দ্বারা এক পক্ষ নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে অপরপক্ষকে চুক্তিতে উল্লিখিত হুঁশিয়ারী জনিত ক্ষতি পূরণের জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বীমা নানাপ্রকার হইতে পারে, যেমন : (১) অগ্নি-বীমা, (২) নৌ-বীমা, (২) অপহরণ-বীমা ইত্যাদি। আমরা জীবন-বীমা কথাটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তবে জীবন-বীমা ও উপরিলিখিত অন্যান্য বীমার মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবন-বীমার ক্ষেত্রে একটা নিশ্চয়তার ভাব আছে। কেননা এই ক্ষেত্রে এক পক্ষ নিয়মিত চাঁদার (Premium) পরিবর্তে অপরপক্ষকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নির্দিষ্ট কাল গত হইলে অথবা মৃত্যু হইলে এই অপর পক্ষকে অথবা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে। স্বতরাং আমরা বুঝিতে পারি কোন জীবন-বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। ইহাতে জীবন-বীমা কোম্পানি কোন প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করিতেছে না। ইহাকে এইজন্ত নিশ্চয়তার চুক্তি (Contract of assurance) বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য বীমা (Insurance) বলিতে ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of indemnity) বুঝায়। বর্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ বীমার ( অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ) খুবই গুরুত্ব আছে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিক্রয়ের বহু পূর্বেই পণ্য ক্রয় করিয়া মালগুনায়ে মজুত রাখে ইহা আমরা জানি। হুঁত্যাগ্যবশতঃ অগ্নিকাণ্ডের ফলে যদি গুদামজাত পণ্য নষ্ট হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা এক বিশেষ ক্ষতি। এই ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এই সব পণ্য ব্যবসায়ীরা এক শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট চাঁদা ( Premium ) দিয়া গুদামজাত পণ্য বীমা করিয়া রাখে আর বীমা-ব্যবসায়ীরা এই চাঁদার ( Premium ) পরিবর্তে অগ্নি-কাণ্ডের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহার ফলে পণ্য ব্যবসায়ীরা অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে যখন জাহাজে এক দেশ হইতে অপরদেশে পণ্য আদান-প্রদান করা হয় তখন জাহাজডুবির ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় নৌ-বীমা ব্যবসায়ীরা। এই সব বীমা-ব্যবসায়ীরাও অবশ্যই নির্দিষ্ট চাঁদা ( Premium ) এর পরিবর্তে এইরূপ

প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। অত্যাশ্রয় বীমা-প্রতিষ্ঠানও এইরূপ ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

**বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবসায় (Advertisement and Publicity)**  
সাধারণ মানুষ বিজ্ঞাপন (Advertisement) এবং প্রচার (Publicity) এই কথা দুইটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিলেও ইহাদেব মধ্যে পার্থক্য আছে। ‘প্রচার’ (Publicity) এর অর্থ জনসাধারণের নিকট কোন কিছুর অস্তিত্বের ঘোষণা করা। স্তরাতঃ সর্বক্ষেত্রেই প্রচারের (Publicity) মূলে আর্থিক স্বার্থ আছে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যেমন, কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্ত যে আবেদন করা হয় তাহাও প্রচারের পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে ‘প্রচার’ করা হয় তাহার মূলে আর্থিক স্বার্থ থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে প্রচারকারী প্রচারের মাধ্যমে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তাহার মুনাফা (profit) বৃদ্ধি করিতে চায়। নানা প্রকার উপায়ে প্রচার কার্য চালান যায়। যেমন, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদির মাধ্যমে।

বিজ্ঞাপন (Advertisement) প্রচারেরই (Publicity) একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে কোন লিখিত বা মুদ্রিত আবেদনকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। সেইজন্য বিজ্ঞাপনকে ‘মুদ্রিত প্রচার’ (Printed Publicity) বলা হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের উদাহরণ।

### বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য :

১। কোন নূতন পণ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া তাহার জন্ম নূতন চাহিদা সৃষ্টি করা।

২। প্রচলিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা।

৩। প্রচলিত পণ্যের চাহিদা যাহাতে কমিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা। এই তিনটি বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়াও বিজ্ঞাপনের অত্যাশ্রয় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের কত অধিক গুরুত্ব। বর্তমান যুগ বহুল উৎপাদনের যুগ। কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ অধিক না হইলে বহুল উৎপাদনও সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলেই বহুল উৎপাদন সম্ভব। আবার শুধু চাহিদা বৃদ্ধি করাই বড় কথা নয়, এই বৃদ্ধিত চাহিদাকে বজায়ও রাখিতে হইবে,

চাহিদা যাহাতে কমিয়া না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা ইহা সম্ভব। ইহা ছাড়া বর্তমান যুগে পণ্য উৎপাদক এবং পণ্য ক্রেতার মধ্যে স্থানগত দূরত্ব এত অধিক যে কোন পণ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রেতার সম্যক ধারণা থাকা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাড়া সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাহাদের পণ্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিবার জন্য ‘প্রচার’ ও ‘বিজ্ঞাপনের’ আশ্রয় গ্রহণ করা আজ একরকম অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধুনা ইহাদের অবলম্বন করিয়াই এক শ্রেণীর ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহারা এই ব্যবসায় লিপ্ত তাহারা ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই প্রচার ও বিজ্ঞাপন কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

### মাল গুদামের ব্যবসায় ( Ware-housing )

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে বর্তমান যুগে উৎপাদন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃহৎ আকারে ( Large scale ) সংগঠিত হয়। সুতরাং উৎপাদক অথবা ব্যবসায়ীকে সর্বদাই অধিক পরিমাণ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য প্রভৃতি মজুত রাখিতে হয়। অগ্রিম মাল মজুত রাখিতে হইলে সুরক্ষিত স্থানের প্রয়োজন। এইরূপ সুরক্ষিত স্থানকে মালগুদাম বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেক উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর পক্ষে নিজস্ব মালগুদামের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই কারণে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মালগুদাম নির্মাণ করিয়া ব্যবসায়ের ভিত্তিতে তাহা পরিচালিত করে। উৎপাদক অথবা ব্যবসায়ীরা পণ্যের বথার্থ বিলি-ব্যবস্থার পূর্বে সাময়িক ভাবে এই সব মালগুদামে তাহাদের পণ্য গুদামজাত করে।

### শেয়ার বাজার ও পণ্যের বাজার ( Stock and Commodity Markets ).

যে সব স্থানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাদের পণ্যের বাজার বলে। আর যে সব স্থানে ঘোষ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাদের শেয়ার বাজার বলে। পণ্যের বাজারে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পাইকারী এবং খুচরা এই দুই ভাবে লেন-দেন হয়। পণ্যের বাজারের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ীরা ইহা

অনুধাবন করিয়া তাহাদের ব্যবসায়কে, ( অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ) স্তগঠিত করিয়া তুলিতে পারে। শেয়ারের বাজারে যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহার প্রকৃতি অনুধাবন করিলে দেশের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করা যায়।

## ● পোষ্ট অফিস ( Post Office )

পোষ্ট অফিস যদিও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে মধ্যে পড়ে না, তাহা হইলেও ব্যবসায়-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইহার অবদান কম নহে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত পণ্যের সংবাদাদি যেমন সংগ্রহ করিতে পারি তেমনি ডাকযোগে অনেকক্ষেত্রে পণ্য আদান-প্রদানও করা হইয়া থাকে।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল তাহা হইতে প্রচলিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংগঠন সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। সংগঠনের দিক হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

- (১) ব্যবসায়ের মালিকানা-সহ অনুযায়ী ;
- (২) ব্যবসায়ের ভৌগলিক সীমা অনুযায়ী ;
- (৩) পণ্য-লেনদেনের প্রণালী অনুযায়ী ;
- (৪) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ;
- (৫) ব্যবসায় সংগঠনের স্থিতি অনুযায়ী।

(১) মালিকানা সহ অনুযায়ী বিভাগ : এই পর্যায়ে ব্যবসায় সংগঠনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) যখন কোন এক ব্যক্তির মালিকানায় ও পরিচালনায় ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয় তখন তাহাকে একমালিকী-ব্যবসায় ( Sole Trader's Business ) বলা হয়।

(খ) যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করে তখন তাহাকে অংশীদারী ব্যবসায় ( Partnership Business ) বলা হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের ন্যূনতম সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা বিভিন্ন দেশে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট



করা হয়। ভারতে ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এই সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০, এবং অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে ২০ জন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(গ) যে ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক লোক মূনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয় এবং ব্যবসায়ের মূলধন সাধারণের নিকট হইতে শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **যৌথ ব্যবসায়** ( Company form of Business ) বলা হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানেও মালিকের সংখ্যা আইন অনুসারে নির্দিষ্ট হইতে পারে, আবার অনির্দিষ্ট ও হইতে পারে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে।

## (২) ব্যবসায়ের ভৌগলিক সীমা অনুযায়ী বিভাগ :

যখন কোন দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যেই ব্যবসায়-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে **আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়** ( Home Trade ) বলা হয়। আবার যখন ব্যবসায় বাণিজ্য দেশের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে **বৈদেশিক বাণিজ্য** ( Foreign Trade ) বলা হয়।

## (৩) পণ্য-লেনদেনের প্রণালী অনুযায়ী বিভাগ :

যখন স্থলপথে পণ্য লেনদেন করা হয় তখন তাহাকে **স্থলপথে বাণিজ্য** ( Land Borne Trade ) বলা হয়। সেইরূপ **জলপথে বাণিজ্য** ( Sea Borne Trade ) এবং **বিমান-পথে বাণিজ্যও** ( Air Borne Trade ) হইতে পারে।

## (৪) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী বিভাগ :

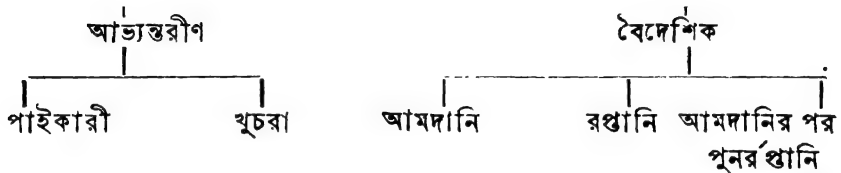
যে সকল ব্যবসায়ী উৎপাদকেব নিকট হইতে অথবা উৎপাদন স্থান হইতে প্রভূত পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে, তখন তাহাদের ব্যবসায়কে বলা হয় **পাইকারী ব্যবসায়** ( Wholesale Trade ) অবশ্য পাইকারী ব্যবসায়ী অনেক সময় প্রকৃত সস্তোগকারীর নিকটও পণ্য বিক্রয় কবে। পাইকারদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া যখন প্রকৃত সস্তোগকারীর নিকট সেই পণ্য বিক্রয় করা হয় তখন তাহাকে **খুচরা ব্যবসায়** ( Retail Trade ) বলা হয়। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

## (৫) ব্যবসায়-সংগঠনের ক্ষীতি অনুযায়ী বিভাগ :

ব্যবসায়-সংগঠনের আয়তন যখন খুবই বৃহৎ তখন তাহাকে বৃহদায়তন ( Large Scale ), যখন মাঝারী তখন মাঝারী আয়তন ( Medium sized ), আর যখন ক্ষুদ্র তখন ক্ষুদ্রায়তন ( Small Scale ) ব্যবসায় বলা হয়। মূলধনের পরিমাণ, শ্রমিক সংখ্যা, পণ্য-ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদির দ্বারা ব্যবসায় সংগঠনের ক্ষীতি সাধারণত নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বিভাগে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বিভক্ত করা গেলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিম্নরূপ বিভাগ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

## ব্যবসায়-বাণিজ্য



আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় সম্পর্কে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

## (ক) আমদানি বাণিজ্য ( Import Trade ) :

যখন কোন দেশে নিজে কোন পণ্য উৎপাদন করিতে পারে না অথবা উৎপাদন করিতে পারিলেও অল্প দেশের তুলনায় তাহার উৎপাদন-ব্যয় বেশী পড়ে তখন প্রথমোক্ত দেশ সেই পণ্য অল্প দেশ হইতে আমদানি করে। ইহাকে আমদানি-বাণিজ্য বলা হয়। যেমন, ভারতবর্ষ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে যে খাদ্য-দ্রব্য আমদানি করে তাহা আমদানি বাণিজ্যের পর্যায় ভুক্ত।

## (খ) রপ্তানি-বাণিজ্য ( Export Trade ) :

যখন কোন দেশ তাহার ভৌগলিক সীমার বাহিরে অবস্থিত অল্প কোন দেশের নিকট তাহার নিজস্ব পণ্য বিক্রয় করে তখন তাহাকে রপ্তানি-বাণিজ্য বলা হয়। উপরোক্ত উদাহরণে আমেরিকা ভারতবর্ষে যে খাদ্য বস্তু বিক্রয় করে তাহা আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য।

### (গ) আমদানির পর পুনরুৎপাদি বাণিজ্য (Entrepot Trade)

অনেক সময় দেখা যায় কোন দেশ অপর দেশ হইতে কোন পণ্য আমদানি করে সম্যক নিজে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। সেই আমদানিকৃত পণ্য সেই দেশ পুনরায় অগ্রান্ত্র দেশে রপ্তানি করে। এইরূপ বাণিজ্যকে আমদানির পর পুনরুৎপাদি বাণিজ্য বলা হয়। যেমন, লণ্ডন ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ চা আমদানি করে। কিন্তু লণ্ডন সেই আমদানিকৃত চা পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকার অগ্রান্ত্র দেশে রপ্তানি করে। এইরূপ বাণিজ্যকে আমদানির পর পুনরুৎপাদি বাণিজ্য বলা হয়।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা উপলব্ধি করা যায় যে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে প্রথমত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য এই দুই ভাগে ভাগ করা বাঞ্ছনীয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, পাইকারী এবং খুচরা। বৈদেশিক বাণিজ্যকে সেইকপ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য এবং আমদানির পর পুনরুৎপাদি বাণিজ্য।

### অনুশীলনী

1. What are the different branches of Commerce and Trade? Give short explanation of each branch.

(ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখাগুলি কি কি? ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর)

2. What are the Divisions of Commerce?

(ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?)

— — —

## তৃতীয় অধ্যায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ( Home Trade )

কোনও দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ অত্যাধিক আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আবার দুটি ভাগ—পাইকারী এবং খুচরা।

### পাইকারী কারবার ( Wholesale Trade )

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে বর্তমানে বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দিয়াছে। এবং জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে এখন উৎপাদকের পক্ষে পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য-উৎপাদন এবং পণ্যের বিলি ব্যবস্থা করা অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য সন্তোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়া এই সকল কাজ একই সঙ্গে করা সম্ভব নহে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদক এখন উৎপাদন কার্যেই ব্যাপৃত থাকে। কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা অথবা, সেই উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত সন্তোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ, এখন আর উৎপাদক নিজে করেন। এই সকল কাজে এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিযুক্ত থাকে। ইহাদের আমরা মধ্যস্থ কারবারী ( Middleman অথবা Business Intermediaries ) বলিতে পারি। পাইকার ( wholesaler ) এইরূপ একজন মধ্যস্থ কারবারী। সুতরাং সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি, যে সকল কারবারী কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া পণ্য-উৎপাদকের নিকট বিক্রয় করে, আবার উৎপাদিত পণ্য ( finished goods ) উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে, তাহারা পাইকার ( wholesale trader ), তাহাদের কারবার পাইকারী কারবার ( wholesale trade )।

### পাইকারের কাজ ( Function of Wholesale Trader )

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী কারবারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ কারবারী নানাপ্রকার কার্য করিয়া থাকে। যথা : (১) সে পণ্য-

উৎপাদক ও প্রকৃত সম্ভোগকারীর মধ্যে যোগসাধন করে। পাইকার পণ্য-উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া তাহা খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। আর, প্রকৃত সম্ভোগকারী খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে। সুতরাং এখন পণ্য-উৎপাদককে সরাসরি খুচরা-বিক্রেতা অথবা সম্ভোগকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে হয়না। পাইকার এই কাজ করে।

(২) উৎপাদক বহু পণ্য উৎপাদন করে বলিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ নিয়োগ করিতে হয়। এই অর্থ যথানীচ ফেরৎ না পাইলে উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে আগাম পণ্য ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া, প্রকৃত সম্ভোগকারীর নিকট পণ্য বিক্রয় হইবার পূর্বেই উৎপাদক তাহার অর্থ ফেরৎ পায়।

(৩) পাইকার একই সঙ্গে বহু পণ্য ক্রয় করে বলিয়া উৎপাদকের পক্ষেও বহুল উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

(৪) পাইকার উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেই তাহা গুদামজাত করিয়া রাখে। সুতরাং উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের পর বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তাহার সংরক্ষণের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকে।

(৫) পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে বর্তমানে যে শুধু বহুল উৎপাদন হয় তাহা নহে, চাহিদা উদ্ভূত হইবার পূর্বেই উৎপাদন করা হইয়া থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে চাহিদার প্রকৃতির ও পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া এইরূপ উৎপাদনে একটা অনিশ্চয়তা থাকে। পাইকার আগাম পণ্য ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া উৎপাদক এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে রেহাই পায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে চাহিদা বিস্তারের জন্ত এবং উৎপাদিত সমস্ত পণ্য বাহাতে বিক্রয় হয় সেই জন্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রচার কাণ্ডের ব্যয় পাইকার বহন করিয়া থাকে। সুতরাং এই দিকেও উৎপাদকের খুঁকি ঘাসে পাইকার সহায়তা করিয়া থাকে।

(৬) পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দ্রব্য-মূল্যের মন্বাত্মক পরিবর্তন রোধ করাও পাইকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পাইকার একই সঙ্গে বহু পণ্য আগাম ক্রয় করিয়া রাখে বলিয়া ভবিষ্যতে কোন কারণে চাহিদা বাড়িয়া গেলে পণ্য যোগানের কোনও অসুবিধা হয় না। ইহা না হইলে যোগানের অভাবে দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়া যাইত। আবার বাজার সম্পর্কে পাইকার বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কেও সঠিক ধারণা

করা তাহার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ হইতে পারে এই সম্পর্কে উৎপাদককে পূর্বেই সে সজাগ করিয়া দিতে পারে। উৎপাদক সেই অনুসারে উৎপাদন করিয়া চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারে।

(৭) পাইকার যে শুধু উৎপাদককেই নানাভাবে সাহায্য করে তাহা নয়, খুচরা ব্যবসায়ীরাও তাহার নিকট হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হয়। খুচরা ব্যবসায়ীদের মূলধন অপেক্ষাকৃত অল্প। পাইকারদের নিকট হইতে প্রয়োজন মত সবসময় পণ্য ক্রয় করিতে পারে বলিয়াই একই সঙ্গে বহু পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিয়া মূলধন আটক রাখিবার দায়িত্ব হইতে খুচরা ব্যবসায়ী রক্ষা পায়। অনেক সময় খুচরা ব্যবসায়ীরা ধারেও পাইকারদের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ পায়। পাইকাররা আছে বলিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের অনেক দ্রব্য একসঙ্গে ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিতে হয় না। এইভাবে পাইকার খুচরা ব্যবসায়ীদেরও অনেক ঝুঁকি নিজে গ্রহণ করে। অনেক সময় আবার ইহাও দেখা যায় যে খুচরা ব্যবসায়ীরা পাইকারদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ও অত্যাগত পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। এইভাবে পাইকারী ব্যবসায়ী উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করিয়া থাকে।

### পাইকারী ব্যবসায়ের সংগঠন ( Organisation of Wholesale Trade )

পাইকারী ব্যবসায়ের অধিক পরিমাণ দ্রব্য আগাম ক্রয় করিতে হয় বলিয়া পুঁজির পরিমাণও অধিক হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং এই কারণে পাইকারী ব্যবসায়ের একমালিকী, অংশীদারী ও যৌথমূলধনী সংগঠনের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ যৌথমূলধনী সংগঠনই অধিক প্রচলিত। কারণ, যৌথমূলধনী সংগঠনে পুঁজির পরিমাণ অধিক। কিন্তু শুধু অধিক পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিতে পারাই যথেষ্ট নয়। পাইকারী ব্যবসায়ের ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধন করাও একান্তভাবে অপরিহার্য। পাইকারকে জানিতে হইবে কোন দ্রব্য কোথায় কমমূল্যে পাওয়া যায়। অল্পরূপভাবে তাহার ইহাও জানা আবশ্যক যে কিভাবে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিয়া লাভের পরিমাণ বাড়ানো যায়। সুতরাং পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই কারণে পাইকারকে ক্রয়বিভাগ

( Purchase Department ) ও বিক্রয় বিভাগ ( Sales Department ) কে সুস্থভাবে পরিচালনা করিতে হয়। এই বিভাগ দুইটি বিভাগীয় ম্যানেজার দ্বারা অর্থাৎ ক্রয় ম্যানেজার ( Purchase Manager ) ও বিক্রয় ম্যানেজার ( Sales Manager ) দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহা ব্যতীত গুদাম বিভাগ ( Stores Department ), প্যাকিং বিভাগ ( Packing Department ), প্রচার বিভাগ ( Publicity Department ) প্রভৃতি থাকিতে পারে। পাইকার ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুদামেই পণ্য বেচাকেনা করে বলিয়া তাহাদের আলাদা কোনও অফিস অথবা দোকান থলিতে হয় না।

উপযুক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও সমগ্র ব্যবসায়ের হিসাব রক্ষাও জ্ঞাত হিসাব-রক্ষণ বিভাগ (Accounts Department) থাকে। কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষকের অধীনে এই বিভাগ পরিচালিত হয়। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ের পরিচালনার ভার স্তম্ভ থাকে মালিকের উপর, অথবা অংশীদার কিংবা ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ( Managing Director ) এর উপর।

### খুচরা কারবার ( Retail Trade )

পাইকারদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া প্রকৃত সন্তোষকাবাব নিকট উহা বিক্রয় করাকে সাধারণত খুচরা কারবার ( Retail Trade ) বলা হয়। উৎপাদক এবং প্রকৃত সন্তোষকারীর মধ্যে দোহাফুত্র স্থাপনের ব্যাপারে খুচরা কারবারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাইকাররা একই সঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করে। কিন্তু ক্রেতা সাধারণত তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে ক্রয় করে। সুতরাং তাহার পক্ষে পাইকারদের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। খুচরা কারবারীই পাইকারদের নিকট হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজেদের দোকানে মজুদ রাখে। ক্রেতারা এই সব দোকানে গিয়া নিজেদের পছন্দমত দ্রব্য অল্প পরিমাণে ক্রয় করে। খুচরা কারবারীরা সাধারণত নিজেদের দোকানে বিভিন্ন রকমের দ্রব্য খুচরা বিক্রয় করে। আবার একজাতীয় পণ্য বিক্রয়ও করে। তবে সে ক্ষেত্রে সে পণ্যের নানা শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয় করে। যেমন, মেগনারী দোকানে আমরা নানা রকমের জিনিস ক্রয় করিতে পারি। কাপড়ের দোকানে যদিও কাপড় ছাড়া অল্প কোন জিনিস বিক্রয় হয় না, তাহা হইলেও কাপড়ের দোকানে নানা শ্রেণীর কাপড় বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

## বাণিজ্যিক ভূমি

পাইকাররা নিজেদের পণ্য নিজেদের গুদামে মজুত করিয়া রাখে। কিন্তু ক্রেতার দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে পাইকারদের মালগুদামে দ্রব্য পছন্দ করিয়া ক্রয় করা সম্ভব নয়। খুচরা কারবারী পাইকারদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট বিপণিতে সাজাইয়া রাখে। সুতরাং ক্রেতাদের পক্ষে নিকটবর্তী বিপণিতে গিয়া তাহার পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব ও সুবিধাজনক।

খুচরা কারবারীরাই প্রকৃত ক্রেতাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ক্রেতাদের রুচি-পছন্দ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু পাইকার অথবা উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় ফলে তাহাদের পক্ষে ক্রেতাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল রুচি সহজে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। খুচরা কারবারী পাইকারদের এই বিষয়ে অবহিত কবে। আর, পাইকারদের মারফৎ উৎপাদকও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে।

খুচরা কারবারী যে শুধু পাইকারদের অথবা উৎপাদকদের কাজে সাহায্য করে তাহা নয়, সাধারণ ক্রেতার ও তাহাদের দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ, খুচরা-কারবারী না থাকিলে ক্রেতাদের পক্ষে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে এবং সহজে ক্রয় করা সম্ভব হইত না।

**খুচরা কারবার সংগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ( Factors to Consider in Organising retail business )**

খুচরা কারবারের সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে কয়েকটা বিষয়ের উপর। যথা : (১) বিপণির স্থান নির্বাচন ( selection of site ), (২) বিক্রয় কুশলতা ( salesmanship ), (৩) বিজ্ঞাপন ( Advertisment ) ও সজ্জা পরিপাট্য (৪) যথাযথ মূলধন নিয়োগ ( Capital ) ইত্যাদি।

### (১) স্থান নির্বাচন :

খুচরা বিপণি প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য স্থান নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খুচরা-কারবার যদি জনপ্রিয় হইয়া না উঠে তাহা হইলে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি খুচরা বিপণি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ক্রেতা সহজে উপস্থিত হইয়া দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিপণি অনেক সহজে সুনাম অর্জন করিতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে,



এক একটি বিশেষ স্থানে এক একটা বিশেষ খুচরা কারবার গড়িয়া উঠে। যেমন, বই-ক্রয় করিতে হইলেই আমাদের কলিকাতায় কলেজস্ট্রীটের কথা মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন কারণে কলিকাতায় কলেজস্ট্রীটকে কেন্দ্র করিয়াই বই এর কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে কলেজ স্ট্রীটের এই ব্যাপারে একটা ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কোন বই'এর দোকান যদি কলেজ স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেই দোকানেব পক্ষে সুনাম অর্জন করা অনেক সহজ হয়।

### (২) বিক্রয়-কুশলতা :

খুচরা কারবারের সাফল্য আবার অনেকটা নির্ভর করে বিক্রয়-কুশলতাব উপর। ভদ্র ও নম্র ব্যবহারের দ্বারা ক্রেতা-সাধারণকে আকর্ষণ করা সম্ভব। ইহাতে খুচরা কারবারীর সুনাম হয়। আর সুনাম ছড়াইয়া পড়িলে নতুন নতুন ক্রেতাও সেই দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেখানে দ্রব্য ক্রয় করিতে আসে।

(৩) খুচরা কারবারীর পত্র-পত্রিকার মারফৎ তাহাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন যে দেয় না তাহা নয়। তবে তাহাদের বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যম হইল দোকানের সাজসজ্জা ও পরিপাট্য। একটি সুসজ্জিত দোকানে নানা রকমের জিনিস ক্রচিসম্মত উপায়ে সাজাইয়া রাখিলে সাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে কেবল কৌতূহলের বশেই অনেকে দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু না কিছু দ্রব্য ক্রয় করে। বিশেষত, বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্তমানে এত তীব্র হইয়া পড়িয়াছে যে, দোকানের সাজসজ্জা ও পরিপাট্যের দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

### (৩) যথাযথ মূলধন নিয়োগ :

খুচরা কারবারীকে তাহার বিশেষ ব্যবসায়ের প্রয়োজনানুসূপ মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে। মূলধনের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে কারবারের প্রকৃতির উপর। কোন কারবারে অল্প মূলধনেও কাজ চলিতে পারে, আবার কোথাও অধিক মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায় সম্প্রসারিত করিতে পারিগেই লাভের আশা বেশী। খুচরা কারবারীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহার মূলধন প্রয়োজনাতিরিক্ত অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম না হয়।

### সমাজে মধ্যস্থ কারবারের প্রয়োজন আছে কি ?

এই পর্যন্ত যতটা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা পরিষ্কৃত হইয়াছে যে, পাইকার অথবা খুচরা কারবারী, যাদাদের আমরা মধ্যস্থ কারবারী ( Business Intermediaries ) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে তাহাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তাহাদের অবস্থিতি ও প্রয়োজনীয়।

• মধ্যস্থ কারবারী উৎপাদককে প্রয়োজনমত কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাদি করিয়া উৎপাদকের ঝুঁকি অনেকটা নিজেই বহন করে বলিয়া উৎপাদক নিশ্চিত হইয়া তাহার উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখিতে পারে। ইহারাই বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পণ্য-মূল্যের স্থিরতা আনয়ন করে। ইহাদের মারফত পণ্য বিক্রয় করা হয় বলিয়া পণ্য-উৎপাদককে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জ্ঞানও নিজেই বিশেষ খরচ করিতে হয় না। ফলে তাহাদের ব্যয়ও অনেকটা হ্রাস হয়। সর্বোপরি উৎপাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়া মধ্যস্থ কারবারী বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শুধু উৎপাদক নয়, মধ্যস্থ কারবারীদের নিকট হইতে সাধারণ ক্রেতারাও উপকৃত হয়। ইহারা না থাকিলে ক্রেতাসাধারণের পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করা অস্ববিধাজনক হইত।

কিন্তু মধ্যস্থ কারবারীদের গুরুত্ব থাক। সত্ত্বেও ইহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও কম নয়। অনেকের মতে মধ্যস্থ কারবারীদের অবস্থিতির জন্তই প্রকৃত সম্ভোগকারীকে তাহার প্রয়োজনীয় পণ্যের জ্ঞান অধিক মূল্য দিতে হয়। কারণ, উৎপাদকের নিকট হইতে মধ্যস্থ কারবারী যে দামে পণ্য ক্রয় করে, প্রকৃত সম্ভোগকারীর নিকট তাহা সেট দামে বিক্রয় করে না। কেননা সেই দামে বিক্রয় করিলে তাহার কোন মুনাফা থাকে না। সুতরাং তাহার মুনাফার জন্ত সে একই দ্রব্য বেশি দামে বিক্রয় করে। উৎপাদকের নিকট হইতে যদি সম্ভোগকারী সরাসরি পণ্য ক্রয় করিতে পারিত তাহা হইলে তাহাকে এই বেশি মূল্য দিতে হইত না।

আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক মধ্যস্থ কারবারী অসাধু উপায়ে মুনাফা বাড়াইবার চেষ্টা করে। বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলিয়া অনেক সময় পণ্য মজুত করিয়া বাজারে পণ্যের যোগানে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে। ফলে চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান কম হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

আর, এই বর্ধিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মধ্যস্থ কারবারীরা অধিক মুনাফা করে। সাধারণ ক্রেতা ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মধ্যস্থ কারবারের এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার না থাকিলে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বহুল উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব হইত না। সুতরাং তাহাদের অবস্থিতি ও এই কারণে প্রয়োজনীয়।

### খুচরা কারবারের সংগঠন :

পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, খুচরা কারবার ক্ষুদ্রায়তন ও হইতে পারে বৃহদায়তনও হইতে পারে। আয়তন বিক্রপ হইবে তাহা নির্ভর করে কারবারের প্রকৃতির উপর।

হাটে বাজারে বা বিভিন্ন পল্লীতে আমরা নিত্য নানারকম খুচরা কারবারের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যেমন, স্টেশনারী দোকান, মুদীখানা, জুতার দোকান ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন খুচরা কারবারের সংগঠন বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বৃহদায়তন খুচরা কারবারের সংগঠন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :  
(১) বিভাগীয় বিপণি (Departmental Store) (২) বহু শাখা বিপণি (Multiple shop), (৩) চেইন স্টোর (Chain store) (৪) এক মূল্যের দোকান (One price shop), (৫) ডাকযোগে ব্যবসায় (Mail order business) (৬) খুচরা সমবায় বিপণি (Retail Co-operative Store).

### বিভাগীয় বিপণি :

একই গৃহে বহু বিভাগে বিভক্ত অথচ সামগ্রিকভাবে একই পরিচালনাধীন নানা রকম পণ্যের যে দোকান তাহাকে বিভাগীয় বিপণি বলা হয়। সাধারণত এক একটি পণ্য লইয়া এক একটি বিভাগ পরিচালিত হয়। যেমন, কাপড়ের বিভাগ, বইএর বিভাগ, স্টেশনারী দ্রব্যের বিভাগ ইত্যাদি। এইরূপ বিভাগ-গুলি যদিও স্বতন্ত্র তাহা হইলেও বিভাগীয়-বিপণিতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গভীর যোগসূত্র থাকে।

### বিভাগীয় বিপণির বৈশিষ্ট্য :

(১) বিভাগীয় বিপণি পাইকারী হারে পণ্য ক্রয় করে, কিন্তু বিক্রয় করে খুচরা দরে।

(২) বিভাগীয় বিপণিতে নানা রকমের দ্রব্য সামগ্রি মজুত করা হয়। এক

একটি দ্রব্য বা এক এক শ্রেণীর দ্রব্য লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গঠিত হয়। এইরূপ এক একটি বিভাগ প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্বতন্ত্র খুচরা দোকান এবং ইহাদের সম্মেলনেই বিভাগীয় বিপণি গড়িয়া উঠে।

(৩) সাধারণত, বিভাগীয় বিপণিতে নগদ বিক্রয় হয়।

(৪) বিভাগীয় বিপণিতে নানা রকমের দ্রব্য মজুত করা হয় বলিয়া ইহার।  
• সাধারণত বৃহদায়তন হয় এবং কোন শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়।

(৫) এইরূপ বিপণিতে নানা ধরনের দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্ত বিভিন্ন দোকানে ঘুরিতে হয় না। একই স্থানে তাহাদের প্রায় সবরকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

(৬) বিভাগীয় বিপণি বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া না থাকিলেও, অনেক সময় ক্রেতাসাধারণের সুবিধার জন্ত দ্রব্যসামগ্রি বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

(৭) বিভাগীয় বিপণিতে সাধারণত বিভিন্ন স্থান হইতে নানা রকমের দ্রব্য ক্রয় করিয়া মজুত করা হয়।

(৮) বিভাগীয় বিপণি বড় বড় শহরেই গড়িয়া উঠে।

### বিভাগীয় বিপণির সংগঠন :

বিভাগীয় বিপণির সংগঠন একমালিকী, অংশিদারী অথবা যৌথ-কারবারী হইতে পারে। তবে সাধারণত এইরূপ সংগঠন যৌথ-কারবারী হইয়া থাকে।

একমালিকী সংগঠন হইলে মালিক নিজেই সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। যৌথকারবারী সংগঠন হইলে সামগ্রিক পরিচালনার অধিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রহণ করেন। সমগ্র কারবাবের জন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অধীনে একজন জেনারেল ম্যানেজার ও একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে আবার প্রত্যেক বিভাগের জন্ত একজন করিয়া বিভাগীয় ম্যানেজার থাকে। প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনা বিভাগীয় ম্যানেজারের হস্তে গুপ্ত থাকে। বিভাগীয় ম্যানেজারকে সাহায্য করিবার জন্ত সহকারী বিভাগীয় ম্যানেজার ও বিক্রয়-কর্মী নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া মজুত করা, আবার তাহা যোগ্য মূল্যে বিক্রয় করা প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগীয় কার্যের দায়িত্ব বিভাগীয় ম্যানেজারের উপর গুপ্ত থাকে। নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে বিভাগীয় ম্যানেজার মজুত মালের এবং আদায়ীকৃত অর্থের হিসাবপত্র জেনারেল

ম্যানেজারের নিকট দাখিল করেন। বড় বড় বিভাগীয় বিপণিতে প্রত্যেক বিভাগের জ্ঞাত আলাদা ক্যাশবিভাগ থাকে। তবে সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় ক্যাশবিভাগের দ্বারাই বিক্রয় মূল্য গ্রহণের কার্য পরিচালিত হয়। কোন পণ্য বিক্রয় করিবার পর বিক্রয়-কর্মী ক্যাশমেমো কাটিয়া মূল্য সমেত তাহা ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দেয়, আর দ্রব্যটি প্যাকিং ও ডেলিভারি বিভাগে পাঠাইয়া দেয়। ক্যাশিয়ার টাকা জমা করিলে একটি রসিদ বা ক্যাশ মেমোটি এবং একটি কাউন্টার টোকেন ক্রেতাকে দেওয়া হয়। ক্রেতা এই টোকেনটি দেখাইয়া প্যাকিং ও ডেলিভারি বিভাগ হইতে দ্রব্যটি সংগ্রহ করে।

### বিভাগীয় বিপণির সুবিধা-অসুবিধা :

#### সুবিধা :

(১) বিভাগীয় বিপণিতে ক্রেতারাই একই সঙ্গে বহু রকমের দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে বলিয়া তাহাদের শ্রম ও সময় লাঘব হয়।

(২) অনেক সময় বিভাগীয় বিপণি হইতে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রেতার বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতার অনেক সুবিধা হয়।

(৩) যানবাহনের সুবন্দোবস্তযুক্ত শহরের কেন্দ্রস্থলে বিভাগীয় বিপণি স্থাপিত হয় বলিয়া, ক্রেতাদের এই সব বিপণিতে গিয়া দ্রব্য ক্রয় করিতে অসুবিধা হয় না।

(৪) বিভাগীয় বিপণিতে একই সঙ্গে বহু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ক্রয়ের খরচ কম হয়।

(৫) বহুল পরিমাণে ক্রয় ও বিক্রয় করার সুবিধা থাকায় বিভাগীয় বিপণির গড়পড়তা স্থির ব্যয় (over head) কম হয়।

(৬) প্রভূত মূলধন নিয়োগ করার ফলে বিভাগীয় বিপণিতে একদিকে যেমন সজ্জা-পারিপাট্য রুচি সম্মত ও উন্নত করা সম্ভব অত্যাধিক উচ্চ পারিশ্রমিকে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া ক্রয় বিক্রয়ে সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করাও সহজ।

(৭) বিভাগীয় বিপণিতে একটি বিভাগের দ্বারা অপরাপর বিভাগের প্রচার কার্যও অনেক সময় সমাধা করা যায়। কেননা, কোন ক্রেতা যখন কোন একটি বিভাগে পণ্য ক্রয় করিতে যায়, তখন সেই বিভাগের পাণ্যপাশি অন্যান্য বিভাগে সজ্জিত পণ্য-সামগ্রীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে, এবং সেই সব পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই সব বিভাগ হইতেও কিছু ক্রয় করিতে পারে।

### অসুবিধা :

(১) বিভাগীয় বিপণি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হয় বলিয়া সাধারণত ক্রেতা সাধারণের আবাসস্থল হইতে ইহার দূরত্ব অধিক হয়। ফলে ক্রেতাদের অনেক সময় অসুবিধা হয়।

(২) বিভাগীয় বিপণিতে পণ্যমূল্য ক্ষুদ্রায়তন খুচরা দোকানের তুলনায় বেশি। কারণ বিভাগীয় বিপণিতে পরিচালনা ইত্যাদির খরচ অধিক।

(৩) সাধারণত বিস্তারিত ক্রেতারাই বিভাগীয় বিপণিতে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অসুবিধা ভোগ করে। দরিদ্র বা সাধারণ ক্রেতা যাহারা সামান্য সামগ্রী অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে চায়, তাহারা বিভাগীয় বিপণিতে ক্রয় করিয়া বিশেষ অসুবিধা পায় না।

(৪) বৃহদায়তন বিভাগীয় বিপণি প্রতিষ্ঠার জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন।

(৫) পরিচালক সুদক্ষ না হইলে এইরূপ বিপণিতে সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

(৬) এইরূপ বিপণিতে মালিকের পক্ষে সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

(৭) এইরূপ বিপণিতে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেশি।

### বহু-শাখা বিপণি (Multiple Shop)

সমশ্রেণীর পণ্য-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদক যখন নিজেব কর্তৃত্বাধীনে ও পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে দোকান খুলিয়া তাহাব উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তাহাকে বহু-শাখা বিপণি কারবার বলা হয়। আর এইরূপ দোকান সমষ্টিকে বলা হয় বহু শাখা বিপণি। এইরূপ কারবারে মধ্যস্থ কারবারী থাকে না। উৎপাদক সরাসরি সন্তোগকারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবে। বাটার জুতার দোকান, শক্তি ঔষধালয় বা সাধনা ঔষধালয় এইরূপ বহু শাখা বিপণির দৃষ্টান্ত।

### বহুশাখা-বিপণির বৈশিষ্ট্য

(১) বহু শাখা বিপণির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এইরূপ সংগঠনে উৎপাদকই বিক্রেতারূপে কাজ করে। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও তাহার বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে কোন মধ্যস্থ কারবারী থাকে না।

(২) এইরূপ সংগঠনে উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইলেও বিক্রয় ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ উৎপাদন একই স্থানে বহুল পরিমাণে হইয়া

থাকে। কিন্তু উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দোকান খোলা হয়।

(৩) বহুশাখা বিপণিতে উৎপাদক নিজের পণ্য ছাড়া অন্য কোন পণ্য বিক্রয় করে না। সাধারণত একই শ্রেণীর পণ্যই এই সব বিপণিতে বিক্রয় করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈচিত্র্য আনয়নের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য উৎপাদক একাধিক পণ্য উৎপাদন করিয়া সেই সব পণ্যের দ্বারা খুচরা বিপণিগুলি সজ্জিত করে। যেমন—বাটার দোকানে এখন জুতা ছাড়াও কালি, ছাতা ইত্যাদি দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রেও উৎপাদক একজনই। অন্য উৎপাদকের পণ্য সে বিক্রয় করে না।

(৪) বহুশাখা বিপণিতে পণ্য নগদমূল্যে বিক্রয় করা হয় আর এই সকল বিপণিতে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট (Fixed)।

(৫) বহুশাখা বিপণিগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকিলেও ইহাদের সজ্জা-পরিপাট্য একই রকম। ফলে, জনসাধারণের দৃষ্টি সহজেই এই সব দোকানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন, বাটার দোকানগুলির সজ্জা পরিপাট্যে এমন একটা সাদৃশ্য আছে যে যেখানেই স্থাপিত হোক না কেন এই সব দোকানগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

(৬) বহুশাখা বিপণিগুলির প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিচালনার কাৰ্য কেন্দ্র-কর্তৃক নিযুক্ত বর্গচারীর দ্বারা করা হইলেও সামগ্রিক পরিচালনা কেন্দ্রের হস্তেই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

### বহুশাখা বিপণির সংগঠন

(১) এইরূপ প্রতিষ্ঠান সাধারণত যৌথ মূলধনী সংগঠন হইয়া থাকে।

(২) পরিচালক সমিতি বা ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়, এবং তাহার হস্তে প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(৩) এইরূপ সংগঠনে একটি বিক্রয় বিভাগ (Sales Department) থাকে। সকল বিপণিগুলির কাৰ্য বিক্রয় বিভাগের জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বিপণিতে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও ঝুঁকিছু সংখ্যক বিক্রয়-কর্মী নিযুক্ত করা হয়।

(৪) নির্দিষ্ট সময়ে এই সব বিপণি কেন্দ্রীয় অফিসে তাহাদের হিসাব-পত্র

দাখিল করে। শাখা-বিপণিগুলিতে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই কেন্দ্রে অথবা কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিতে হয়। এই অর্থ হইতে ইহারা নিজে কোনরূপ খরচ করিতে পারে না। শাখা বিপণি গুলির সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় অফিস বহন করে।

(৫) শাখা বিপণিগুলিতে কার্য স্ফুটভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জ্ঞান মাঝে মাঝে তদন্তকার্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে।

**বহুশাখা বিপণির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Multiple shop.**

**সুবিধা (Advantages) :**

(১) বহুশাখা বিপণি ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজেই তাহার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় কোন মধ্যস্থ কারবারী থাকে না। ফলে ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য ক্রয় করিবার সুযোগ পায়। অত্যাধিক মধ্যস্থ কারবারী না থাকায় বিক্রেতা ও অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা করিতে পারে।

(২) এইরূপ বিপণিতে নগদ বিক্রয় হয় বলিয়া উৎপাদক তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহার নিয়োজিত মূলধন ফেরৎ পায় এবং সেই মূলধন পুনর্বার উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করিতে পারে। এই কারণে, অত্যধিক মূলধন নিয়োগ না করিলেও চলে।

(৩) নগদ বিক্রয়ের আরও একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে অনাদায়ী পাওনার আশঙ্কা থাকে না।

(৪) প্রত্যেকটি দোকানের জ্ঞান বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া এই খাতে মোট ব্যয় কম হয়।

(৫) সম্ভ্রূ পারিপাট্যের দিক হইতে প্রত্যেকটি দোকানের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে বলিয়া একটি দোকানের দ্বারা অপর দোকানের প্রচার কার্যেও সুবিধা হয়।

(৬) উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকার ফলে ক্রেতাদের রুচি পারবর্তন অনুধাবন করিয়া উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদন ব্যবস্থায় যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করাও সহজ হয়।

(৭) এইরূপ বিপণিতে পণ্য খুব পুঁজাতন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, ক্রেতারা এইরূপ দোকানে সত্তা প্রস্তুত পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায়।



(৮) উৎপাদক নিজেই বিক্রেতা বলিয়া ক্রেতার পণ্যের কোন ক্রটি লক্ষ্য করিলে সহজেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে।

(৯) এই সব বিপণি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া ক্রেতার তাহাদের নিকটস্থ দোকান হইতে পণ্য ক্রয় বরিবার সুযোগ পায়।

(১০) কেন্দ্রীয় গুদাম হইতেই বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করা হয় বলিয়া এইরূপ কারবারে পণ্য গুদামজাত করণের ব্যয় কম।

### অসুবিধা ( Disadvantages )

(১) বহুশাখা বিপণি হইতে শুধু একতাতীয় পণ্য বিক্রয় করা হয় বলিয়া ক্রেতার তাহাদের প্রয়োজনমত নানাবিধ জিনিস একই দোকান হইতে ক্রয় করিবার সুযোগ পায় না। তাহা ছাড়া একই ধরণের পণ্য বিক্রয় করা হয় বলিয়া এসকল দোকানে বৈচিত্র্য আনয়ন করা কষ্ট সাধ্য। ক্রেতারও নিজেদের পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পায় না।

(২) এই ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা একই পরিচালনাধীন বলিয়া প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রভূত মূলধনের অভাবে বহুশাখা বিপণি সূষ্ঠাভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(৩) বহুশাখা বিপণি পরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। বিভিন্ন দোকানগুলির কাজে কোন রকম ক্রটি যাহাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পরিচালকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে বহুশাখা বিপণি ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(৪) বহুশাখা বিপণি কালক্রমে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ একচেটিয়া কারবাবে পরিণত হইলে বিক্রেতা পণ্যমূল্য অত্যধিক বাড়াইয়া দিতে পারে। বাজারে প্রতিযোগী বিক্রেতা না থাকার দরুণ ক্রেতাকে অনেক সময় বেশি মূল্য দিয়া বহুশাখা বিপণি হইতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় বলিয়া তাহার আর্থিক ক্ষতি হয়।

**বিভাগীয় বিপণি ও বহুশাখা বিপণির মধ্যে তুলনা। ( Comparison between Departmental Stores and Multiple Shops ).**

কার্যক্রম ও প্রকৃতি অল্পসারে বিভাগীয় বিপণি এবং বহুশাখা বিপণির মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ তুলনা করা যায়।

### বিভাগীয় বিপণি

১। ইহাতে নানা জাতীয় পণ্য বিক্রয় হয়।

২। এইরূপ বিপণির মালিকগণ নিজেরা উৎপাদক নন। তাঁহারা শুধু পণ্য বণ্টন কার্যে লিপ্ত থাকেন।

৩। বিভাগীয় বিপণিতে যে সকল পণ্য বিক্রয় করা হয় তাহা বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সুতরাং এইখানে উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত (decentralised production) কিন্তু উৎপাদিত জব্যের বণ্টন কেন্দ্রীভূত (centralised distribution)

৪। এইরূপ বিপণি সাধারণত বড়বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হয়।

৫। এইরূপ বিপণিতে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী ক্রেতা পণ্য ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আসে।

৬। পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে বিভাগীয় বিপণি অনেক সময় মধ্যস্থ কারবারীর উপর নির্ভর করে।

৭। এইরূপ বিপণিতে নানা-ধরনের পণ্য অধিক পরিমাণে মজুত রাখিতে হয়।

৮। বিভাগীয় বিপণি সাধারণত ধনী ক্রেতাদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী।

### বহুশাখা বিপণি

১। ইহাতে সাধারণত এক-জাতীয় পণ্য বিক্রয় হয়।

২। এইরূপ বিপণিতে উৎপাদক নিজেই তাহার উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন কার্যে লিপ্ত থাকেন।

৩। বহুশাখা বিপণিতে যে পণ্য বিক্রয় করা হয় তাহার উৎপাদন কেন্দ্রীভূত (centralised production) কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন বিভিন্ন শাখা বিপণির মাধ্যমে হইয়া থাকে। সুতরাং বণ্টন বিকেন্দ্রীভূত (decentralised distribution)

৪। এইরূপ বিপণি ছোটবড় সকল রকম শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে।

৫। এইরূপ বিপণি বিভিন্নস্থানে অবস্থানকারী ক্রেতাদের আবাসস্থলের নিকটে স্থাপিত হয়।

৬। নিজেরাই উৎপাদক বলিয়া এইরূপ বিপণিতে মধ্যস্থ কারবারীর প্রয়োজন নাই।

৭। এইরূপ বিপণিতে পণ্য অধিক পরিমাণে মজুত না রাখিলেও চলে। কারণ প্রয়োজন হইলেই অল্প সমশ্রেণীর দোকান হইতে একই জাতীয় পণ্য সংগ্রহ করা যায়।

৮। বহুশাখা বিপণিতে সাধারণ ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দমত পণ্য কমমূল্যে ক্রয় করিবার সুযোগ পায়।

### চেইন স্টোরস ( Chain Stores )

(চেইন স্টোরস খুচরা কারবারেরই এক বিশেষ ধরনের সংগঠন। এইরূপ কারবারে খুচরা বিক্রেতা প্রথমত কয়েক জাতীয় পণ্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া কোন একটি স্থানে গুদামজাত করে। তাহার পর বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া এইসব পণ্য বিক্রয় করে। এইরূপ খুচরা-কারবাবী নিজে পণ্য উৎপাদন করে না।<sup>১</sup> ইহারা উৎপাদকের নিকট হইতে পাইকারী হারে পণ্য ক্রয় কবে।<sup>২</sup> (পরে এইসব পণ্যই খুচরা দরে বিভিন্ন দোকানে মারফৎ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে। স্বতরাং পণ্য উৎপাদকের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। এইরূপ কারবার-সংগঠনের সঙ্গে বহুশাখা বিপণিব ( Multiple Shop ) অনেক সাদৃশ্য আছে। আমেরিকায় বহুশাখা বিপণিকেই ‘চেইন স্টোবস’ বলা হয়। অবশ্য বহুশাখা বিপণি ও ‘চেইন স্টোরস’ এর মধ্যে পার্থক্যও আছে। যথা) —

(১) ‘বহুশাখা বিপণি’র ক্ষেত্রে পণ্য-উৎপাদকই বিক্রেতা। অর্থাৎ উৎপাদক নিজেই তাহার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এইরূপ কারবারে মধ্যস্থ কারবারীর কোন স্থান নাই। ফলে, উৎপাদকের মুনাফাব পরিমাণ অধিক হয়। কিন্তু ‘চেইন স্টোরস’ এর কারবারী একজন মধ্যস্থ কাষবারী। সে নিজে পণ্য উৎপাদন করে না। সে যে সকল পণ্য বিক্রয় করে তাহা উৎপাদকের নিকট হইতে পাইকারী হারে ক্রয় করিয়া পরে খুচরা দরে বিক্রয় করে।

(২) বহুশাখা বিপণিতে বহুসংখ্যক পণ্য বিক্রয় করা হয় না। সাধারণত এক জাতীয় পণ্য অথবা কয়েকটি সল্প সংখ্যক পণ্যই এই সব দোকানে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু ‘চেইন স্টোরস’এ নানাবিধ পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

‘চেইন স্টোরস’ কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ষাবতীয় পণ্য কেন্দ্রীয় অফিসই ক্রয় করিয়া তাহার অধীনে কেন্দ্রীয় গুদামে মজুত করে। বিভিন্ন দোকানে প্রয়োজনানুসারে এই কেন্দ্রীয় গুদাম হইতেই সময়মত পণ্যের যোগান দেওয়া হয়।

### এক মূল্যের দোকান (One price shop )

এক মূল্যের দোকান আমাদের দেশে খুব প্রচলিত না হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় এইরূপ দোকান খুবই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাও এক ধরণের খুচরা কারবার। এইরূপ কারবারী নানা রকমের দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু সব রকম দ্রব্যের দামই এক। আমাদের দেশে এক ধরণের ফেরিওয়ালার সঙ্গে আমরা পরিচিত যারা ঠেলাগাড়ী করিয়া হরেক রকমের দ্রব্য বিক্রয় করে। কিন্তু সব রকমের জিনিসেরই দাম এক। এইরূপ ফেরিওয়ালার কারবার ও এক মূল্যের দোকানের একটা নমুনা, যদিও ইহা স্বসংবদ্ধ নয়।

এইরূপ দোকানের সুবিধা এই যে—

(১) এখানে দর কষাকষির কোন স্থান নাই; ক্রেতারা জানে কোন দ্রব্য কি দামে তাহারা এখানে ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে না হইলে তাহারা এইরূপ দোকানে আসিবেই।

(২) দ্বিতীয়ত, নানা রকমের জিনিস একই দরে পাওয়া যায় বলিয়া অল্প মূল্যে ভাল জিনিস ক্রয় করিবার আশায় অনেকে এইসব দোকানে আসে।

(৩) তৃতীয়ত, একদরে নানা রকমের দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া প্রয়োজন না থাকিলেও অনেকে বিভিন্ন রকমের দ্রব্য এইসব দোকান হইতে ক্রয় করে। সুতরাং এইরূপ দোকানে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

(৪) চতুর্থত, এইরূপ দোকানে সর্বোচ্চ ও সর্বান্নিম্ন দর লেখা থাকে বলিয়া ক্রেতারা পণ্য মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

### খুচরা সমবায় বিপণি (Retail Co-operative Store)

উৎপাদক ও প্রকৃত সন্তোগকারীর মধ্যে মধ্যস্থ কারবারী—যথা, পাইকারী ও খুচরা কারবারী, থাকার ফলে প্রকৃত সন্তোগকারীকে অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করিতে হয়। কারণ উৎপাদক যে দরে পাইকারের নিকট পণ্য বিক্রয় করে, পাইকার তদপেক্ষা বেশি দামে সেই পণ্য খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে। খুচরা কারবারী ও আবার সেই পণ্যের উপর দাম কিছু বাড়াইয়া ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ না করিলে পাইকার অথবা খুচরা কারবারীর মুনাফা থাকে না। ফলত অতিরিক্ত মূল্যের চাপ আসিয়া পড়ে প্রকৃত ক্রেতার উপর। আবার অনেক সময় মধ্যস্থ কারবারীরা অসহৃদয় অবলম্বন করে। তাহারা নানারূপভাবে ভাল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা করে। মধ্যস্থ কারবারীদের বিরুদ্ধে এইসব বিশেষ অভিযোগ। এই কারণে দেখা যায়, ক্রেতারা মধ্যস্থ কারবারীদের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্ত অনেক সময় নিজেরাই সমবায়ের আদর্শে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে।

প্রথমত কিছু সংখ্যক লোক মিলিত হইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ইহারা সকলেই সেই সমিতির সদস্য। সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহাই সমিতির প্রাথমিক মূলধন। এইরূপ সমিতি সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে এবং সমবায় বিপণিতে মজুত করে। কেবলমাত্র সদস্যরাই এইরূপ বিপণি হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। মুনাফা অর্জন করা এইরূপ বিপণির উদ্দেশ্য নয় বলিয়া ক্রেতাসদস্যরা এইরূপ বিপণি হইতে ন্যায়মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারে। ততুপরি ভেজাল পণ্য ক্রয়ের আশঙ্কাও তাহাদের থাকে না। এইরূপ বিপণিতে পরিচালন-ব্যয় ইত্যাদি বাবদ যাহা খরচ হয় তদতিরিক্ত যাহা থাকে তাহা হইতে কিছু অর্থ সঞ্চয় খাতে জমা রাখিয়া বাদবাকি অর্থ সদস্যদের মধ্যে শেয়ারের অনুপাতে অথবা মোট ক্রয়ের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

অনেক সময় উৎপাদকেরাও এইরূপ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদক সমবায় (Producer's Co-operative) গঠন করিয়া থাকে।

### ডাক মারফৎ ব্যবসায় (Mail order business)

বর্তমানকালে ডাক মারফৎ যোগাযোগের নানা সুবিধা থাকার ফলে ডাক মারফৎ ব্যবসায় ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যবসায়ে ডাক মারফৎই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ও ডাক মারফৎ হয়।

প্রথমত, এইরূপ ব্যবসায়ী সুনির্বাচিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাহার পণ্যের প্রচা-  
বের ব্যবস্থা করে। এইরূপ প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে ক্রেতা পণ্য-  
বিবরণ ও পণ্য মূল্য জানিবার জন্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে পত্রালাপ করে।  
তখন ব্যবসায়ী ডাকযোগে পণ্যও তাহার মূল্য সম্পর্কিত বাবতীয় তথ্যাদি  
সম্বলিত 'ক্যাটালগ' বা 'বিবরণী' সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পাঠায়। ক্রেতা  
এইরূপ বিবরণী হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে ডাকযোগে  
বিক্রেতার নিকট অর্ডার পাঠায়। বিক্রেতা তখন সেই অর্ডার বা নির্দেশ-  
পত্র অনুযায়ী দ্রব্য যত্নের সঙ্গে প্যাক করিয়া ডাক মারফৎ ক্রেতার ঠিকানায়  
প্রেরণ করে। পণ্যটি ডাকে মূল্য শোধের ব্যবস্থায় (Value Payable  
Post) পাঠানো হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্ডারের সঙ্গেই  
পণ্য মূল্যের কিয়দংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা করে।

### ডাক মারফৎ ব্যবসায়ের সুবিধা অসুবিধা ( Advantages and Disadvantages ).

**সুবিধা :** এইরূপ ব্যবসায়ের প্রধান সুযোগ এই যে, ইহার জন্ত কোনরূপ দোকান বা অফিস খুলিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে দোকানের সজ্জা-পারিপাট্য ইত্যাদির জন্ত কোন খরচ করিতে হয় না। ইহাতে বিক্রেতার বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় অনেক কমিয়া যায়।

**অসুবিধা :** (১) এইরূপ ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যের উপর। কারণ এইরূপ ব্যবসায়ে ক্রেতা সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্ত কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা যায় না।

(২) ডাক-বিভাগের কর্মতৎপরতার উপর সর্বাংশে নির্ভর করাও সমীচীন নয়।

(৩) ক্রেতা বিজ্ঞাপন দেখিয়াই পণ্য ক্রয় করে। পরে সেই পণ্য যদি কোন কারণে তাহার মনোমত না হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিকার বিধান করা ক্রেতার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

### খুচরা কারবারে মূল্য-পরিশোধের পদ্ধতি : ( Methods of payment in retail trade )

খুচরা কারবারে সাধারণত নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিভাগীয় বিপণিতে মাঝে মাঝে ধারে ও পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

অনেক সময় পণ্য-মূল্য যদি অধিক হয় তাহা হইলে অনেক ক্রেতার পক্ষেই একসঙ্গে নগদ মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্রেতাদের সুবিধার জন্ত বিলম্বে মূল্য পরিশোধে ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা দুই প্রকার। যথা : (১) কিস্তিবন্দী ক্রয় ব্যবস্থা (Hire Purchase System) (২) কিস্তিবন্দী অথবা বিলম্বিত মূল্য প্রদান ব্যবস্থা ( Instalment or Deferred payment Sysytem )।

#### কিস্তিবন্দী ক্রয়ব্যবস্থা (Hire Purchase System)

এইরূপ ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে ক্রেতা সহজ কিস্তিতে পণ্য মূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়। প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি গ্রহণ করে এবং তাহা ভোগ করিতে থাকে। পরে চুক্তি অনুসারে মাসিক বা অল্প

নির্দিষ্ট কিস্তিতে পণ্য মূল্যের বাকী অংশ পরিশোধ করিতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যতদিন শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত দ্রব্যটির মালিকানা স্বত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। মনে করা হয় যেন দ্রব্যটি ক্রেতাকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোন কারণে কিস্তি বাকী পড়িলে বিক্রেতা দ্রব্যটি ফেরৎ লইয়া যাইতে পারে। এ যাবৎ যত টাকা কিস্তি হিসাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাড়া বাবদ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ মনে করা হয়। এইজন্য শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা দ্রব্যটি অথ কাহারও নিকট বিক্রয়ও করিতে পারে না।

### কিস্তিবন্দী ক্রয় ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages)

**সুবিধা :** এইরূপ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা এই যে, সহজ কিস্তিতে পণ্য-মূল্য পরিশোধের সুযোগ থাকার ফলে স্বল্পবিত্ত লোকও অধিক মূল্যের পণ্য ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে পারে।

#### অসুবিধা :—

(১) শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্যটির উপর ক্রেতা মালিকানা স্বত্ত্ব পায় না বলিয়া সর্বক্ষণ তাহাকে একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটাইতে হয়।

(২) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করিতে হইলে সাধারণত পণ্য-মূল্য বাজার দর অপেক্ষা বেশি পড়ে। নগদ মূল্যে যে দ্রব্য ২০০ টাকায় ক্রয় করা যায়, কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-ব্যবস্থায় সেই দ্রব্যেরই হ্রত দাম হয় ৩০০ টাকা। কারণ এইরূপ ব্যবস্থায় বিক্রয়মূল্যের উপর সুদও যোগ করা হইয়া থাকে।

(৩) কোন কারণে মূল্য পরিশোধ না হইলে বিক্রেতাকে মামলা-মোকদ্দমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

### কিস্তিবন্দী অথবা বিলম্বিত মূল্য প্রদান পদ্ধতি (Instalment or Deferred Payment System)

কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-ব্যবস্থা এবং কিস্তিবন্দীতে মূল্য প্রদান পদ্ধতি প্রায় একই রকমের ব্যবস্থা। তবে পার্থক্য এই যে কিস্তিবন্দী মূল্য-প্রদান পদ্ধতিতে প্রথম কিস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটির উপর ক্রেতার স্বত্ত্ব জন্মায়। সুতরাং শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্যটি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে

এইরূপ মনে করা হয় না। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রেও ক্রেতা যদি তাহার কিস্তির টাকা না দেয় তাহা হইলে বিক্রেতা আইনের সাহায্যে সে টাকা উদ্ধার করিতে পারে।

### মধ্যস্থ কারবারী (Middleman)

বর্তমান যুগে উৎপাদক ও প্রকৃত স্বত্তাগ্রহকারীর মध्ये প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুবই কম। মধ্যস্থ কারবারীর মাধ্যমে ইহাদের মধ্যে সাধারণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পাইকার এবং খুচরা কারবারী এইরূপ মধ্যস্থ কারবারী। কিন্তু ইহারা ছাড়াও মধ্যস্থ কারবারী আছে। যথা :—দালাল (Broker), ফ্যাক্টর (Factor), প্রতিনিধি (Agent), ঝুঁকি-বাহক প্রতিনিধি (Del credere Agent), নিলামদার (Auctioneer) ইত্যাদি।

### দালাল (Broker) :

দালাল একজন মধ্যস্থ কারবারী। এইরূপ কারবারী ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগ সাধন করে। আর এটি যোগ সাধন কবাটাই তাহার প্রধান কাজ। প্রকৃত ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রথমত দালালের মাধ্যমে বারবারী চালায়। পবে দব ঠিক হইলে নিজেবা মিলিত হইয়া চুক্তি সম্পাদন করে। এইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত দালাল যে পৰিশ্রম করে তাহার জন্ত সে পাবশ্রামক পায়। ইহাকে বলা হয় ‘দালালী’ (Brokerage)। ‘দালালী’ ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের নিকট হইতেই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লগযোগ্য যে, প্রকৃত দ্রব্যটির উপর দালালের কোন দখল থাকে না। দ্রব্যটি নিজে গ্রহণ করিয়া সে বিক্রয় করে না। তাহার কাজ শুধু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা। সুতরাং দালালের ঝুঁকি বিশেষ কিছুই থাকে না।

ফ্যাক্টর (Factor) : অনেক সময় উৎপাদক অথবা পাইকারী ব্যবসায়ী নিজেদের পণ্য বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় কবিরাব উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। এই সব প্রতিনিধিবা উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট বিক্রয়ার্থে যে পণ্য পায়, তাহা নিজেব হেপাজতে রাখে। আর নিজেব নামেই তাহা সুরিধাজনক দবে বিক্রয় করে। পবে বিক্রয় মূল্য উদ্ধার কবিয়া তাহা উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট পাঠাওয়া দেয়। এই সব প্রতিনিধিদের বলা হয় ফ্যাক্টর (Factor)। ইহারা তাহাদের কাথের জন্ত কমিশন পায়।



**প্রতিনিধি (Agent):** অনেক কারবারী দূরদেশে তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকট পণ্য পাঠাইয়া দেয়। এই সব প্রতিনিধিরা পণ্য প্রেরকের নামে, সময়মত ও যথোচিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। পণ্য প্রাপক (Consignee) এইরূপ প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরা নিজেদের কার্যের জন্য কমিশন পায়।

### ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি (Delcredere Agent) :

অনেক সময় প্রতিনিধিরা পণ্য-প্রেরককে প্রতিশ্রুতি দেয় যে বাকী বিক্রয় ক্ষেত্রে পণ্য-ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ণ অর্থ আদায় করিবার দায়িত্ব তাহাদের। এইরূপ প্রতিনিধিদে বলা হয় 'ঝুঁকি বাহক প্রতিনিধি'। এষ্ট ব্যবস্থায় পণ্য-প্রেরকের বাকী বিক্রয় জনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়। এইরূপ ঝুঁকি বাহক প্রতিনিধি পণ্য-প্রেরকের নিকট হইতে সাধারণ কমিশন ছাড়াও অতিরিক্ত কমিশন আদায় করে।

### নিলামদার (Auctioneer) :

অনেক সময় পণ্য-বিক্রেতারা নিলামে পণ্য বিক্রয় করে। এই উদ্দেশ্যে ইহার নিলামদার নিযুক্ত করে। কোন পণ্যের সর্বনিম্ন দাম প্রথমে স্থির করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর নিলামদারেরা বিক্রেতার পক্ষ হইয়া বাজারে সেই পণ্যের নিলাম ডাকে। যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে রাগী হয় তাহার নিকট পণ্য বিক্রয় করা হয়। নিলামদার তাহার কার্যের জন্য কমিশন পায়। নিলামদারকে সর্ববিষয়ে বিক্রেতার নির্দেশ মত চলিতে হয়।

### অনুশীলনী

- (1) What do you mean by Home Trade ?  
(আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলিতে কি বুঝায়?)
- (2) What is Wholesale Trade ? What are the Functions of a Wholesaler ?  
(পাইকারী কারবার কি ? পাইকারের কাজ কি কি ?)
- (3) What is Retail Trade ? How retail trade is organised ?  
(খুচরা কারবার কি ? খুচরা কারবার কিরূপে সংগঠিত হয় ?)
- (4) What is a Departmental Store ? What are its advantages and disadvantages ?  
(‘বৈভাগীয় বিপণি’ কি ? ‘বৈভাগীয় বিপণি’র সুবিধা-অসুবিধাগুলি কি কি ?)

(5) What is a Multiple shop ? what are its advantages and dis-advantages ?

(বহুশাখা বিপণি কি ? বহুশাখা বিপণির সুবিধা অসুবিধা কি কি ?)

(6) Distinguish between a Departmental store and a Multiple Shop.

(বিভাগীয় বিপণি ও বহুশাখা বিপণির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।)

(7) What is a Chain store ? Distinguish between a Chain store and a Multiple Shop ?

‘চেইন স্টোর’ কি ? ‘চেইন স্টোর’ ও ‘বহুশাখা বিপণির’ মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(8) Write short notes on:—

(a) One Price Shop.

(b) Mail order Business.

(c) Hire Purchase and Instalment Payment Systems . . .

(d) Retail Co-operative Store.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—

(ক) এক মূল্যের দোকান,

(খ) ডাক মাধ্যমে ব্যবসায়,

(গ) কিস্তিবন্দী ক্রয় ও বিলম্বিত মূল্য প্রদান ব্যবস্থা,

(ঘ) খুচরা সমবায় বিপণি

(9) What are the different types of Middlemen ?

What are the services and disservices of middleman ?

( বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্থ কারবারীর বিবরণ লেখ।

মধ্যস্থ কারবারীর সুফল ও কুফল কি কি ?)

---

## চতুর্থ অধ্যায়

### পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (Buying and Selling of Goods)

ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল ক্রয়-বিক্রয়। উৎপাদক, পাইকার ও খুচরা কারবারী সকলেই এই ক্রয়-বিক্রয়কার্যে লিপ্ত। উৎপাদক তাহার পণ্য উৎপাদনের জন্ত ক্রয় করে, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি, আর বিক্রয় করে উৎপাদিত পণ্য। পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে, তাহা বিক্রয় করে খুচরা কারবারীর নিকট। আবার, খুচরা কারবারী পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে পাইকারের নিকট হইতে এবং সেই পণ্য বিক্রয় করে প্রকৃত সন্তোগকারীর নিকট। সুতরাং উৎপাদক, পাইকার ও খুচরা কারবারী প্রত্যেকেই একাধারে ক্রেতা ও বিক্রেতা। একমাত্র প্রকৃত সন্তোগকারীই পণ্য ক্রয় করিয়া আর তাহা বিক্রয় করে না। কারণ, সে নিজেই তাহা ভোগ করে। উৎপাদক পাইকার ও খুচরা কারবারী সকলেই এই ক্রয়-বিক্রয় কার্যে লিপ্ত থাকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায়কে লাভজনক করিতে হইলে, এই ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ ভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন রূপ ভুলভ্রান্তি ঘটিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই কারণে ব্যবসায়ীকে বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। অর্থাৎ কোন পণ্যের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে তাহার ধারণা যদি স্পষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহার ব্যবসাতে সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

### ক্রেতার শ্রেণী-বিভাগ

ক্রেতাদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা : (১) উৎপাদক-ক্রেতা, (২) পাইকারী-ক্রেতা, (৩) খুচরা ক্রেতা (৪) সন্তোগকারী ক্রেতা।

### উৎপাদক-ক্রেতা :

- উৎপাদক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁচামালের রূপান্তর ঘটাইয়া তাহাকে ভোগ্য-পণ্যে পরিণত করে। সুতরাং তাহাকে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হয়। এই হিসাবে উৎপাদকও ক্রেতা।

পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদক একই সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে। কাঁচামাল ক্রয়-ব্যাপারে তাহাকে দুইটি বিষয়ের

উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়।—(১) যতটা সম্ভব অল্প মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করা। ইহাতে তাহার উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। এবং—

(২) কাঁচামাল ক্রয় করিবার পর তাহা মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্ত করা। ইহার জগ্নু স্থানির্মিত ও সুরক্ষিত একটি গুদামঘরের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। একজন বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে গুদামঘরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

### পাইকারী-ক্রেতা :

পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে বহু পণ্য একসঙ্গে ক্রয় করিয়া মজুত রাখে। তাহাকেও পণ্যের ক্রয়মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। আবার পণ্য ক্রয়ের পর তাহা মজুত রাখিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়। তবে, উৎপাদক ও পাইকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে—উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ক্রয় করে, আর পাইকার সাধারণত ক্রয় করে উৎপাদিত পণ্য।

### খুচরা-ক্রেতা :

খুচরা কারবারী প্রকৃত সন্তোগকারীদের রুচি অনুধাবন করিয়া তাহাদের চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে পাইকারদের নিকট হইতে নানাবিধ পণ্য ক্রয় করে। উৎপাদক ও প্রকৃত সন্তোগকারীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে খুচরা কারবারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, খুচরা কারবারীরাই সন্তোগকারীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। সুতরাং, সন্তোগকারীদের চাহিদা, রুচি ইত্যাদি বিষয়ে খুচরা-ক্রেতা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকে। তাই এই বিষয়ে তাহারা পাইকার বা উৎপাদককে পরামর্শ দিতে পারে।

### সন্তোগকারী-ক্রেতা

সন্তোগকারী ক্রেতা খুচরা কারবারীদের নিকট হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দমত পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা পণ্য ক্রয় করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়। নিজেরা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহারা পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে।

### পণ্য-বিক্রয় : (Selling)

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্রয়-বিক্রয়ের উপরই শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভর করে। বস্তুত শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে যথার্থ পণ্য-বিক্রয়ের উপর। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

প্রাণকেন্দ্র মুনাফা অর্জন। সার্থক বিক্রয় ব্যবস্থার উপরই মুনাফা অর্জন নির্ভর করে। পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা মুনাফা অর্জন করিতে হইলে বিক্রেতাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথা :—(১) ক্রেতাদের রুচি ঠিক ঠিক অনুধাবন করিয়া পণ্যের যোগান দেওয়া।

(২) অধিক মূল্যে পণ্য-বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যথার্থ বিক্রয় স্থান অর্থাৎ বাজার নির্বাচন করা।

(৩) চাহিদা ও যোগানের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া যথাযথ পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করা।

### বিক্রেতার শ্রেণী বিভাগ :

ক্রেতাদের মত বিক্রেতাদেরও নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) উৎপাদক-বিক্রেতা—ইহারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য পাইকার-দের নিকট বিক্রয় করে।

(২) পাইকারী-বিক্রেতা—ইহারা খুচরা কারবারীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে।

(৩) খুচরা-বিক্রেতা—ইহারা প্রকৃত সন্তোগকারীর নিকট নানা বিধ পণ্য বিক্রয় করে।

পাইকার ও খুচরা কারবারী সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের সাফল্যের উপর সমগ্র ব্যবসায়ের সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, সেই কারণে ক্রয়-বিক্রয় বিভাগ বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Three aspects of a Buying-selling Transaction).

ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে ব্যবসায়ীকে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথা : (১) ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য (goods) (২) পণ্যের বিলি ব্যবস্থা (Delivery of goods)। (৩) পণ্যের মূল্য পরিশোধ (payment).

#### (১) ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য (goods)

প্রথমত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে স্থির করিতে হইবে কোন্ পণ্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হইবে। ইহার পর স্থির করিতে হইবে কত পরিমাণ পণ্য

ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হইবে, সেই পণ্যের গুণাগুণ কি রকম, পণ্যের ট্রেড মার্ক ও ব্রাণ্ড কি ইত্যাদি।

অনেক উৎপাদক নিজের উৎপাদিত পণ্যকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিবার জন্ত আইন অনুযায়ী একটি বিশেষ চিহ্ন সরকার কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে পারে। ইহাকে বলা হয় 'ট্রেড মার্ক' বা 'ব্যবসায় চিহ্ন'। যেমন আমরা লক্ষ্য করিব যে বাজারে নানা প্রকার নারিকেল তৈল শিশিতে অথবা টিনের কোটায় বিক্রয় হয়। ঐ সব অনেক শিশিতে অথবা কোটায় দু'একটি নারিকেল গাছ বা অল্প কোন রকম চিহ্ন দেওয়া থাকে। এ সব চিহ্নগুলিই 'ট্রেডমার্ক' (Trade Mark)।

একটি পণ্যের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়া একই উৎপাদক সেই পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। এক একটি শ্রেণীকে বলা হয় ব্রাণ্ড (Brand)। যেমন, স্থলোখা কালির অভিনারী এবং স্পেসাল—এই দুইটি ব্রাণ্ড রহিয়াছে।

অনেকক্ষেত্রে উৎপাদক যখন কোন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করে, তখন অপর কোন উৎপাদক সেই দ্রব্য একই নামে অন্তত কিছুদিন উৎপাদন করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে উৎপাদক সরকার হইতে বিশেষ অধিকার লাভ করিতে পাবে। ইহাকে বলা হয় পেটেন্ট অধিকার, (Patent Right)। কোন উৎপাদক পেটেন্ট-অধিকার প্রাপ্ত হইলে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অপর কোন উৎপাদক সেই পণ্য উৎপাদন করিতে পারে না।

ট্রেড মার্ক, ব্রাণ্ড ও পেটেন্ট প্রভৃতির স্ববিধা এই যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই সব বিশেষ চিহ্ন সম্বলিত পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধ করে। সুতরাং পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারেও তাহাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

### পণ্যের বিলি-ব্যবস্থা (Delivery of Goods) :

পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পর ইহার বিলি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। অর্থাৎ পণ্য কিভাবে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে হস্তান্তরিত হইবে তাহা বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কে স্থির করিয়া লইতে হয়।

খুচরা কারবারে পণ্যের বিলি-ব্যবস্থার বিশেষ কোন সমস্যা নাই। কারণ, খুচরা পণ্য-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাই সেই পণ্য গ্রহণ করে। কিন্তু পাইকার যখন উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে, অথবা খুচরা কারবারী যখন পাইকারের নিকট হইতে

পণ্য ক্রয় করে তখন পণ্যের বিলি ব্যবস্থার সমস্তা দেখা দেয়। কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে বেশী পণ্য থাকে বলিয়া সব সময় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য হস্তান্তরিত হয় না। পণ্য কিভাবে হস্তান্তরিত হইবে ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তির দ্বারা স্থির করা হয়। দুইভাবে পণ্যের বিলি ব্যবস্থা করা যায়। যথা—

### (১) সঙ্গে সঙ্গে বিলি-ব্যবস্থা (Ready Delivery) :

এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রেতার হস্তে অর্পিত হয়।

### (২) ভবিষ্যৎ বিলি-ব্যবস্থা ( Future Delivery ) :

এই ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি অল্পসারে স্থির করা হয় ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটা সুবিধা এই যে, পণ্য বিক্রেতা বিক্রয়ের সময় নিজের কাছেই প্রয়োজনমত পণ্য মজুত নাও রাখিতে পারে। কারণ বিক্রয়েব সঙ্গে সঙ্গে যখন পণ্য হস্তান্তরিত হইতেছে না তখন ভবিষ্যতে যে সময়ে পণ্য বিলি করিতে হইবে সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেই পণ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। এইরূপ ব্যবস্থায় পণ্য-মূল্য নির্দ্ধারণ করা একটি সমস্তা। কারণ, বর্তমানে কোন পণ্যের যে বাজারদর—ভবিষ্যতে তাহা ঠা-নামা করিতে পাবে। এই জন্ত স্থিতি হয় যে বর্তমান বাজারদরে ভবিষ্যতে পণ্য বিলি করা হইবে। ইহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। কারণ, কোন পণ্যের বর্তমান বাজার দর যদি ভবিষ্যতে কমিয়া যায় তাহা হইলে ক্রেতাব পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক। কিন্তু, বিক্রেতার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক। কারণ, সে বিলির পূর্বে কম দরে ক্রয় করিয়া পূর্ব-নির্দ্ধারিত বেশীমূল্যে বিক্রয় করিতে পাবে। আবার, বর্তমান বাজার দর যদি ভবিষ্যতে বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতার পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক। কিন্তু ক্রেতার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক। কারণ, মূল্য বাড়িয়া গেলেও সে পূর্ব নির্দ্ধারিত কম মূল্যে পণ্য পাইতেছে। যেমন, মনে করা যাক, কোন পণ্যের বর্তমান বাজার দর ১৫ টাকা। ভবিষ্যতে যখন সেই পণ্য বিলি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই সময় দেখা গেল সেই পণ্যের দাম কমিয়া ১০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ক্রেতাকে পূর্ব চুক্তি অল্পসারে সেই পণ্যের জন্ত ১৫ টাকা দিতে হইবে। স্বতরাং প্রতি পণ্যে তাহাকে ৫ টাকা করিয়া বেশী দিতে হইবে। ইহাতে তাহার প্রতি পণ্যে ৫ টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু বিক্রেতার ইহাতে প্রতি পণ্যে ৫ টাকা লাভ হইল।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

অল্পরূপ ভাবে সেই পণ্যেরই দাম যদি ভবিষ্যতে বাড়িয়া ২০ টাকা হয় তাহা হইলে বিক্রেতার পক্ষে তাহা ক্ষতির কারণ হইবে। কারণ পূর্বে চুক্তি অল্পসারে তাহাকে সেই পণ্য ১৫ টাকা দরেই বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ক্রেতার পক্ষে ইহা লাভজনক। কেননা সেই পণ্যের ভণ্ডনকারি বাজার দর ২০ টাকা হইলেও তাহাকে ১৫ টাকা দিলেই চলিবে।

### • পণ্য বিলি-ব্যবস্থার পরিবহন সংক্রান্ত সমস্যা :

খুচরা কারবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্রয় কেন্দ্রেই পণ্যের বিলি-ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পাইকারী কারবারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরিবহনের নানারূপ ব্যবস্থা আছে। যেমন, রেলপথ, সড়ক, ষ্টিমার, বিমানপথ ইত্যাদি। ইহাদের কোনটির মাধ্যমে পণ্য ক্রেতার নিকট পৌছাইতে হইবে তাহা ক্রেতাও বিক্রেতার মধ্যে পূর্ব-চুক্তি অল্পসারে স্থির করা হয়। পরিবহনের ব্যয় মূল্যের দামের সঙ্গে ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। পরিবহন ব্যবস্থা স্থির করিবার সময় ক্রেতাও বিক্রেতা উভয়ে পরিবহনের ব্যয়ভার সম্পর্কে চিন্তা করে। কারণ পরিবহন-ব্যয় অধিক হইলে পণ্য-মূল্যও বাড়িয়া যায়। দূরত্ব, পণ্যের গুণাগুণ (অর্থাৎ, পণ্য দীর্ঘস্থায়ী না শীঘ্র পচনশীল, অথবা ভঙ্গুর না কঠিন) এবং পণ্যের মূল্য এবং যোগানের সময়ের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া পরিবহন ব্যবস্থা স্থির করা হয়।

### পণ্যের মূল্য পরিশোধ (Payment) :

পণ্যের মূল্য পরিশোধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথা : (১) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, (২) পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়, (৩) পণ্যের মূল্য পরিশোধের উপায়।

#### (১) পণ্য মূল্য নির্ধারণ :

ক্রেতা এবং বিক্রেতা অনেক সময় পরস্পর দর কষাকষি করিয়া পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিক্রেতা তাহার বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর দর সম্বলিত মূল্য তালিকা (Price list) প্রকাশ করে। এই তালিকায় বিভিন্ন পণ্যের দাম স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এবং তালিকায় নির্দিষ্ট দামে সকল পণ্য বিক্রয় করা হয়। পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময় অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মূল্য তালিকায় উল্লিখিত দর হইতে শতকরা হারে কিছু বাদ দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় 'ট্রেড ডিস্কাউন্ট'



(Trade Discount) বা 'ব্যবসায়িক সুবিধা'। এই সুবিধা শুধু ব্যবসায়ীরাই পাইয়া থাকে। এই সুবিধা না পাইলে কোন ব্যবসায়ীই তালিকাবদ্ধ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না। সন্তোগকারী এই সুবিধা সাধারণত পায় না। ক্রেতা এই 'ব্যবসায়িক-সুবিধা' ছাড়া আরও এক ধরনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। তাহাকে বলা হয় 'ক্যাশ ডিসকাউন্ট' (Cash Discount) বা মূল্য নগদ পরিশোধের সুবিধা। পণ্য-ক্রেতা নগদ টাকায় মূল্য পরিশোধ করিলে অনেক সময় এইরূপ সুবিধা ভোগ করে।

## (২) পণ্য-মূল্য পরিশোধের সময় :

পণ্য যেমন নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, আবার ধারেও অনেক সময় বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সাধারণত খুচরা কারবারে নগদ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে। নগদ মূল্যে যখন পণ্য ক্রয় করা হয়, তখন ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাকে পণ্য মূল্য পরিশোধ (Ready Payment) করিতে হয়।

যখন ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, তখন বিলম্বে মূল্য পরিশোধের (Deferred Payment) ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। বিলম্বে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাকে ও কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) ধারে বিক্রয় (Credit Sale), (২) কিস্তিবন্দী ক্রয় ব্যবস্থা (Hire Purchase System), (৩) বিলম্বে মূল্য প্রদান পদ্ধতি (Instalment Payment Method)।

যখন পণ্য ধারে বিক্রয় (credit sale) করা হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি অনুসারে একটি সময় নির্দিষ্ট হয়, যে সময়ান্তরে ক্রেতা পণ্য মূল্য পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হয়। সাধারণত বিক্রেতা খুব বেশি সময়ের জন্য ধারে পণ্য বিক্রয় করে না।

কিস্তিবন্দী ক্রয়-ব্যবস্থায় (Hire Purchase) চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তিতে ক্রেতা পণ্য মূল্য পরিশোধ করে। প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য ক্রেতার হস্তে অর্পণ করা হয়। তবে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, শেষ কিস্তির টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা পণ্যের মালিকানা সর্ব পায় না। এই ব্যবস্থায় পণ্যের ঝুঁকি বিক্রেতার; ক্রেতা কিস্তি বন্ধ করিয়া চুক্তি শেষ করিতে পারে; ক্রেতা শেষ কিস্তি পরিশোধ না করা পর্যন্ত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না এবং ক্রেতার কোন কিস্তি বাকী পড়িলে বিক্রেতা পণ্য ফেরত লইতে পারে..... ইত্যাদি কতগুলি

বৈশিষ্ট্য আছে। এই ব্যবস্থায় ক্রেতা যদিও প্রথমে পণ্যের মালিক হয় না তথাপি পণ্যের উচিত যত্ন লইতে বাধ্য।

বিলম্বে মূল্য প্রদান পদ্ধতিতেও (Instalment Payment) কিস্তিবন্দীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে পণ্যটি ক্রেতার হস্তে অর্পণ করা হয় তাহা নয়, ক্রেতা পণ্যের মালিকানা স্বত্বও পায়। এই ব্যবস্থায় পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার; ক্রেতা চুক্তি হইতে বিদায় নিতে পারে না; ক্রেতা যে কোন সময়, শেষ কিস্তি পরিশোধ করার পূর্বেও পণ্য বিক্রয় কবিতে পারে; কিস্তি বাকি পড়িলেও বিক্রেতা পণ্য ফেরত লইতে পারে না, সে টাকা চাইতে পারে.....ইত্যাদি কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

### পণ্য-মূল্য পরিশোধের উপায় :

পণ্য-মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন উপায় আছে। নগদ টাকা (Cash Money), চেক, (Cheque), মনি অর্ডার (Money Order) 'তার যোগে মনি অর্ডার' (Telegraphic Money Order, সংক্ষেপে T.M. O.), পোষ্টাল অর্ডার (Postal Order), সরকারী চালান (Treasury Challan) প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note), ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট (Bank Draft), হুণ্ডি (Bill of Exchange) ইত্যাদি।

খুচরা পণ্য ক্রয় করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ টাকায় (Cash Money) পণ্য মূল্য পরিশোধ করা হয়। সব সময় অবশ্য নোট বা অত্যাশ্রয় মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ না করিলেও চলে। সেক্ষেত্রে নোট বা মুদ্রার পরিবর্তে 'চেক' (Cheque) এ মূল্য পরিশোধ করা হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিক্রেতার সম্মতি ব্যতীত 'চেক'এ মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়। কারণ, ক্রেতা বিক্রেতাকে 'চেক'এ মূল্য গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না।

যেখানে ডাকযোগে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেখানে ডাক-বিভাগের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতা মনি অর্ডার (Money Order) এ পণ্য মূল্য বিক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। আবারও সমস্ত মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে অনেক সময় 'তারযোগে মনি-অর্ডার' (T. M. O) করিয়াও টাকা পাঠান হয়। 'তার যোগে মনি অর্ডার' করিলে বিক্রেতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে টাকা পায়। সময় সংক্ষেপের জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা।

ডাক বিভাগে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিয়া এক ধরনের 'চেক' ক্রয় করা যায়। ইহাকে বলা হয় 'পোস্টাল অর্ডার' (Postal Order)। পোস্টাল অর্ডারে প্রাপকের নাম এবং অর্থপ্রদানের স্থান লিখিয়া দেওয়া হয়। স্মরণীয় যথার্থ প্রাপক সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া ডাক বিভাগ অর্থ প্রদান করে।

সরকারকে দেয় অর্থ সরকারী চালানে (Treasury challan) পরিশোধ করা হয়। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট আফসে প্রয়োজনমত অর্থ সরকারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। সরকারের কোন বিভাগে টাকা জমা দেওয়া প্রয়োজন তাহা সরকারী চালানে লিখিয়া দিতে হয়।

পণ্য যেখানে ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সেখানে সাধারণত মূল্য পরিশোধ প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note), ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ (Bank Draft) ও ছণ্ডি (Bill of Exchange) মাপ্যমে করা হইয়া থাকে।

প্রত্যর্থ পত্রে ক্রেতা বা স্বামী ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রাপককে অর্থ পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রাপক সেই পত্র দাখিল করিয়া উল্লিখিত অর্থ উত্তোলন করে। আমাদের ৫৯, ১০৯ ও ১০০ টাকার নোট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর অঙ্করূপ প্রতিশ্রুতি দেন; কিন্তু উহা প্রত্যর্থ পত্র নহে, কারণ আইন উহাকে প্রত্যর্থপত্রের বহির্ভূত করিয়াছে।

'ছাণ্ড'র দ্বারা যখন মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয় তখন প্রাপক এক পত্র রচনা করে। ইহাতে পত্রে লিখিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি এইরূপ আদেশ-পত্রে নিজের স্বাকৃতি (acceptance) প্রদান করিয়া তাহা প্রাপকের নিকট ফেরৎ পাঠায়। প্রাপক এই ছণ্ডির অর্থ নির্দিষ্ট সময় অন্তে নিজে লইতে পারে। অথবা, সে ছাণ্ড ভাঙাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই টাকার সংস্থান করিতে পারে অথবা তাহার কোন পাওনাদারকে ঐ ছণ্ডি স্বহস্তের করিয়া স্বগম্য হইতে পারে। ছণ্ডি ভাঙাইলে বাটা বাবদ কিছু ক্ষতি হয়।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ (Bank Draft) এর মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা হয়। এইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন ব্যাঙ্কে জমা দিয়া প্রাপকের নামে একটি ড্রাফট্ বা আদেশ-পত্র ক্রয় করিয়া প্রাপকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রাপক ঐ ড্রাফট্ উক্ত ব্যাঙ্কের কোন শাখা অফিসে জমা দিয়া নির্দিষ্ট অর্থ পায়। এইরূপ আদেশ-পত্রের জন্ত ব্যাঙ্কে 'কমিশন' (Commission) দিতে হয়। এই সকল বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

### টেণ্ডার (Tender) :

যখন কোন বৃহৎ ব্যবসায়ী একই সঙ্গে বহু পণ্য ক্রয় করিবার ইচ্ছা করে, অথবা সরকার যখন কোন একটি বিশেষ পণ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় বা কোন একটি কার্য সম্পাদন করিতে চায় তখন বিক্রেতাদের নিকট হইতে ইহারা পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ প্রস্তাবকে টেণ্ডার (Tender) বলা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতাদের নিকট এইরূপ টেণ্ডার দাখিল করিতে হয়। প্রস্তাব আহ্বান করিবার সময় পণ্যের পরিমাণ, কি সময়ের মধ্যে তাহা সরবরাহ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। বিক্রেতা এই বিবরণ অনুযায়ী পণ্য বিক্রয়ে ইচ্ছুক হইলে পণ্যের মূল্য উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব দাখিল করে। প্রস্তাব দাখিল করিবার সময় কিছু টাকা জমা দিতে হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরে যদি দেখা যায় যে পণ্যের গুণ প্রস্তাব অনুযায়ী না হইয়া নিম্নস্তরের হইয়াছে, অথবা প্রস্তাবকারী বদি সময়মত পণ্য সরবরাহ করিতে না পারে, তাহা হইলে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে এই জমা-টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে।

আমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিব যে, সংবাদপত্রে সরকার বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে প্রস্তাব আহ্বান করিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করা হইলে সেই সব প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা হয়। প্রস্তাব বিবেচনা করিবার সময় পণ্যের প্রস্তাবিত মূল্য, প্রস্তাবকের আর্থিক সংগতি, তাহার ব্যবসায়িক খ্যাতি ও ব্যবসায়-সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনার পর একটি প্রস্তাব বাছিয়া লওয়া হয়, এবং সেই প্রস্তাবকারীকে আদেশ প্রেরণ করা হয়। টেণ্ডার সাধারণত, দুই রকমের হইয়া থাকে—খোলা বা Open Tender এবং বন্ধ বা Sealed Tender।

### দর উল্লেখ (Quotations) :

‘প্রস্তাব’ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক অথবা কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ‘টেণ্ডার’ দাখিল করিবার সময় পণ্যের দর অথবা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ব্যয় সম্পর্কে উল্লেখ করে। এইরূপ দর উল্লেখকে বলা হয় ‘কোটেশন’ (Quotation)। প্রস্তাব আহ্বানক বিত্তি টেণ্ডারের দর ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া একটি ‘টেণ্ডার’ বাছিয়া লয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সর্বনিম্ন দর যে ‘টেণ্ডার’এ উল্লেখ করা হয়। সর্বক্ষেত্রে সেই টেণ্ডার গ্রহণ করা লাভজনক নাও হইতে পারে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রস্তাব গ্রহণকারী লোভের বশে বাজার দর হইতে কমদর উল্লেখ করিয়া ‘টেণ্ডার’ দাখিল করে। কিন্তু পরে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে ঐ কম-দরে পণ্য সরবরাহ করিতে পারে না। ইহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি। সুতরাং বিদ্বন্মণি টেণ্ডার বিচার করিবার সময় শুধু ‘কোটেশন’ বা পণ্যের উল্লিখিত দর বিবেচনা করিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডার দাখিলকারীর খ্যাতি, অর্থসংগতি ও সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কেও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

### চুক্তি (Contract) :

‘টেণ্ডার’ মনোনীত হইবার পর প্রস্তাব আহ্বায়কও প্রস্তাব প্রেরকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত দুই রকমেই হইতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। কারণ মৌখিক চুক্তি হইলে চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা অস্বাধিকারক।

চুক্তিতে সাধারণত পণ্যের বিবরণ, পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য, মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ করিবার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভাবে লিখিত থাকে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ সহি করে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ দুইজন সাক্ষীর সহি ও চুক্তিতে থাকে।

### অনুশীলনী

Q. 1. Describe how buying and selling of goods are effected.

( পণ্যের ক্রয় বিক্রয় কিরূপে সংগঠিত হয় তাহা বর্ণনা কর। )

2. Write short notes on :—

(a) Delivery of goods, (b) Payment of price, (c) Tender, (d) Quotation, (e) Contract (f) Cash Discount, (g) Trade Discount.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর :—

(ক) পণ্য-বিলি ব্যবস্থা, (খ) পণ্য-মূল্য পরিশোধ, (গ) টেণ্ডার, (ঘ) দর উল্লেখ, (ঙ) চুক্তি, (চ) ক্যাশ ডিসকাউন্ট (ছ) ব্যবসায়িক সুবিধা বা ট্রেড ডিসকাউন্ট।

## পঞ্চম অধ্যায়

### আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত নথিপত্র ও বাণিজ্যিক পত্রাদি (Documents and Correspondence used in Home Trade)

বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিধি খুবই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই বাণিজ্যক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতা আসিয়া দেখা দিয়াছে। পূর্বে এমন একটা সময় ছিল যখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পরিচিত ছিল। সুতরাং তখন মৌলিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই পণ্যের লেনদেন করা সম্ভব হইত। কিন্তু এখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে এবং আরও নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দেওয়ার ফলে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মৌখিক আলাপ বা প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে পণ্যের লেনদেন করা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে নানারূপ নথিপত্র ও পত্রালাপ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন পণ্যের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত যে পত্রাদি ও নথিপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা:—

- (১) অনুসন্ধান পত্র ( Letter of Enquiry )
- (২) অনুসন্ধান পত্রের উত্তর ( Reply to the letter of enquiry )
- (৩) পণ্যের অর্ডার ( Order )
- (৪) অর্ডার সম্পাদন-পত্র ও চালান ( Invoice )
- (৫) দেনালিপ ( Debit Note ) ও পাওনা লিপি ( Credit Note )
- (৬) হিসাব বিবরণী ( Statement of Accounts )
- (৭) রসিদ ( Receipt )

উপর্যুক্ত বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত নথিপত্র ও পত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল।

#### (১) অনুসন্ধান পত্র ( Letter of Enquiry )

বিক্রেতা তাহার পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে প্রচার কার্য চালায় তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কোন সম্ভাব্য ক্রেতা প্রথমে পণ্য-সংক্রান্ত তথ্যাদি জানিবার জন্য বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান পত্র প্রেরণ করে। এই পত্রে সাধারণত পণ্যের

বিবরণ, মূল্য, মূল্য পরিশোধের উপায়, পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি বি  
অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে।

কলিকাতার কোন রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহার দোকানে পূজা উপল  
বিশেষভাবে বেনারস-সিল্ক মজুদ রাখিবার উদ্দেশ্যে বারানসীর কোন রে  
বস্ত্র উৎপাদনকারীর নিকট অনুসন্ধানপত্র প্রেরণ করিতেছেন।

সংস্কৃত বেনারসী

গ্রাম : রামবি, কলিকাতা

টেলিফোন : ৪৬-৫৫৬৭

সূচন সংখ্যা টি ৮২১১৬২

বাবাণসী সিল্ক মিউজিয়াম,

৩৩৩, শিবালয়,

বারাণসী।

১৯৩৩, বারানসী ১৩০৪

কলিকাতা-১৯

তারিখ ১৯৩৬২

বিষয় : রেশম বস্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান।

সবিনয় নিবেদন,

আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া কলিকাতায় বেশম বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া  
আসিতেছি। আগামী পূজা উপলক্ষ্যে আমরা বিশেষ কবিয়া বেনারস-  
সিল্ক মজুদ রাখিব ইচ্ছা করিয়াছি। গত ৬৮১৬২ তারিখের সংবাদ পত্রে  
আপনাদের প্রবন্ধ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে এ বৎসব  
আপনারা নানা ধরণের বেশম বস্ত্র উৎপাদন কবিয়া পাইকারী বিক্রয়ের জন্য  
মজুদ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে যদি দয়া কবিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি  
সম্পর্কে যথার্থই আমাদের পবিবেশন করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত  
হইব।

- (১) বিভিন্ন ধরণের রেশম বস্ত্রের মূল্য তালিকা ;
- (২) বিভিন্ন ধরণের রেশম বস্ত্রের নমুনা ;
- (৩) কমপক্ষে কি পরিমাণ মাল ক্রয় কবিতে হইবে ;
- (৪) অর্ডার দেওয়ার পর কি সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহ করা সম্ভব ;

- (৫) মাল প্রেরণের ব্যবস্থা কি ;  
 (৬) মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা কি ।  
 আপনাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম ।

ইতি—

নিবেদক,  
 ভোলানাথ সেনগুপ্ত,  
 ম্যানেজার,  
 রামকৃষ্ণ রেশমালয় ।

(২) অনুসন্ধান-পত্রের উত্তর ( Reply to the letter of enquiry ) :

বিক্রেতার পক্ষে অনুসন্ধান পত্র পাইবাব সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় । যে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহাদেব সব কয়টির উত্তর যথাযথ লিখিত হইল কিনা সেদিকে লক্ষ্য বাখিতে হইবে । তাহা ছাড়া এইরূপ পত্র রচনাব সময় লক্ষ্য বাখিতে হইবে, যেন সম্ভাব্য ক্রেতা বুঝিতে পাবে যে তাহাব সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে বিক্রেতা বিশেষ আগ্রহশীল ।

পূর্ব লিখিত অনুসন্ধান-পত্রের উত্তরের একটি নমুনা

বাবাণসী সিক মিউজিয়াম

বেশম বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা

গ্রাম : সিক, বারাণসী,

৩৩৪, শিবালয়,

ফোন : বাবাণসী ২৬

বারাণসী

সূচক সংখ্যা—সি/বি/২২/৬২

তারিখ ২২/৮/৬২

রামকৃষ্ণ বেশমালয়,

১১৯, রাসবিহাবী এভেন্যু,

কলিকাতা-১৯

বিষয় : রেশম বস্ত্র সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ১৯/৮/৬২ তারিখের পত্র যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই পত্রের জন্ত আপনারা আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন । উক্ত পত্রে



আপনারা যে সকল বিষয় সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছেন তাহার যথাযথ উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল :

- (১) আমাদের ছাপান মূল্য-তালিকা এই সঙ্গে পাঠাইলাম ;
  - (২) আমাদের নিজস্ব উৎপাদিত সকল রকমের রেশম বস্ত্রের নমুনা পাঠানো সম্ভব না হইলেও উৎকৃষ্ট, মাঝারী ও সাধারণ এই তিন পর্যায়ের কাপড়ের কিছু কিছু নমুনা অতীত স্বতন্ত্র মোড়কে ডাকযোগে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে ;
  - (৩) আমরা পাইকারী হারে বিক্রয় করি বলিয়া, কমপক্ষে দুই হাজার টাকার পণ্য ক্রয়েছু ক্রেতাকেই মাল সরবরাহ করিয়া থাকি ;
  - (৪) অর্ডার-প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা মাল চালান করিয়া থাকি ;
  - (৫) আমরা সাধারণত রেলযোগে মাল প্রেরণ করি ;
  - (৬) পণ্য মূল্যের এক তৃতীয়াংশ অর্ডারের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকি । বাকী দুই তৃতীয়াংশ ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিলে চলিবে । সর্বক্ষেত্রেই মূল্য চেকে পরিশোধ করিতে হইবে ।
- আমরা আশা রাখি, আপনাদের প্রয়োজনমত রেশম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিব । আপনাদের অভিজাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিব । আপনাদের অর্ডারের প্রতীক্ষায় থাকিলাম ।

ইতি—

যুক্ত :—মূল তালিকা—১টি

নিবেদক,

আর, ব্রহ্মচারী,

বিক্রয় ম্যানেজার,

বারাণসী নিক মিউজিয়াম ।

### পণ্যের অর্ডার ( Order ) :

বিক্রেতার নিকট হইতে অল্পসংখ্যক পত্রের উত্তর পাইবার পর ক্রেতা তাহা বিবেচনা করিয়া পণ্য-ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে আসিবে । পণ্য-ক্রয় করা স্থির হইলে বিক্রেতার নিকট অর্ডার-পত্র প্রেরণ করা হইবে ।

অর্ডার-পত্র অনেকটা পণ্য-ক্রয়ের চুক্তির ন্যায় । অর্ডার-পত্র প্রেরিত

হইলে অর্ডার অমুযায়ী পণ্য ক্রয়ে ক্রেতা বাধ্য থাকিবে। অর্ডার পত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে। যথা—

- (১) পণ্যের বিবরণ,
- (২) পণ্যের পরিমাণ
- (৩) পণ্যের মূল্য ও মূল্য-পরিশোধের ব্যবস্থা
- (৪) পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ও সময়

### অর্ডার-পত্রের নমুনা

কলিকাতার রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ী বারাণসীর রেশম বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রতার নিকট হইতে অমুসন্ধান পত্রের উত্তর পাইবার পর রেশম কাপড় ক্রয়ের অর্ডার-পত্র প্রেরণ করিতেছেন—

### রামকৃষ্ণ রেশমালয়

গ্রাম : রামরি, কলিকাতা

১১২, রাসবিহারী এভেন্যু,

টেলিফোন : ৪৬:৪৫৬৭

কলিকাতা-১২

সূচক সংখ্যা টি/২/২/৬২

তারিখ—২১/১৬২

( পত্রের উত্তরে সূচক সংখ্যা উল্লেখ বাঞ্ছনীয় )

বারাণসী সিন্ধু মিউজিয়াম,

৩/৩৩, শিবালয়,

বারাণসী ।

### বিষয় : রেশম কাপড়ের অর্ডার

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২২/১৬২ তারিখের পত্রটি যথা সময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সঙ্গে যুক্ত আপনাদের ছাপানো মূল্য তালিকা ও আমরা পাইয়াছি এবং ভিন্ন মোড়কে প্রেরিত রেশম কাপড়ের নমুনা ও ঠিক সময়ে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

আপনাদের বিবরণ অমুযায়ী নিম্নলিখিত রেশম কাপড় যথাশীঘ্র আমাদের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মাল রেলযোগে প্রেরণ করিবেন। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাল যাহাতে আমাদের হস্তগত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আপনাদের অনুরোধ করিতেছি।

আপনাদের নির্দেশামুযায়ী পণ্য মূল্যের এর এক-তৃতীয়াংশ ৩৭০০ টাকার ক্ষুদ্র ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া উপর রেখাঙ্কিত চেক

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

৫৫

( Crossed Cheque ) নং CII/OB 235601 এই সঙ্গে পাঠাইলাম ।  
চেকের প্রাপ্তিস্বীকার করিলে বাধিত হইবে ।

পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য-গজ প্রতি	মোট মূল্য
সাদা 'এ' গ্রেড	১০০ গজ	২৪\	২৪০০\
খয়ের 'এ' গ্রেড	৫০ "	২৪\	১২০০\
বাদামী 'বি' গ্রেড	৩৭০ "	১০\	৩৭০০\
আকাশী 'বি' গ্রেড	১০০ "	১৫\	১৫০০\
সাদ 'সি' গ্রেড	২০০ "	৮\	১৬০০\
খয়ের 'সি' গ্রেড	১০০ "	৭\	৭০০\
			১১১০০\

পণ্য প্রাপ্তিব পব পণ্য মূল্যের বাকী দুই তৃতীয়াংশ টাকা অল্পরূপ ভাবে 'ইউনাইটেড্ বার্শিয়াল ব্যাঙ্ক'ব উপর রেখাকিত চেকে পরিশোধ করা হইবে ।

ইতি—

নিবেদক

ভোলানাথ সেনগুপ্ত,

ম্যানেজার,

রামকৃষ্ণ রেশমালয় ।

(৪) বিক্রেতা অর্ডার প্রাপ্তির পব যথাসীত্র সম্ভব অর্ডার পূরণের চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ অর্ডার অনুযায়ী পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে । অর্ডার অনুযায়ী পণ্য প্রেবণে অপারগ হইলে, অথবা কোন কারণে পণ্য-প্রেরণে বিলম্ব ঘটিলে পণ্য-প্রেরক যথাসীত্র সম্ভব তাহা অর্ডারদাতাকে লিখিয়া জানাইবে ।

অর্ডার অনুযায়ী পণ্য-প্রেরণে সমর্থ হইলে পণ্য-প্রেরণের পর প্রেরক অর্ডারদাতাকে একটি পত্র লিখিয়া পণ্য-প্রেরণের সংবাদ দিবে । ইহাই **অর্ডার-পূরণ পত্র** । এই অর্ডার-পূরণ পত্রের সঙ্গে পণ্যের একটি বিবরণ-পত্রও পাঠাইতে হয় । ইহাকে **চালান ( Invoice )** বলা হয় । এই চালানে প্রেরিত পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, মূল্যপরিশোধের কোন সুবিধা থাকিলে তাহার সর্তাদির উল্লেখ থাকে । পণ্য রেলযোগে পাঠানো হইলে, রেলবিভাগ হইতে দেয় পণ্য-প্রাপ্তির **রসিদটিও** চালানের সঙ্গে ক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয় । ক্রেতা সেই রসিদ দেখাইয়া রেলবিভাগ হইতে পণ্য খালাস

করে। তাহার পর চালানের বর্ণনামুযায়ী পণ্য পাওয়া গেল কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। কোনরূপ ভুলত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধনের জন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রেতাকে জানাইতে হয়।

পণ্য প্রেরণের পূর্বে উত্তমরূপে পণ্য মোড়াই ( Pack ) করার ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্ডার পত্রে মোড়াই সম্পর্কে কোনরূপ বিশেষ নির্দেশ থাকিলে সেই নির্দেশ অনুযায়ী পণ্য মোড়াই করিতে হইবে। পণ্য-মোড়াই করিবার জন্ত কাগজ, চট, কাপড়, কাঠের বাক্স প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

মোড়কের উপর একটি মোড়ক পত্র ( Packing sheet ) উত্তমরূপে আঁটিয়া দিতে হয়। এই মোড়ক পত্রের একদিকে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা আর অত্রদিকে ক্রেতার নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া এই পত্রে কি ধরণের পণ্য জব্দ প্রেরণ করা হইতেছে তাহারও উল্লেখ থাকে।

নিম্নে একটি অর্ডার পূরণ পত্র ও একটি চালানোর নমুনা দেওয়া হইল।

### অর্ডার পূরণ পত্র

বারাণসী সিদ্ধ মিউজিয়াম

রেশম বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা

গ্রাম : সিদ্ধ, বারাণসী

৩/৩৪, শিবালয়,

ফোন : বারাণসী ২৬

বারাণসী।

সূচক সংখ্যা—সি/বি/১৩৪/৬২

তারিখ—২৯/৬/২২

বিষয়—রেশম কাপড় সরবরাহ

আপনাদের পত্র নং টি/২/২/৬২

তারিখ ২৯/৬/২২

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের উল্লিখিত অর্ডার-পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চালানমে বর্ণিত রেশম কাপড় অত্র রেলযোগে পাঠাইলাম। রেল বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রসিদ নং KT 236582 ও এই সঙ্গে পাঠান হইল। ইতি—

নিবেদক,

যুক্ত :—

আর, ব্রহ্মচারী,

(১) চালান নং ২০১ তারিখ ২৯/৬/২২

বিক্রয় ম্যানেজার,

(২) রেলওয়ে রসিদ নং KT/236582

বারাণসী সিদ্ধ মিউজিয়াম।

## চালান ( Invoice )

বারাণসী সিং মিউজিয়াম

রেশম বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা

গ্রাম : সিং, বারাণসী ।

ফোন : বারাণসী ২৬

৩/৩৪, শিবালয়,

বারাণসী ।

## চালান

নং—২০১

তারিখ—২০/৩/৬২

ক্রেতার অর্ডার পত্রের নম্বর

টি/২/২/৬২ তারিখ ২-২-৬২

ক্রেতা—

রামকৃষ্ণ রেশমালয়,

১১২ রাস বিহারী এভেন্যু,

কলিকাতা—১২

দফা	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য প্রতি গজ	মোট মূল্য
	সাদা 'এ' গ্রেড	১০০ গজ	২৪৮	২৪০০৮
২।	খয়ের 'এ' গ্রেড	৫০ "	২৪৮	১২০০৮
৩।	বাদামী 'বি' গ্রেড	৩৭০ "	১০৮	৩৭০০৮
৪।	আকাশী 'বি' গ্রেড	১০০	১৫৮	১৫০০৮
৫।	সাদা 'সি' গ্রেড	২০০	৮৮	১৬০০৮
৬।	খয়ের 'সি' গ্রেড	১০০	৭৮	৭০০৮
				১১,১০০৮

২½% একমাস

রেল যোগে প্রেরিত

ভুলত্রুটি বাদ (E &amp; O E)

আর, ব্রহ্মচারী,

বিক্রয় ম্যানেজার ।

চালানে কয়েকটি কথা লেখা থাকে যাহাদের বিশেষ অর্থ আছে। যেমন, ২½% একমাস, ভুলত্রুটি বাদ প্রভৃতি। '২½% একমাস' ইহার অর্থ এই যে—চালানে লিখিত পণ্য মূল্যে যদি চালানের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত মোট মূল্য অর্থাৎ

১১,১০০ টাকা হইতে শতকরা ২৫% টাকা বাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ স্ববিধা দানের ফলে ক্রেতা যথাসীত্র মূল্য পরিশোধের জন্ত সচেষ্ট হইবে।

‘ভুলক্রটি বাদ’ ইহার অর্থ এই যে ভবিষ্যতে এই বিশেষ পণ্য লেনদেন সংক্রান্ত কোনরূপ ভুলক্রটি ধরা পড়িলে বিক্রেতার তাহা সংশোধনের অধিকার থাকিবে। ইংরাজীতে E & O E, (Errors and Omissions Excepted এর সংক্ষিপ্তরূপ) এইরূপ লেখা থাকে।

### দেনা-লিপি (Debit Note), পাওনা-লিপি (Credit Note)

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্যের যে লেনদেন হয় সেই লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবে অনেক সময় ভুলক্রটি দেখা দেওয়া সম্ভব। এই ভুলক্রটি পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত হইতে পারে অথবা পণ্যের পরিমাণ গত ও হইতে পারে। ক্রেতা বা বিক্রেতা যাহার চোখেই এই ভুলক্রটি ধরা পড়ুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহা সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ভুল সংশোধন করিবার জন্ত দেনালিপি (Debit Note) ও পাওনা লিপি (Credit Note) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই দেনালিপি ও পাওনালিপি ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেনা-লিপি (Debit Note) সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(১) পণ্যের মূল্য চালানে যখন কম লেখা হয় তখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট দেনা লিপি প্রেরণ করে। যেমন, চালানে ১০০ গজ ‘সি’ গ্রেড রেশম কাপড়ের মূল্য (পূর্বে লিখিত চালানের নমুনা দ্রষ্টব্য) প্রতি গজ ৭২ টাকা লেখা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা যদি প্রতি গজ ৮২ টাকা হয়, তাহা হইলে বাড়তি মূল্যের জন্ত বিক্রেতা ক্রেতার নিকট দেনালিপি প্রেরণ করিবে।

(২) চালানে পণ্যের মূল্য অধিক লেখা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনালিপি প্রেরণ করিবে। যেমন চালানে ১০০ গজ ‘সি’ গ্রেড কাপড়ের মূল্য গজ প্রতি ৮ টাকার পরিবর্তে যদি ৯ টাকা লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্রেতা, বিক্রেতার নিকট বাড়তি মূল্যের জন্ত দেনালিপি প্রেরণ করিবে।

(৩) চালানে বর্ণিত পণ্যের পরিমাণ হইতে কম পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইলে অথবা পরিমাণ ঠিক থাকিলেও পণ্য গলদপূর্ণ হওয়ায় ক্রেতা যদি তাহা ফেরত পাঠায় তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনালিপি প্রেরণ

করিবে। যেমন, চালানে ১০০ গজ 'সি' গ্রেড রেশম কাপড় লেখা হইলেও প্রকৃত পক্ষে যদি ৮০ গজ প্রেরণ করা হইয়া থাকে, অথবা যদি সেই ১০০ গজ কাপড় সবটা অথবা আংশিক গলদপূর্ণ হওয়ায় ক্রেতা তাহা ফেরত পাঠায় তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনালিপি পাঠাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবে।

### দেনালিপির নমুনা

বারাণসী সিন্ধ মিউজিয়াম

৩৩৪ শিবালয়

বারাণসী

তারিখ.....১২.....

দেনালিপি (Debit Note)

নং.....

রামকৃষ্ণ রেশমালয়,

১১২ রাস বিহাবী এভেন্যু,

কলিকাতা ১২

দেনাদার

বারাণসী সিন্ধ মিউজিয়ামের নিকট

তারিখ	বিবরণ	মূল্য
১২/৬/২০	১০০ গজ 'সি' গ্রেড সিন্ধ ২০১ নং চালানে লিখিত গজ প্রতি ৭ টাকার স্থলে প্রতি গজ ৮ টাকা হইবে। মোট ঘাটতি.....	১০০ টাকা

স্বাক্ষর—

আর, ব্রহ্মচারী

ম্যানেজার

পাওনালিপি সাধাবণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় :—

(১) পণ্যের মূল্য যদি চালানে কম লেখা হয় তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট পাওনা লিপি প্রেরণ করে।

(২) চালানে পণ্যের মূল্য অধিক লেখা হইলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনালিপি প্রেরণ করে।

(৩) চালানে বর্ণিত পণ্য গলদপূর্ণ হওয়ায় যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠায়, তাহা হইলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনালিপি প্রেরণ করে।

### পাওনা লিপির নমুনা

রামকৃষ্ণ রেশমালয়

১১৯ নং রাসবিহারী এভেন্যু,

কলিকাতা—১৯

তারিখ.....১৯.....

পাওনালিপি (Credit Note)

নং

বারাণসী সিদ্ধ মিউজিয়াম

৩৩৪ নং শিবালয়,

বারাণসী

পাওনাদার

রামকৃষ্ণ রেশমালয়ের নিকট

তারিখ	বিবরণ	মূল্য
৯/৯/৬২	১০০ গজ 'সি' গ্রেড সিদ্ধ	
	২০১ নং চালানে দব গজ প্রতি ৭২ টাকার	
	পরিবর্তে ৮২ টাকা হইবে বলিয়া দেয়	
	অতিরিক্ত মূল্য	১০০২ টাকা

স্বাক্ষর—

ভোলানাথ সেনগুপ্ত

ম্যানেজার

### হিসাব-বিবরণী (Statement of Account)

পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন নগদ অর্থের পরিবর্তে হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা পক্ষে পণ্যের লেনদেন সংক্রান্ত কোন হিসাব রাখিবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু পণ্য যখন ধারে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পক্ষেই পণ্যের লেনদেন সংক্রান্ত দেনাপাওনার হিসাব রাখা প্রয়োজন। তাই না হইলে কোন নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট কত টাকা পাইবে তাহা বুঝিতে পারেনা। অল্পরূপ ভাবে ক্রেতা ও বুঝিতে পারেনা বিক্রেতাকে তাহার কত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।



যখন ধারে পণ্য ক্রয় করা হয় তখন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হিসাব-বিবরণী প্রেরণ করে। এইরূপ হিসাব বিবরণী সাধারণত প্রতিমাসে অথবা অল্প নির্দিষ্ট সময়ান্তর প্রেরণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ হিসাব বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে :—(১) পূর্বের হিসাবের জের, (২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন্ কোন্ তারিখে কত মূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হইয়াছে তাহার বিবরণ, (৩) ক্রেতার নিকট হইতে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য বাবদ কতটাকা পাওয়া গিয়াছে। অথবা কত মূল্যের পণ্য ফেরত আসিয়াছে তাহার বিবরণ, (৪) ঐ তারিখে ক্রেতার নিকট বিক্রেতার মোট কত পাওনা আছে তাহার বিবরণ।

বিক্রেতার নিকট হইতে হিসাব বিবরণী পাওয়ার পূর্ব ক্রেতা তাহা নিজের হিসাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে এবং কোনরূপ ভুলত্রুটি লক্ষ্য করিলে তাহা অবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। অনেক সময় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হিসাব বিবরণী প্রেরণ করিয়া পাওনা পরিশোধের তাগিদ দিবার ব্যবস্থা করে।

### হিসাব বিবরণীর নমুনা

বারাণসী সিন্ধ মিউজিয়াম,

৩৩৪, শিবালয়,

বারাণসী

তারিখ..... ১৯৬২

### ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব বিবরণী

রামকৃষ্ণ রেসমালয়,

১১৯, বাসবিহারী এভেন্যু,

কলিকাতা-১৯.....দেনাদার

তারিখ	বিবরণ	দেনা	পাওনা শোধ	বাকী
১৯৬২	পূর্ব হিসাবের জের...	২০০=০০		
১লা সেপ্টেম্বর	মাল বাবদ ( বিভিন্ন	১১,১০০=০০		
৯ই "	শ্রেণীর সিন্ধকাপড় )	১১,৩০০=০০		
২রা "	মাল বাবদ চেক.....		৩৭০০=০০	
ভুলত্রুটি বাদ			৩৭০০=০০	৭৬০০১

### মূল্য পরিশোধ (Payments)

বিক্রেতার নিকট হইতে হিসাব বিবরণী পাইবার পর ক্রেতা তাহা পরীক্ষা করিয়া যথালীক্ষিত তথ্যের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। নগদ টাকায়, চেকে, পোষ্টাল অর্ডারে অথবা ছত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যায়। (মূল্য পরিশোধের এই সব মাধ্যম সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সাধারণত ছত্তির সাহায্যে মূল্য পরিশোধ করা হয় না।

চালানে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য-পরিশোধ করিলে ক্রেতা, বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য বাবদ কিছু সুবিধা পায়। যেমন, চালানে যদি লেখা থাকে “২% এক মাস”, তাহা হইলে চালানে বর্ণিত মূল্য একমাসের মধ্যে পরিশোধ করিলে ক্রেতা শতকরা ২ টাকা কমে মূল্য পরিশোধ করিবার সুযোগ পায়। এইরূপ সুবিধাকে নগদ বাট্টা (Cash Discount) বলা হয়। এই সুবিধা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকে চালান-বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে।

### রসিদ (Receipt)

মূল্য প্রাপ্তির পর প্রাপক প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রসিদ (Receipt) প্রদান করে। ক্রেতার নিকট এই রসিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাহার নিকট মূল্য-পরিশোধের ইহাই এক মাত্র দলিল।

‘রসিদ’টি আইনত গ্রাহ্য কিনা ক্রেতার পক্ষে তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমত, কি বাবদ মূল্য পরিশোধ করা হইল, এবং তাহা নগদ টাকা, চেক বা ছত্তি, ইহাদের কোনটির দ্বারা পরিশোধ করা হইল, রসিদে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, রসিদে যাহার সহি আছে তাহার সহি করিবার যথার্থ অধিকার আছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, রসিদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির নাম ও প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব ‘সিল’ (Seal) থাকিলে সেই ‘সিল’ অঙ্কিত আছে কিনা তাহাও দেখা প্রয়োজন।

চতুর্থত, ২০১ টাকার অধিক অর্থের জন্য যদি রসিদ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে দেখিতে হইবে রসিদটিতে রেভেন্যু স্ট্যাম্প (Revenue Stamp

যুক্ত করা হইয়াছে কিনা। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে রেভেন্যু স্ট্যাম্প যুক্ত না করিলে সেই রসিদ আইনত গ্রাহ্য হয় না।

**বিল (Bill) :** পণ্য যখন ধারে বিক্রয় করা হয়, তখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট সেই বিশেষ পণ্যের মূল্য দাবি কবিয়া একটি 'বিল' প্রেরণ করে। ক্রেতা পণ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিবার পর এইরূপ বিল প্রেরণ করা হইয়া থাকে। 'বিল'এ পণ্যের বিবরণ, মূল্য, মূল্য-পরিশোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ থাকে।

**চালান ও বিলের মধ্যে পার্থক্য** এই যে, চালানে থাকে পণ্যের বিবরণ এবং বিবরণ অনুযায়ী ক্রেতা পণ্য মিলাইয়া লয়। কিন্তু 'বিল'এ পণ্যের বিবরণ ছাড়াও, পণ্যের মূল্য, মূল্য-পরিশোধের উপায় ও নির্দেশ, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, 'বিল' মূল্য পরিশোধের তাগিদ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**'বিল' এবং হিসাব বিবরণীর মধ্যেও পার্থক্য আছে।**

'বিল' কোন একটি বিশেষ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু হিসাব বিবরণীতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত লেনদেন হইয়াছে, তাহার সামগ্রিক হিসাব থাকে সুতরাং ক্রেতা 'বিল' হইতে কোন একটি লেনদেনের জন্য তাহার কত দেনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। আর 'হিসাব-বিবরণী' হইতে ক্রেতা কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত লেনদেন হইয়াছে সেই খাতে তাহার কত দেনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে।

### অনুশীলনী

(1) Mention briefly the successive steps that a buyer or a seller will adopt in order to complete a business transaction.

(একজন ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোনও একটি ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করিতে পর্যায়ক্রমে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর।)

(2) What is a Letter of Enquiry? Write a letter to a tea dealer enquiring about prices, methods of delivery and methods of payment in respect of tea you intend to purchase.

(অনুসন্ধান পত্র কাহাকে বলে? চাক্ষু্য করিবার উদ্দেশ্যে একজন চা-ব্যবসায়ীর নিকট চায়ের মূল্য, বিলি ব্যবস্থা ও মূল্য-প্রদানের ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কবিয়া একটি পত্র রচনা কর।)

(3) Describe the following with specimen forms :—

(a) Order, (b) Invoice, (c) Debit Note, (d) Credit Note, (e) Statement of Account.

(নমুনা সহ নিম্নলিখিতগুলির বর্ণনা দাও :—

(ক) নির্দেশপত্র, (খ) চালান, (গ) দেনালিপি, (ঘ) পাওনালিপি, (ঙ) হিসাব বিবরণী।

(4) Distinguish between Invoice and Bill or between Bill and Statement of Account.

(চালান ও বিলের মধ্যে পার্থক্য দেখাও ; অথবা 'বিল' ও হিসাব বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।) \*

(5) Write short notes on :—

- (a) "2% one month"
- (b) Payment of Price.
- (c) "Errors and Omissions Excepted"
- (d) Cash Discount
- (e) Receipt.

। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখ, —

- (ক) "২% একমাস",
  - (খ) মূল্য-পরিশোধ,
  - (গ) 'ভুলত্রুটি বাদ',
  - (ঘ) নগদ বাট্টা,
  - (ঙ) রসিদ।
-

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা

( Capital, Turnover and Profit )

মূলধন ( Capital ) কাকে বলে :

উৎপাদনের ( Production ) উৎপাদনগুলির মধ্যে মূলধন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ( প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) চলতি কথায় মূলধন বলিতে আমরা টাকাকড়ি বুঝি। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মূলধন হইল এমন উৎপাদিত সম্পদ যাচা আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করা হয় (Produced means for further production of wealth), স্বতরাং মূলধন কাকে বলে জানিতে হইলে 'সম্পদ' কি জানা আবশ্যক।

সম্পদ বলিতে এমন দ্রব্য-সামগ্রী বুঝায়—

- (ক) বাহ্য বস্তুগত, অর্থাৎ বাহ্যর বহিঃপ্রকাশ আছে ;
- (খ) বাহ্য উপযোগিতা আছে, অর্থাৎ বাহ্যর অভাব-পূরণের ক্ষমতা আছে ;
- (গ) বাহ্যর যোগান চাহিনার তুলনায় অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ সহজ কথায় বাহ্য সংগ্রহ করিতে মূল্য দিতে হয় ;

(ঘ) বাহ্যর হস্তান্তর যোগ্যতা আছে। তথাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর যোগ্য।

উপরিলিখিত গুণ সম্বলিত দ্রব্য সামগ্রীকে অর্থশাস্ত্রে সম্পদ বলা হয়। এইরূপ সম্পদ যখন সরাসরি ভোগ না করিয়া আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে মূলধন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন,—পাট, তুলা, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিকদের বাসগৃহ, জমিতে ব্যবহৃত বীজ, সার ইত্যাদি মূলধনের উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একই সম্পদ ব্যবহারভেদে মূলধন হইতে পারে, আবার মূলধন নাও হইতে পারে। যেমন, কাপড়, বইখাতা, পেন্সিল ইত্যাদি যখন আমরা সরাসরি ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করি তখন তাহা মূলধন নয়। কিন্তু যখন কোন ব্যবসায়ী এষ্ট সকল দ্রব্যই বিক্রয় করিয়া তাহার 'আয়' বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে তাহা সেই ব্যবসায়ীর নিকট 'মূলধন'। সেইরূপ যে কয়লা আমরা নিত্য বন্ধন কার্যের জন্য গৃহে ব্যবহার করিয়া থাকি

তাহা মূলধন নয়। কিন্তু সেই একই কয়লা যখন কলকারখানায় যন্ত্র চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তাহা মূলধনের পর্যায়ে পড়ে।

টাকা কড়ি ও মূলধন যে একই জিনিস নয় ইহাও স্বরণ রাখা প্রয়োজন, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে চলতি কথায় কোন পার্থক্য বোঝান হয় না। উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। আর এই সকল জন্মাই মূলধন। কিন্তু এই সব জব্দ সংগ্রহ করা হয় টাকাকড়ি বা অর্থের বিনিময়ে। সুতরাং টাকাকড়ি মূলধন সংগ্রহের উপায় বিশেষে ইহা মূলধন হয়।

### মূলধনের কার্যাবলী ( Functions of Capital )

নিম্নলিখিতগুলি মূলধনের প্রধান কার্যাবলী :—

(১) মূলধনের দ্বারা উৎপাদন কার্যে ব্যবহার যোগ্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূলধনের সাহায্যে বিক্রয় যোগ্য পণ্য-সংগ্রহ করা হয়।

মূলধনের সাহায্যে শ্রমিকের দক্ষতা ও নৈপুণ্য এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এমন এক সময়ছিল যখন মানুষ যন্ত্র ব্যতিরেকে অথবা সামান্ত সরল যন্ত্রেব ব্যবহারেব দ্বারা জব্দ উৎপাদন করিত। তখন নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিকেব মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে যন্ত্রেব সাহায্যে একজন শ্রমিক ঐ নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণ জব্দ উৎপাদন করিতে পারে। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে গরু-লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা চাষ করিলে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা যায় ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। যন্ত্ররূপ মূলধনের সাহায্যেই এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

(৩) আবাব, যন্ত্ররূপ মূলধনের প্রয়োগের ফলেই শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ সম্ভব হইয়াছে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অল্পদিকে উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(৪) মূলধনই উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেব দ্বারা অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। বর্তমানে জব্দ-উৎপাদন ও তাহার বিক্রয়েব মধ্যে সময়ের ব্যয়ধান থাকে। এই অন্তর্যন্তি কালে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি চালু রাখিতে না পারিলে অথবা শ্রমিকদের মজুরী দিয়া তাহাদের কাজে বহাল রাখিতে না পারিলে উৎপাদনের অব্যাহত ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

উৎপাদন কার্য একবার ব্যাহত হইলে ক্ষতি হয়। মূলধনই যন্ত্রপাতি চালু রাখিয়া, শ্রমিকদের মজুরীর সংস্থান করিয়া এই অন্তর্বর্ত্তিকালে উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। অল্পরূপ ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, সেই অন্তর্বর্ত্তিকালে মূলধন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায়ের ধারাটিকে অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে।

### মূলধনের প্রকারভেদ (Types and Forms of Capital)

ব্যবহারভেদে মূলধনের বিভিন্ন শ্রেণীভাগ করা যায়। অর্থশাস্ত্র বিশারদদের মতে ব্যবহার ভেদে মূলধনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ।

#### ১। উৎপাদন-মূলধন (Production Capital)

মানুষের পূর্ব পরিশ্রমদ্বারা অজিত দ্রব্য সামগ্রী যাহা মানুষ সরাসরি ভোগ না করিয়া আরও দ্রব্য বা সম্পদ সৃষ্টি করিবার জন্ত নিয়োগ করে, তাহাকে উৎপাদন মূলধন (Production Capital) বলা যায়। উৎপাদন মূলধন প্রকৃতির দান নহে। ইহা মানুষের পূর্ব পরিশ্রমের ফল। যেমন, যে যন্ত্রপাতির দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করা হয়, তাহা উৎপাদন-মূলধনরূপে গণ্য হইবে। এই সব যন্ত্রপাতি প্রকৃতির দান নহে। মানুষই পূর্বে পরিশ্রম করিয়া এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে। কিন্তু যন্ত্রপাতি সরাসরি ভোগ করা হয় ন। আরও দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্ত ইহা নিয়োগ করা হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একমাত্র সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দান ছাড়া মানুষের পূর্ব পরিশ্রমরূপ অজাত সকল দ্রব্য বা উপায় সমূহ যাহা মানুষকে আরও সম্পদ সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে সেই সকল দ্রব্য বা উপায়গুলিকে উৎপাদন-মূলধনের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। সুতরাং উৎপাদন-মূলধনের নানারূপ হইতে পারে। যথা—

- (১) কাঁচামাল;
- (২) যন্ত্রপাতি;
- (৩) উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত আত্মসঙ্গিক দ্রব্য যেমন, কৃষিকার্যের জন্ত ব্যবহৃত সার ইত্যাদি;
- (৪) কারখানা, শ্রমিকদের বাসগৃহ ইত্যাদি;
- (৫) বিনিময়-ব্যবস্থা ও বিনিময়-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ;
- (৬) জমির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা সমূহ, যেমন, জমি হইতে জলনিষ্কাশন ও জমিতে-জলসেচন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

### (৭) পরিবহন-ব্যবস্থা।

উপরিলিখিত প্রত্যেকটিই উৎপাদন-মূলধনের পর্যায়ভুক্ত। কারণ ইহারা যাহুবৎ অধিকতর দ্রব্য বা সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে। সুতরাং সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই সব উৎপাদন-মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## ২। আয়-প্রদানকারী মূলধন ( Revenue Capital )

যে মূলধন নিয়োগের দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষ নিজেব আয় ( income ) বৃদ্ধির প্রয়াস পায়, তাহাকে আয়প্রদানকারী মূলধন বলা যায়। যেমন, কোন ব্যবসায়ী যখন পণ্য-বিক্রয় করিয়া তাহার আয়-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত রাখে, তখন সেই মজুত-পণ্য সেই ব্যবসায়ীর নিকট আয়-প্রদানকারী মূলধন।

উৎপাদন-মূলধন ও আয়-প্রদানকারী মূলধনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, উৎপাদন-মূলধনের বৃদ্ধি দ্বারা সমগ্র সমাজের উন্নতি-বিধান করা যায়; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আয়প্রদানকারী মূলধনের বৃদ্ধির দ্বারা সমগ্র সমাজের উন্নতি নাও হইতে পারে। ব্যক্তি-বিশেষের আয় বৃদ্ধি করাই এইরূপ মূলধনের প্রধান কার্য। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত এইরূপ মূলধন সমাজের উন্নতির পরিবর্তে ক্ষতি-সাধন করে। যেমন, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যবসায়ী বাজীর্বে পণ্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে প্রচুর পণ্য ক্রয় করিয়া মজুত করে। ফলে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর বৃদ্ধিত মূল্যে পণ্য-বিক্রয় করিয়া সেই সব ব্যবসায়ী নিজেব আয় বৃদ্ধি করে। কিন্তু পণ্য-মূল্য এইরূপ বৃদ্ধি পায় বলিয়া সাধারণ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার, বধ্যস্থ কারবারীরা সকলেই পণ্য-মূল্য কিছু কিছু বাড়াইয়া মুনাকা অর্জন করিতে চায় বলিয়াই সাধারণ-ক্রেতাকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে হয়।

## সহায়ক মূলধন ( Auxiliary Capital )

যে মূলধন প্রমিতকৈ দ্রব্য-উৎপাদনে সহায়তা করে তাহাই সহায়ক মূলধন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি।

## মজুরি মূলধন ( Remuneratory Capital )

কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী—যদি কাণে নিযুক্ত প্রমিতকৈ মজুরি দিয়া থাকে, যন্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর নিকট এই সব খাতবস্ত, যন্ত্র ও বাসস্থান মজুরি-মূলধন।



### সামাজিক মূলধন ( Social Capital )

যে মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের না হইয়া সমগ্র সমাজের হয় তাহাকে সামাজিক মূলধন বলা যায়। যেমন, রেলপথ, জাতীয় সড়ক ( National Highways ) ইত্যাদি সামাজিক মূলধনের দৃষ্টান্ত। কারণ, এই সব সম্পদ কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়। এই সকল সম্পদের উপর সমগ্র জাতির আধিকার স্বীকৃত।

ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ মূলধনকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে।  
যথা :—

### স্থায়ী মূলধন ( Fixed Capital ) .

উৎপাদন কাষে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্য সামগ্রী একবার ব্যবহার করিলেই নিঃশেষিত হইয়া যায়না, তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। যেমন, যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, গুদাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এই সব উপকরণের দ্বারা অনেকদিন ধরিয়া উৎপাদন বা ব্যবসায়-কাষ পরিচালনা করা সম্ভব।

### চলতি মূলধন ( Circulating Capital )

উৎপাদন কাষে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই তাহার রূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় অথবা তাহার মূল্য নিঃশেষিত হইয়া যায়, সেই দ্রব্য-সামগ্রী চলতি মূলধনের পর্কে পড়ে। যেমন, পাট, তুলা, প্রভৃতি কাঁচামাল একবার উৎপাদনকাষে ব্যবহৃত হইলেই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়া যায়, এবং পুনরার কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়না। সেইরূপ কোন ব্যবসায়ী যখন কোন পণ্য একবার বিক্রয় করে, তখন সেই পণ্যের মূল্য তাহার কাছে নিঃশেষিত হইয়া গেল। কারণ, সেই পণ্যের দ্বারা তাহার পকে আর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

### কার্যকরী মূলধন ( Working Capital )

মূলধনের যে অংশ ব্যবসায়ে পুনঃ পুনঃ আৱর্তিত হয়, তাহাই কার্যকরী মূলধন। ব্যবসায়ে কিছু কিছু সম্পদ থাকে যাহা পুনঃপুনঃ আৱর্তিত হয়না। যেমন, যন্ত্রপাতি, জমি, আসবাবপত্র, কারখানাগৃহ ইত্যাদি। এই সব ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদ বা মূলধন। কিন্তু ব্যবসায়ীর এমন কিছু সম্পদও থাকে যাহা পুনঃপুনঃ আৱর্তিত হয়। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়। পণ্য ক্রয় করিতে মূলধনের যে অংশ ব্যয় করা হয়, পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহা আবার কেৱল পাওয়া যায় এবং তখন পুনরায় ঐ অর্থের

যারা পণ্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং এইরূপ মূলধন ব্যবসারে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয় বলিয়া ইহা কার্যকরী মূলধনের পর্যায়ে পড়ে। বস্তুতঃ মূলধনের যে অংশ ব্যবসার পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয় তাহাই কার্যকরী মূলধন।

### মূলধন গঠন (Formation of Capital)

• মানুষের সঞ্চয়ের উপরই মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে। কিন্তু সঞ্চয় কিরূপে সম্ভব? মানুষ যদি তাহার আয়ের সবটা বর্তমানে ভোগ না করিয়া কিছু অংশ ভবিষ্যতে ভোগ করিবার আশায় আলাদা করিয়া রাখে তাহা হইলেই সঞ্চয় সম্ভব। সুতরাং সঞ্চয় করিতে হইলে মানুষকে তাহার বর্তমান ভোগের পরিমাণ কিছু কমাইতে হইবে। কিন্তু শুধু সঞ্চয় করিলেই মূলধন সৃষ্টি হয় না। এই সঞ্চিত সম্পদকে যখন আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য উৎপাদন কার্যে অথবা ব্যবসার-বাণিজ্যে নিয়োগ করা হয় তখনই মূলধন-সৃষ্টি হয়।

আমরা সঞ্চয় বলিতে সাধারণত অর্থের সঞ্চয়ই বুঝিয়া থাকি। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমাজের দিক হইতে অর্থ বা টাকাকড়ি মূলধন নয়। কিন্তু তাহা হইলেও অর্থ বা টাকাকড়ি দ্বারা বখার্ব মূলধন সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং মানুষের আর্থিক সঞ্চয়ের উপরও মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে।

নিরলিখিত কারণগুলির উপর মূলধন-গঠন ও তাহার বৃদ্ধি নির্ভর করে—

#### (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (will to save)

মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নানা কারণে হইতে পারে। যেমন, বৃদ্ধ বয়সে সচ্ছন্দ জীবন যাত্রা নির্বাহের ইচ্ছা অনেকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। আবার পুত্র-কন্যার শিক্ষার ও বিবাহাদির জন্য, ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য, ভবিষ্যতে গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও মানুষ বর্তমানে সঞ্চয় করে। অর্থশালী হইয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যেও অনেকে সঞ্চয় করে।

যাকি যেমন নানা কারণে সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা করে ব্যবসায়িক-প্রতিষ্ঠানও সেইরূপ ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিতে পারে। এই সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার প্রভাবও কম নয়। বেশে বহিঃস্বদেশী থাকে, মানুষ তাহার জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে বহিঃনির্ভর থাকিতে পারে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের ইচ্ছাও প্রবল হয়। আবার সুকিঞ্চ অর্থ

প্রস্তুত রাখিবার জন্য ব্যাক, বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক। প্রয়োজন পড়িয়া উঠে, তাহা হইলেও সক্ষম হুই পাই। ইহা ছাড়া শিক্ষা বিভাগ এবং গড়িত টাকার উপর বর্ধিত সুদের কার্যও সক্ষমের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে পারে।

## (২) সক্ষম-কর্মতা (Power to save)

কুছু সক্ষম ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। সক্ষম করিবার কর্মতাও থাকী প্রয়োজন। যে ব্যক্তির জীবনধারণের উপযোগী-মানসম্মত আয়ও নাই, তাহার নিকট সক্ষম-করিবার প্রেরণই আসেনা। প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বা জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করিয়াও আয়ের বহি কিছু উঠে থাকে, তাহা হইলেই সক্ষম করিবার কর্মতা জন্মায়। সুতরাং আয় বৃদ্ধি বাড়িবে, সক্ষমের কর্মতা ও পরিমাণ ও তত বাড়িবে।

## (৩) সক্ষম-বিনিয়োগের স্বেচ্ছা (Scope of Investment)

সক্ষম সম্পদ চর ব্যবসায়-বাণিজ্য বা উৎপাদনকাণ্ডে বিনিয়োগ করা না হইলে তাহা হইতে মুদ্রাণ সৃষ্টি হয় না। ব্যাক, বীমা প্রভৃতি, সমবায়-সম্মত ইত্যাদি মধ্যমেই সক্ষম সম্পদ বিনিয়োগ করা হইতে থাকে। সুতরাং এই সক্ষম উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ গড়িত উত্তিলে বিনিয়োগের মুনাফ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব প্রত্যেক সক্ষমের, সঞ্চয় বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি উপরন্ত সক্ষম-বিনিয়োগ নির্ভর করে। সুতরাং এক্ষণে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার, অতঃপর ব্যাক, বীমা-প্রভৃতি ইত্যাদির গঠনের উপর সক্ষম বিনিয়োগ নির্ভর করে।

## মূলধনের সংস্থান

মূলধনের বৃদ্ধির সাধ্যমের উপর ব্যবসায় বাণিজ্যের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং মূলধনের সংস্থান কিভাবে হয় তাটা জানা প্রয়োজন। মূলধনের সংস্থান সাধনকে নিম্নলিখিত উপায়ে হইয়া থাকে—

(১) একমালিকী কারবারে মালিক তারার নিজস্ব সক্ষম হইতে মূলধনের সংস্থান করা থাকে। নিজস্ব সক্ষম প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে ক্ষেত্র বিশেষে মালিক এম কর্তব্যে মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

(২) অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ ব্যক্তি-গত সক্ষম হইতে মূলধনের সংস্থান করিয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ কারবারেও প্রয়োজন হইলে ঋণ করিয়া মূলধনের সংস্থান করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশীদারী

করা হয়।

(১) বৌদ্ধ পারিবারিক কারবারে মূলধনের সংস্থান পারিবারিক সম্পদ ও সরকার উপরই প্রধানত নির্ভর করে। তবে প্রয়োজন হইলে এইরূপ ক্ষেত্রেও ঋণ করিয়া মূলধনের সংস্থান করা যায়।

(২) বৌদ্ধ মূলধনী কারবারে সাধারণত জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধনের সংস্থান করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিবেকার বিক্রয় করিয়াও কিছু মূলধন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

(৩) সমবায়-কারবারী সংগঠনের ক্ষেত্রে সমস্তদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাথমিক মূলধনের সংস্থান করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া সমবায়-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান হইতে অথবা সরকার হইতে ঋণ করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

(৪) সরকারী কারবারে সরকারই অধিকাংশ মূলধনের সংস্থান করে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া, কর বসাইয়া অথবা প্রয়োজন হইলে ষাটতি-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া সরকার এইরূপ মূলধন সংগ্রহ করে। জনসাধারণের নিকট বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করা হয়। তবে, সরকারই অধিকাংশ শেয়ারের মালিক থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সরকারী কারবারের মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা অনেক বেশি এবং নানা উপায়ে এইরূপ মূলধন সংগ্রহ করা যায়, সুতরাং যে সকল কারবারে অধিক মূলধনের প্রয়োজন, সেইরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কারবারী-প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা অধিক।

উপরউক্ত বিভিন্ন উপায়ে কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন-সংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও অনেক সময় ক্ষেত্র-বিশেষে বেসরকারী শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহে সরকার প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা গড়িয়া তোলা হয়। যেমন, ভারতবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ইনডাস্ট্রিয়াল ফীনাঞ্চ করপোরেশন, স্টেট ফীনাঞ্চ করপোরেশন, ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন প্রভৃতি সংস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

### আবর্তন (Turnover)

ব্যবসারে কোন পণ্য সত্তার (Stock of goods) একত্রিত সময়ের

সত্তার পূরণ করিতে হয় তাহাকে আবর্তন বল্য হয়। ইহা বর্তন সত্তার আবর্তন (Stock turn) কিন্তু অনেকে ইহাকেই মূলধন আবর্তন বল্যে। ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইলেও অর্থের কোন পরিবর্তন ইহাতে সৃষ্টি হয় না। কারণ ব্যবসায়ের চলতি-মূলধন গ্রহণের পণ্য ক্রয়ে নিয়োগ করা হয়। তাহার পর সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া যখন বিক্রয় মূল্য আদায় করা হয় তখন পণ্য ক্রয়ে নিযুক্ত চলতি-মূলধনও আবার ফেরত পাওয়া যায়, সেই ফেরত পাওয়া চলতি মূলধনের দ্বারাই আবার পণ্য-ক্রয় করিয়া বিক্রয়ে উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়। সুতরাং পণ্য-সত্তার যেমন বারবার পূরণ করিবে হইতেছে, সৰ্ব্ব সৰ্ব্ব চলতি মূলধনও পূর্ণ:পূর্ণ: আবর্তিত হইতেছে।

সম্ভাব বা চলতি মূলধনের আবর্তনের দ্বারা নির্ভরকরে ব্যবসায়ে প্রকৃতির উপর। এমন ব্যবসায় আছে যেখানে পণ্য দ্রুত বিক্রয় হয়। সুতরাং সেইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ে নিয়োজিত চলতি-মূলধনও দ্রুত ফেরত পাওয়া যায় আবার সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থই পুনরায় পণ্য ক্রয়ে নিয়োজিত হয়। যেমন একজন মস্তক বা মস্তক বিক্রেতাকে দ্রুত বিক্রয় করিতে হয়। কারণ, অধিক দিন এইরূপ পণ্য মজুত রাখা সম্ভব নয়। এই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারাষ্ট সেই কারবারী পুনরায় পণ্য মজুত রাখে, তখন সেই মজুত-পণ্য সেই ব্যবসায়ীর নিকট আদায় প্রাপ্ত মূলধন।

মস্তক অথবা চলতি মূলধন ক'রায় মজুত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে এইরূপ ক্ষেত্রে সম্ভার ও চলতি মূলধন দ্রুত আবর্তিত হইবে। কিন্তু আবার এমন ব্যবসায়ও আছে যেখানে সম্ভার ও চলতি মূলধন এত দ্রুত আবর্তিত হয় না। যেমন, একজন অলংকার ব্যবসায়ীর অলংকার খুব দ্রুত বিক্রয় হয় না। সুতরাং সেইরূপে সম্ভার আবর্তন ও চলতি মূলধন আবর্তন অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

এই প্রসঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীই তাহার পণ্যের দ্রুত বিক্রয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কম মূল্যে অনেক দ্রব্য দ্রুত বিক্রয় করিতে পারিলে ঘোঁ মুনাকার পরিমাণে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা এইরূপ হযোগ গ্রহণ করিতে চায়। আবার দীর্ঘ দিন চলতি মূলধন আটক রাখা কোর ব্যবসায়ীর কাম্য নয়। বেশী মুনাকার লোভে পণ্য দ্রুত বিক্রয় না করিয়া অধিক দিন মজুত রাখিলে প্রকৃত পরিমাণে তাহাতে বেশী হয়। কারণ, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অধিক হইলে এই বিলম্বিত সময়ের

যদিও অনেকের মতে উৎপাদন পণ্য বিক্রয় করে পণ্যের মূল্য থেকে পণ্যের মূল্যের পার্থক্যই মুনাফা। কিন্তু উৎপাদন পণ্য বিক্রয় করে পণ্যের মূল্যের পার্থক্যই মুনাফা।

### মুনাফা (Profit)

উৎপাদন আলোচনার মুনাফা কথাটির একাধিক উল্লেখ আছে। সুতরাং এখন মুনাফা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি যে, কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয়, উৎপাদক যদি তদপেক্ষা অধিক মূল্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মুনাফা হয়। অতীতভাবে কোন কারবারী যে দামে পণ্য ক্রয় করে, তদপেক্ষা অধিক দামে যদি সেই পণ্য বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মুনাফা হয়। অর্থনীতি শাস্ত্রে অবশ্য 'মুনাফা' কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়া থাকে।

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, উৎপাদনের চারটি বিশেষ উপাদান আছে। যথা :—

- (১) ভূমি ( Land ) অর্থাৎ যেখান হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয় ;
- (২) শ্রম ( Labour ) ,
- (৩) মূলধন ( Capital ) ,
- (৪) উদ্যোগ বা সংগঠন ( Enterprise or Organisation ) \*

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য মূল্য দিতে হয়। যেমন, ভূমির জন্য দিতে হয় ভাড়া ( Rent ), শ্রমের জন্য মজুরি ( Wages ), মূলধনের জন্য সুদ ( Interest )। এইভাবে উদ্যোগ বা সংগঠনের জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাকে বলা হয় মুনাফা ( Profit )। উদ্যোক্তা বা সংগঠক উৎপাদন কার্য বা কারবার পরিচালনা করে এবং এই প্রসঙ্গে কিছু ঝুঁকি ( risk ) বহন করে। উদ্যোক্তা বা সংগঠক পরিচালনা ( management ) এবং ঝুঁকি ( risk ) বহনের জন্য যে মূল্য পায় তাহাই মুনাফা। এই প্রসঙ্গে মুনাফার সহিত ভাড়া, মজুরি ও মূলধনের জন্য সুদ, এই তিনটির যে পার্থক্য তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ভাড়া, মজুরি এবং সুদের হার চুক্তি অনুসারে স্থির করা হয় সুতরাং এই সব প্রাপ্যের হার নির্দিষ্ট। অর্থাৎ ভূমির মালিক কত ভাড়া পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে, এবং মূলধন সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। কিন্তু মুনাফার হার এইরূপ

ভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। মুনাফা কম-বেশী হইতে পারে। অথবা মুনাফা নাও হইতে পারে। এই কারণে মুনাফার হার ক্ষুদ্র পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু খাজনা, মজুরি ও স্বদের হার তত ক্ষুদ্র পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয়ত, মুনাফা হউক আর না হউক, খাজনা, মজুরি এবং স্বদ বাৎসর প্রাপ্য নির্দিষ্ট হারে দিতে হয়। বস্তুতঃ, খাজনা, মজুরি ও মূলধনের উপর স্বদ বাবদ প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া যদি কিছু উহৃত থাকে, তাহাই মুনাফা।

‘মুনাফা’-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:—(১) মোট মুনাফা (gross profit) (২) নীট মুনাফা (Net Profit)

**মোট মুনাফা:** সংগঠক বা উদ্যোক্তা মোট আয় হইতে খাজনা, মজুরি ও মূলধনের উপর স্বদ বাবদ বাহা দেয় তাহা মিটাইয়া দিয়া উদ্যোক্তা বাহা পায় তাহাই তাহার মুনাফা। কিন্তু উদ্যোক্তা বা সংগঠক যখন নিজের জমি ও মূলধন নিয়োগ করে তখন মোট আয় হইতে মজুরি বাদ দিয়া বাহা থাকে সবটাই তাহার মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করে। এইরূপ মুনাফাকে মোট মুনাফা (gross profit) বলা হয় এবং এইরূপ মুনাফার মধ্যে খাজনা ও স্বদও ধরা থাকে।

### নীট মুনাফা (Net profit)

উদ্যোক্তা বা সংগঠক নিজের জমি ও মূলধন নিয়োগ করা সত্ত্বেও যখন উপরুক্ত মোট মুনাফা অর্থাৎ মজুরি বাদ দিয়া আয়ের অবশিষ্ট অংশ হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা ও মূলধনের উপর দেয় স্বদ বাদ দেয় তখন বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে নীট মুনাফা বলা হয়। অতরাং জমি ও মূলধন সংগঠকের নিজের হউক আর না হউক মোট আয় হইতে মজুরি, খাজনা ও মূলধনের উপর দেয় স্বদ বাদ দিলেই নীট মুনাফা পাওয়া বাটবে।

নীট মুনাফা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া গঠিত হয়:—

(১) সংগঠকের পারিশ্রমিক—সংগঠক নিজে পরিচালনা করিয়া উৎপাদন কার্য বা ব্যবসায় পরিচালনা করে। অতরাং সে যে মুনাফা পায় তাহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিকও ধরা থাকে।

(২) ঝুঁকি বহনের মূল্য—উৎপাদন কাণ্ডে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সংগঠককে ঝুঁকি বহন করিতে হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই লাভের আশা যেমন আছে, ক্ষতির আশাও থাকে। মুনাফার আশা করে বলিয়া সংগঠক এইরূপ ঝুঁকি বহন করে। ঝুঁকি বহনের মূল্যই মুনাফার প্রধান উপাদান।

(৩) উন্নততর পরিচালনার দরুণ অতিরিক্ত আয়—অনেক ক্ষেত্রে একই অবস্থার মধ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াও দুইটি একই ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি উন্নততর পরিচালনা ব্যবস্থার জন্ত অপরটির তুলনায় অধিক লাভ করিতেছে। উন্নততর পরিচালনা ব্যবস্থার জন্ত এই অতিরিক্ত উপার্জন মুনাফার আর একটি উপাদান।

• (৪) একচেটিয়া কারবারের মুনাফা—বাজারে প্রতিযোগিতা না থাকিলে বা প্রতিযোগিতা আংশিক হইলে অনেক ক্ষেত্রে সংগঠক অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে। এইরূপ মুনাফাকে একচেটিয়া কারবারের মুনাফা বলা হয়।

(৫) আকস্মিক মুনাফা : অনেক সময় বিশেষ অবস্থা বা সুযোগের জন্ত সংগঠক অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। যেমন, কোন বিদেশী পণ্যের আমদানি কোন কারণে হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে সেই বিদেশী পণ্যের দাম বাড়িয়া যায়। সেই ক্ষেত্রে কোন ব্যবসায়ী আমদানি বন্ধ হইবার পূর্বেই যদি সেই পণ্য ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া থাকে তাহা হইলেই বর্তমানে সে পণ্যের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (Marked Price) হইতে অনেক বেশি দামে তাহা বিক্রয় করিতে পারে। এইরূপ বেশি দামে বিক্রয় করিয়া তাহার যে অতিরিক্ত মুনাফা হয় তাহাকে আকস্মিক মুনাফা (windfall Profit) বলা হয়।

উপযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারের মুনাফা ও আকস্মিক মুনাফা এই দুইটিকে বাদ দিলে বাকী তিনটি উপাদান লইয়া গঠিত মুনাফাকে স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) বলা হয়। অর্থাৎ সংগঠকের পারিশ্রমিক, কুঁকি বহনের মূল্য ও উন্নততর পরিচালনা ব্যবস্থার দরুণ অতিরিক্ত আয় এই তিনটি উপাদান লইয়া গঠিত মুনাফাই স্বাভাবিক মুনাফা।

একজন ব্যবসায়ী কোন নির্দিষ্ট সময়ে অন্তে যে ভাবে তাহার মোট মুনাফা (Gross Profit) ও নেট মুনাফার (Net Profit) হিসাব করে তাহা একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে।

একজন ব্যবসায়ী এক বৎসর অন্তে তাহার মোট মুনাফা ও নেট মুনাফার হিসাব করিতে চায়। প্রথমেই সে দেখিবে বৎসরের প্রারম্ভে তাহার হাতে কত মূল্যের পণ্য জমা ছিল। ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন বৎসরে ব্যবসায়ী বতর্মূল্যের পণ্য ক্রয় করে, সবটা সেই বৎসরেই বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। এই অবিক্রীত পণ্য পর বৎসরের প্রারম্ভিক সময়ে



(opening stock of goods) মনে করি, এই প্রারম্ভিক সত্তারের ক্রয় মূল্য ২০০০ টাকা। সেই বৎসরে ব্যবসায়ী আরও ৬০০ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করিয়াছে। তাহা হইলে ব্যবসায়ীর হাতে জমা পণ্যের ক্রয় মূল্য দাঁড়াইল ৮০০০ টাকা। এই ৮০০০ টাকার পণ্য হইতে ৪০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ঐ বৎসরে ব্যবসায়ী বিক্রয় করিয়াছে ২০০০ টাকায়। তাহার হাতে বৎসরের শেষ দিনে আরও ৩০০ টাকা মূল্যের পণ্য জমা থাকিল। এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ঐ বৎসরে মোট মুনাফা (Gross Profit) কত হইয়াছে তাহা হিসাব করিতে হইলে প্রথমে প্রারম্ভিক সত্তারের ক্রয় মূল্যের সঙ্গে সে বৎসরে যে পণ্য ক্রয় হইয়াছে তাহার ক্রয় মূল্য যোগ করিতে হইবে। উপরের উদাহরণে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইল ৮০০০ টাকা (২০০০ + ৬০০০)। পরে যে পণ্য বিক্রয় করা হইয়াছে তাহার বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে বৎসরের শেষ দিনে যে পণ্য অবিক্রীত থাকিল তাহার ক্রয় মূল্য যোগ করিতে হইবে। উল্লিখিত উদাহরণে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইল ১২০০০ টাকা (২০০০ + ৩০০০) এখন এই ১২,০০০ টাকা হইতে ৮০০০ টাকা বাদ দিলে যে ৪০০০ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ব্যবসায়ীর ঐ বৎসরে মোট মুনাফা।

কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় আছে। যেমন, ব্যবসায় পরিচালন করিতে হইলে ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের মজুরি, জমি খাজনা, কমিশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয়কে পরিচালন-ব্যয় (overhead expenses) বলা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোট মুনাফা হইতে পরিচালন-ব্যয় বাদ দিলে তাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ব্যবসায়ীর নীট মুনাফ। মনে করি উপরের উদাহরণে এই পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০০০ টাকা। তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায়ীর ঐ বৎসরে নীট মুনাফ হইবে ১০০০ টাকা। (৪০০০ টাকা মোট মুনাফা — ৩০০০ টাকা পরিচালন ব্যয় = ১০০০ টাকা)

### সত্তার আবর্তন ও পরিচালন-ব্যয় (Turnover and overhead expenses)

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিক্রয় (Sales or turnover) যে হারে পরিবর্তিত হয় পরিচালন-ব্যয় (overhead expenses) সমান হাড়াতে পরিবর্তিত হয় না। বিক্রয় যে হারে বাড়ে পরিচালন-ব্যয় সেই হারে বাড়ে না। এই ক্ষেত্রে বিক্রয় অধিক হলে মুনাফার পরিমাণও অধিক হয়। আবার

বিক্রয় কমিলে পরিচালন-ব্যয় সেই অল্পপাতে কমে না। সুতরাং বিক্রয় কমিলে মুনাফার পরিমাণ ও কমিয়া যায়।

**মূলধন আবর্তন ও মুনাফার মধ্যে শতকরা হারে সম্পর্ক ( Profit as a percentage on turnover )** নির্ণয় করা যায়। মনে করি, কোন ব্যবসায়ী এক বৎসরে মূলধন আবর্তনের ফলে বিক্রীত পণ্যের বিক্রয় মূল্য বাবদ ২০,০০০ টাকা পাইয়াছে। ঐ বৎসর মোট মুনাফা (Gross profit) হইয়াছে ৫০০০ টাকা। তাহা হইলে মোট মুনাফা ও মূলধন-আবর্তনের পারস্পরিক শতকরা হার হইবে নিম্নরূপ—

$$\frac{৫০০০ \times ১০০}{২০,০০০} = ২৫\%$$

অর্থাৎ ঐ ব্যবসায়ীর ঐ বৎসরে মোট মুনাফা (Gross Profit) হইয়াছে শতকরা ২৫ টাকা।

একই বৎসরে যদি ঐ ব্যবসায়ীর নীট মুনাফার (Net Profit) পরিমাণ হয় ২০০০ টাকা তাহা হইলে মূলধন আবর্তন ও নীট মুনাফার মধ্যে শতকরা হার হইবে।

$$\frac{২০০০ \times ১০০}{২০,০০০} = ১০\%$$

অর্থাৎ উক্ত ব্যবসায়ী ঐ বৎসর শতকরা ১০ টাকা নীট মুনাফা করিয়াছে।

## অনুশীলনী

1. What is Capital? What are the functions of Capital?

মূলধন কাহাকে বলে? মূলধনের কার্যাবলী কি কি?

2. What are the different forms of Capital? Distinguish between fixed Capital and Circulating Capital.

মূলধনের বিভিন্ন প্রকার কি কি? স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি?

3. What conditions are necessary for the formation of Capital?

মূলধন সংগঠনের উপযোগী অবস্থা কি কি?

4. Describe the sources from which usually Capital of a business is raised.

ব্যবসায়ের মূলধন সংস্থানের উৎসগুলি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

5. What do you understand by Turnover ? What is the relationship between Turnover and Profit ?

মূলধন আবর্তন বলিতে কি বুঝ ? মূলধন আবর্তন ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

6. What is Profit ? Distinguish between Gross Profit and Net Profit.

মুনাফা কাকে বলে ? মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

---

## সপ্তম অধ্যায়

### কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ

#### (Different forms of Business Units)

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জগৎব্যাপী, প্রাকৃতিক সঞ্চ ও অত্যন্ত আর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে মালিকানা (ownership) ও পরিচালনা ব্যবস্থা (management) অনুসারে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

- (১) একমালিকী কারবার (Single Proprietorship Business)
- (২) যৌথ পারিবারিক কারবার (Joint Family Business)
- (৩) অংশীদারী কারবার (Partnership Business)
- (৪) যৌথ মূলধন কারবার (Joint Stock Company form of Business)
- (৫) সমবায় কারবার (Co-operative Business)
- (৬) রাষ্ট্রীয় কারবার (State Enterprise)

#### একমালিকী কারবার (Sole Proprietorship Business)

**সংজ্ঞা (Definition):** যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান একজন মাত্র ব্যক্তির মালিকানা ও পরিচালনাধীন তাহাদিগকে একমালিকী কারবার আখ্যা দেওয়া হয়। যে কোন ব্যক্তিই কোন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবার ইচ্ছা করিলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য কোনরূপ আইনগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমালিকী কারবারী প্রতিষ্ঠানই প্রাচীনতম এবং ইহার সংখ্যা এখনও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক।

#### একমালিকী কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features):

এক মালিকী কারবারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

- (১) গঠন: এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য কোনরূপ বিশেষ আইনগত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে।
- (২) মূলধন-সংস্থান: মালিক স্বয়ং নিজস্ব সঞ্চ হইতে প্রয়োজনীয়

## ৬ বাণিজ্যিক তত্ত্ব

মূলধনের সংস্থান করে। যখন নিজের সঞ্চিত অর্থ পুষাপ্ত হয় না তখন কেএ বিশেষে মালিক ঋণ করিয়াও মূলধনের যোগানের ব্যবস্থা করে।

(৩) মিয়ন্ত্রণ : কারবারে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের ভার মালিক নিজেই বহন করে। সুতরাং কারবারের সমস্ত কর্মগুচ্ছ মালিক নিজেই স্থির করে।

(৪) পরিচালনা : কারবারের পরিচালনার ভার ও মালিক নিজে বহন করে। তবে কারবার বড় আকারের হইলে দৈনন্দিন সকল কাজকর্ম মালিক একা করিতে পারেনা। সেক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাদের সাহায্যে দৈনন্দিন কাজকর্ম নির্বাহ করা হয়।

(৫) দায়িত্ব : কারবারের সমগ্র দায়িত্ব মালিক নিজে বহন করে। সুতরাং কারবার পরিচালনার উদ্দেশ্যে যদি ঋণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব মালিকের। অল্পরূপভাবে কারবার পরিচালনা-ব্যয় সমস্ত ব্যয়ভার মিটাইবার দায়িত্ব মালিকের। কারবারে লোকসান হইলে, সেই লোকসান ও মালিককে একাই বহন করিতে হয়।

মুনাকা বন্টন : কারবারে লোকসান হইলে যেমন মালিক তাহা একাই বহন করে, মুনাকা হইলেও অল্পরূপভাবে মালিক একাই তাহা সম্পূর্ণ ভোগ করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মুনাকার কিছু অংশ মালিক কর্মচারীদের মধ্যেও বন্টন করিয়া দেয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের মুনাকা ভোগ করিবার কোন অধিকার জন্মায় না। ইচ্ছা করিলেই মালিক এইরূপ মুনাকা বন্টন বন্ধ করিয়া দিয়া মুনাকার সবটা নিজেও ভোগ করিতে পারে।

স্বায়ীত্ব : একমালিকী কারবারে স্বায়ীত্ব মালিকের কর্তৃত্বত্ব ও তাহার কারবার চালাইয়া বাইবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

**একমালিকী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Single Proprietorship Business)**

**সুবিধা (Advantage) :** একমালিকী কারবারের সুবিধাগুলি নিম্ন লিখিত রূপ—

(১) একমালিকী কারবার গঠন ব্যাপারে আইনগত কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয় না বলিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিয়া তোলা সহজ।

(২) সমগ্র দায়িত্ব একা বহন করিতে হয় বলিয়া মালিক সাধারণত খুবই সতর্কতার সহিত কারবার পরিচালনা করে।

(৩) মালিক নিজেই সমস্ত কার্যকর দেখাশুনা করে বলিয়া কারবারে অপচয়ের সম্ভাবনা কম থাকে, সামগ্রিকভাবে পরিচালন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয় এবং কারবারের উন্নতি-বিধান সহজ হয়। ইহা ছাড়া মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার পারস্পরিক সম্ভাব বজায় রাখাও সম্ভব হয়। ইহাতে একদিকে যেমন শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে যতদূর শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ সম্পাদন করা ও যায়।

(৪) কারবারের কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে মালিক দ্রুত সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। সুতরাং কারবারে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে অসুবিধা ও বিলম্ব হয় না।

(৫) একমালিকী কারবারে মালিক এবং ক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার ফলে ক্রেতার ব্যক্তিগত বুদ্ধি অসুযোগী পণ্য সরবরাহের সুযোগ এইরূপ কারবারে অধিক। আবার এইরূপ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার ফলে বাজারে চাহিদার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মালিক অধিক সংবাদ ও সংগ্রহ করিতে পারে এবং তদনুসারে ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণ করিতে পারে।

(৬) একমালিকী কারবারে দায় সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া ঋণ সংগ্রহ করা সহজ।

(৭) মুনাকা মালিক নিজেই ভোগ করিতে পারে বলিয়া, মুনাকা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মালিক কঠোর পরিশ্রম করিতে সূচী বোধ করে না।

**অসুবিধা (Disadvantage) :** একমালিকী কারবারের অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

(১) একজন মালিকের ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সুতরাং কারবারের আরও বড় হইলে মালিকের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে মূলধন সংস্থান করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(২) মালিকের নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কিন্তু কারবারে দেনা সম্পর্কিত দায় তাহার সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণে একমালিকী কারবারে বৃহৎসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা খুবই কষ্টসাধ্য।

(৩) একজন ব্যক্তি বিশেষের কর্মক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই কারণে একমালিকী কারবারী প্রতিষ্ঠান যখন বৃহৎসংখ্যক হইয়া পড়ে তখন মালিকের পক্ষে সবদিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। ফলে কারবারের উৎকর্ষ হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া একজন ব্যক্তির সর্ব বিষয়ে দায়িত্ব বহন ও নৈপুণ্য থাকিলে এইরূপ কারবার অসুবিধিত। সুতরাং কারবারের সমন্বয়িত হইলে মালিক একজন

কর্তৃত্ব বিভাগে সর্বজনীন দায়িত্ব সহিত পরিচালনা করিতে পারিবে এইরূপ আশা করা যায় না।

(৪) এইরূপ কারবারের স্থায়িত্বও অনিশ্চিত। কেননা মালিকের অক্ষমতার দরুন বা মালিকের মৃত্যুর পর এইরূপ কারবার বন্ধ হইয়া বাইতে পারে।

### যৌথ পরিবারিক কারবার (Joint Family Business)

ভারতবর্ষে একান্তরীতি হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত দুইটি প্রচলিত আছে। একটি হইল দ্বায়িত্ব ভাগ এবং ইহা কেবল পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত। আর একটি আইন হইল মিতাকরা ইহা ভারতের অবশিষ্টাংশে প্রচলিত।

দায়িত্ব আইন অনুসারে অর্জনকারীই সম্পত্তির একমাত্র মালিক। সম্পত্তির মালিকানা উপর পরিবারের অপর কাহারও কোন অধিকার থাকে না। অর্জনকারীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র এবং কন্যা সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হয়। আবার ইচ্ছা করিলে অর্জনকারী জীবিতকালেই অপর কাহাকেও সম্পত্তির অধিকার দান করিতে পারে।

কিন্তু মিতাকরা আইন অনুসারে সম্পত্তির উপর পরিবারের সকলের যৌথ ভাবে অধিকার থাকে। সম্পত্তির মালিকানা কেবল মাত্র অর্জনকারীর হয় না। এট আইন অনুসারে সম্পত্তির অর্জনকারী ও তাহার পর চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত সকলে সেই সম্পত্তির সহ-অংশীদার বা মালিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

### বৈশিষ্ট্য (Features)

যৌথ পারিবারিক কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) যে ব্যক্তি পরিবারের 'কর্তা' (পিতা অথবা পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি) তিনিই যৌথ পারিবারিক কারবারের ও 'কর্তা'।

(২) কারবার পরিচালনা ও কারবারের নীতি নির্ধারণ কর্তা নিজেই করিয়া থাকে। কারবারের হিসাব কর্তাই তদারক করে। কারবার পরিচালনা ও কারবারের নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কর্তার নিরঙ্কুশ অধিকার থাকায়, কর্তার কারবার সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে পরিবারের অন্যান্য সদস্য কোনরূপ প্রশ্ন হুলিতে পারে না। অন্যান্য সদস্যগণের কেবল মুনাকার অংশ গ্রহণের অধিকার থাকে। কারবারের উপর কর্তার নিরঙ্কুশ অধিকার থাকিলেও পরিবারের প্রাপ্য পাওনা কর্তা মনুব করিতে পারে না।

১০৭  
সদস্য ক'রকারি বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৪) এইরূপ কারবারের হারিষ অধিক। কেননা এইরূপ কারবারে কোন অংশীদারের মৃত্যুতে কারবার বন্ধ হইয়া যায় না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ও অংশীদার কারবারের মধ্যে তুলনা  
(Comparison between Joint Family Business and Partnership Business)—

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ও অংশীদারী কারবারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্যীয় :

(১) গঠন : অংশীদারী কারবারের সৃষ্টি হয় চুক্তির দ্বারা, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সৃষ্টি হয় হিন্দু আইনের দ্বারা।

(২) সদস্য : অংশীদারী কারবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সদস্য হইতে পারে না, কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তান সদস্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

অংশীদারী কারবারে নারী ও পুরুষ উভয়েই সদস্য হইতে পারে কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে নারী কখনও অংশীদার হইতে পারে না তবে দায়ভাগ আইন অনুসারে নারী কোন কোন ক্ষেত্রে দাবির সম্পত্তির অংশীদার বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) নিয়ন্ত্রণ : যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার হিন্দু আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অংশীদারী কারবার অংশীদারগণের চুক্তি অনুযায়ী এবং ১৯৩০ সালের ভারতীয় অংশীদারী কারবারের আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিচালনা : অংশীদারী কারবারে সকল সদস্যই কারবার পরিচালনা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে কেবল পরিবারের 'কর্তা'ই কারবার পরিচালনা কবিতে পারে।

দায় : অংশীদারী কারবারে সদস্যগণের দায় সীমাহীন এবং তাহার কারবারের দায় সংক্রান্ত ব্যাপারে যৌথ ও ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকে কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে অংশীদারগণের দায় নিজ নিজ অংশে দায়ী সীমাবদ্ধ। আবার, অংশীদারী কারবারে একজন সদস্যের কার্যকলাপে অন্য অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ দায়ী হইতে পারে। কিন্তু যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারে 'কর্তা'র কার্যকলাপে অন্য অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ দায়ী থাকেন।

কর্তৃত্ব : অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের দায়-কর্তৃত্ব



## বাণিজ্যিক আইন

নিজদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বোধ হইতে পারে পারিবারিক কারবারে অংশীদারগণের লাভ ক্ষতির অংশ অস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না এবং অবস্থা বিশেষে ইহা বাড়ে ও কমে।

স্বাভিপ্রায় : অংশীদারী কারবারে কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে, কোন অংশীদার দেউলিয়া হইলে অথবা কোনও অংশীদার বিলোপ সাধনের নোটিশ জারি করিলে কারবার তুলিয়া দিতে হয়। কিন্তু বোধ হিন্দু পারিবারিক কারবারে এই সকল ক্ষেত্রে কারবার তুলিয়া দিতে হয় না। সুতরাং অংশীদারী কারবারের তুলনায় বোধ হিন্দু পারিবারিক কারবারের স্বাভিপ্রায় অধিক।

**অংশীদারী কারবার ( Partnership Business )**

**সংজ্ঞা (Definition) :**

১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারী আইনে (Indian Partnership Act, 1932) অংশীদারী কারবারের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে :—

“The Partnership is the relation which subsists between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them on behalf of all of them”—

অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি মিলিত ভাবে অথবা তাহাদের মধ্যে একজন অপর সকলের পক্ষে কারবার পরিচালনা করিয়া অর্জিত মুনাফা নিজদের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হইলে যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহাই অংশীদারী কারবার।

যে সকল ব্যক্তি এইরূপ কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তাহাদের অংশীদার (Partner) বলা হয়। আর এই প্রকার কাঁড়বানী সংগঠনকে অংশীদারী কারবার (Firm) বলা হয়।

**অংশীদারী কারবারের মূল-বিষয়বস্তু ( The essential factor of Partnership ) :**

উপরিউক্ত সংজ্ঞা হইতে মনে হইবে যে, কারবার পরিচালনা করিয়া অংশীদারগণের মুনাফা ভোগ করাই অংশীদারী কারবারের মূল-বিষয়বস্তু। কিন্তু অংশীদারগণের মুনাফা-ভোগ করার বিষয় যদিও গুরুত্বপূর্ণ, ইহা অংশীদারী কারবারের মূল-বিষয়বস্তু নয়। কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিলে তাহা অংশীদারী কারবার বলিয়া পরিগণিত হইবে না। অংশীদারী কারবার কিহা তাহা হিচক করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ঐ সকল ব্যক্তিরা মধ্যে

আনিত হইয়াছে তাহার উক্তকরণে হইল। তাহা যে সম্পর্ক-স্বাক্ষর দ্বারা  
কর্তৃ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের কারবারকে অংশীদারী কারবার বলিয়া গণ্য  
করা হইবে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কটা যদি জন্মগত হয় অথবা  
কোন সামাজিক অধিকার বলে সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাদের কারবারকে  
অংশীদারী কারবার এই আখ্যা দেওয়া যাইবে না। এইজন্য অংশীদারী আইনে  
বুলা হইয়াছে—The relation of Partnership originates from  
contract and not from status—অর্থাৎ অংশীদারী সম্পর্ক চুক্তির দ্বারা  
সৃষ্টি করা হয়, জন্মগত অথবা সামাজিক অধিকারের দ্বারা নহে। এই কারণে  
যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার অংশীদারী কারবার নহে। যৌথ হিন্দু  
পারিবারিক কারবারে সকল অংশীদারই কারবারের মুনাফা ভোগ করে। কিন্তু  
এই সকল অংশীদারের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক তাহা কোন চুক্তির দ্বারা  
স্থিরীকৃত হয় না। ইহারা জন্মগত অধিকার বলে কারবারের মুনাফা ভোগ  
করে। সুতরাং তাহাদের কারবারও অংশীদারী কারবার নহে। অংশীদারী  
কারবারেও দেখা যায় যে কোন অংশীদারের মৃত্যুর পরে তাহার বিধবা পত্নী  
বা নাবালক সন্তান কারবারের মুনাফার অংশ লাভ করে। কিন্তু তৎসঙ্গেও  
ইহারা অংশীদার বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ এ ক্ষেত্রেও চুক্তির অভাব।  
একই কারণে, অর্থাৎ কোনরূপ চুক্তি নাই বলিয়া, অংশীদারী কারবারে কোন  
কোন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের মধ্যে মুনাফার অংশবিশেষ বন্টন করা হইলেও,  
অথবা কোন ঋণদাতাকে বিশেষ সুযোগ হিসাবে সুদ ছাড়া, মুনাফার কিছু  
অংশ দিবার ব্যবস্থা করা হইলেও এই সকল কর্মচারীও ঋণদাতা অংশীদার  
বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সুতরাং দেখা গেল যে চুক্তিই অংশীদারী  
কারবারের মূল ভিত্তি।

**বৈশিষ্ট্য (Features) :** অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :-

(১) গঠন : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মৌখিক অথবা লিখিত চুক্তি বলে  
অংশীদারী কারবার স্থাপন করিতে পারে। এইরূপ কারবারে সর্বনিম্ন সদস্য  
সংখ্যা দুই এবং সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা আইনের দ্বারা স্থির করা হয়। ভারতীয়  
অংশীদারী আইন অনুসারে ব্যাক-প্রতিষ্ঠান ব্যতিত, অর্থাৎ অংশীদারী  
কারবারের সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা ২০ জন। আর ব্যাক-প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক  
সদস্য সংখ্যা ১০ জন।

যে সকল ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া অংশীদারী কারবার গঠন করিয়া  
আইনের অধীনে চুক্তি সম্পাদনের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত

কোনকণ অংশীদারী কারবারে পঠন করিতে পারে না।

সে উদ্দেশ্যে অংশীদারী কারবার পঠন করা হইবে সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে।

(২) পুঁজি : অংশীদারগণই কারবারের পুঁজি সংস্থান করিয়া থাকে। তবে সকল সময়েই প্রত্যেক অংশীদারকে সমপরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্য বাধ্যকতা নাই। কে কত পুঁজি যোগান দিবে তাহা চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির বলে কোন পুঁজির সংস্থান না করিয়াও একজন কারবারের অংশীদার হইতে পারে ইহাকে কার্যকরী অংশীদার বা Working Partner বলে।

(৩) নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা : অংশীদারী কারবারে কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধিকার যৌথভাবে সকল অংশীদারের থাকলেও কার্যত একজন অথবা কয়েকজন নির্বাচিত অংশীদারের উপরই এই ভার অর্পণ করা হইয়া থাকে। তারপ্রাপ্ত অংশীদার কারবার পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কার্য করে সেইকার্যের দায়িত্ব অবশ্য সকল অংশীদারের।

(৪) দায় : অংশীদারী কারবারের দায় ও দেনার জন্য সকল অংশীদার যেমন যৌথভাবে দায়ী থাকে, আবার প্রত্যেক অংশীদার একক ভাবেও দায়ী থাকে। ইহার অর্থ এই যে, এইরূপ কারবারে চুক্তি অহুসারে নির্দিষ্ট হাতে কারবারের দেনার দায় নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। কিন্তু যদি কখনও এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে একজন মাত্র অংশীদার ছাড়া অর্থাৎ অংশীদারকে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, তাহা হইলে ঐ একজন অংশীদার তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারা কারবারের সমস্ত দেনা মিটাইতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) মূল্য : অংশীদারী কারবারে সাধারণতঃ পূর্ব চুক্তি অহুসারে লাভ ক্ষতি অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে কোনকণ চুক্তি থাকে না, সেখানে ভারতীয় অংশীদারী আইন অহুসারে কারবারের লাভ-ক্ষতি সকল অংশীদারগণের মধ্যে সমান হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

(৬) সত্তা : আইনত অংশীদারী কারবারের নিজস্ব কোন সত্তা নাই যেমন, কারবারের নামে কোনকণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তাহা আইনতঃ স্বাক্ষরিত হইবে না। এইজন্য চুক্তি সকল অংশীদারের স্বাক্ষর-সম্মিলিত হওয়া আবশ্যিক।

শ্রীমতঃ

অংশীদারিত্ব চুক্তি পত্র (Partnership Deed or Agreement)  
(Partnership Deed) ১০/৭

অংশীদারগণের মধ্যে পারস্পরিক হৃদয় সন্ধিবাণের (Liberality) এবং  
এক Ultimate good faith) উপর ভিত্তি করিয়া অংশীদারী কারবার  
উপে এবং কারবারের স্বাধিক্য এইরূপ সন্ধিবাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উক্ত  
সময়কাল বিবরণ বিরোধের সম্ভাবনা বড়ই। সম্ভব হ্র করিবার উদ্দেশ্যে, অংশীদার  
গণের মধ্যে কারবারের উদ্দেশ্য-এ কার্যপদ্ধতি, নিজেরের স্বার্থ ও অধিকার  
এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বেই চুক্তি সম্পাদিত হওয়া বাহ্যনীয়।

অংশীদারী চুক্তি বৌদ্ধিক অথবা লিখিত দুই প্রকার হইতে পারে। তবে  
বৌদ্ধিক চুক্তির পরিবর্তে লিখিত চুক্তি হওয়াই বাহ্যনীয়। কেননা বৌদ্ধিক  
চুক্তির বলে অংশীদারী কারবার গঠিত হইলে ভবিষ্যৎ বিরোধ বা অংশীদারগণের  
মত-পার্থক্য নিরসন করা কঠিন হইয়া পড়ে। আবার লিখিত চুক্তি ও রেজিস্ট্রি-  
কৃত হওয়া উচিত। কারণ লিখিত চুক্তি রেজিস্ট্রিকৃত হইলে প্রয়োজনবোধে  
অংশীদারগণ সম্পূর্ণভাবে আইনের স্বযোগ গ্রহণ করিতে পারে। লিখিত  
চুক্তিতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ থাকে :—

- (১) কারবারের নাম ;
- (২) কারবারের উদ্দেশ্য ;
- (৩) কারবারের স্বাধিক্য ;
- (৪) অংশীদারগণের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ;
- (৫) মূলধনের পরিমাণ এবং অংশীদারগণ যে হারে মূলধনের সংগ্রহ  
করিবে সেই হার ;
- (৬) মূলধনের উপর স্বহ গণনা করা হইবে কিনা, এবং হইলে স্বহের  
কত হইবে ;
- (৭) অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-ক্ষতি যে হারে বন্টন করা হইবে  
সেই হার ;

(৮) কোন অংশীদার বেতন পাইবে কিনা, পাইলে তাহার পরিমাণ

(৯) ভবিষ্যৎ মূল্যকার আশা করিয়া অংশীদারগণ কারবার হইতে  
সম্পূর্ণ ভুক্তিতে থাকিবে কিনা এবং এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সেই অংশীদার  
আবার উপর মূল্যকার হইবে কিনা, হইলে তাহার হার কি

(১০) কারবারের পরিচালনা ব্যবস্থা এবং অংশীদারগণের মধ্যে প্রমিতভাগ ;

(১১) কারবারের হিসাব রক্ষণ ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা ;

(১২) যে ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখিতে হইবে তাহার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ;

(১৩) কোন কোন অংশীদারের চেক ও অন্যান্য দলিলপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার থাকিবে ;

(১৪) কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ বা কোন বর্তমান অংশীদারকে বহিকার করিতে হইলে কি অবস্থায় বহিকার করা যাইবে এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ,

(১৫) কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে, বা কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(১৬) অংশীদারগণের মধ্যে মতপার্থক্য বা বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানের জন্য মধ্যস্থ ( arbitrator ) নিয়োগের ব্যবস্থা ;

(১৭) কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে, কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে অথবা কারবারে কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ করা হইলে, অংশীদারগণের স্বত্ব নিরূপণ ও দায় মিটাইবার উদ্দেশ্যে কারবারের প্রতিষ্ঠা মূল্য ( goodwill ) কিরূপে স্থির করিতে হইবে .

(১৮) কারবার তুলিয়া দিবার প্রণালী ।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়া ও চুক্তিপত্রে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির উল্লেখ থাকিতে পারে। আবার, সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে চুক্তির কোন কোন ধারা ভবিষ্যতে পরিবর্তন করা যাইবে। চুক্তিপত্রে সকল অংশীদার স্বাক্ষর করিয়া থাকে ।

**অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকার ( Different types of Partnership ) :**

অংশীদারী কারবার দুই প্রকার হইতে পারে—

(১) সাধারণ অংশীদারী কারবার ( Ordinary Partnership Business )

(২) সীমাবদ্ধ দায়মুক্ত অংশীদারী কারবার ( Limited Partnership Business )

যে অংশীদারী কারবারে কারবারের দেনার জন্য সকল অংশীদারেরই দায় সীমাবদ্ধ ( limited ) থাকে তাহাকে

যে অংশীদারী কারবারে কারবারের দেনার জন্য এক বা একাধিক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ, আর অবশিষ্ট অংশীদারের দায় সীমাহীন তাহাকে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার বলা হয়। এইরূপ কারবারের রেজিস্ট্রেশন আইনত বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে এইরূপ কারবারকে সাধারণ অংশীদারী কারবার বলিয়া গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে এই প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠান নাই। ইংলণ্ডে ১৯০৮ সালে প্রথম এই ধরনের অংশীদারী কারবার প্রচলিত হয়।

**অংশীদারগণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Partners) :** দায় অনুসারে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:—(১) সাধারণ অংশীদার (২) সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত অংশীদার।

**সাধারণ অংশীদার (Ordinary Partner) :** কারবারের দেনার জন্য এইরূপ অংশীদারের দায় সীমাহীন। এইরূপ অংশীদার কারবারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে।

**সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত অংশীদার (Limited Partner) :** কারবারের দেনার জন্য এইরূপ অংশীদারের দায় তাহার মূলধনের সম পরিমাণ। সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত অংশীদার কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিলেই তাহার দায় আর সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন তাহাকে সাধারণ অংশীদার বলিয়া গণ্য করা হয়। সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত অংশীদারের পরামর্শ দিবার ও কারবারের হিসাবপত্র পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকে।

উপরোক্ত দুইটি শ্রেণী ছাড়া অংশীদারগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ও বিভক্ত করা যায়—

**উদ্যোগী অংশীদার (Active Partner) :** যে অংশীদার কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহাকে উদ্যোগী অংশীদার বলা হয়।

মূলধন না দিয়া যদি উদ্যোগী অংশীদার হয় তবে তাহাকে Working Partner বা কার্যকরী অংশীদার বলা হয়।

**অনুদ্যোগী অংশীদার (Sleeping or Dormant Partner) :** যে অংশীদার কেবল কারবারে মূলধনের সংস্থান করে এবং তাহার পরিচালনায় অংশ পাইবার অধিকারী হয়, অথচ কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না তাহাকে অনুদ্যোগী অংশীদার বলা হয়।

### আপাত: দৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi Partner) :

যে অংশীদার কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূলধন কারবার হইতে তুলিয়া লয় নাই, তাহাকে আপাত: দৃষ্টিতে অংশীদার বলা হইতে পারে। এইরূপ অংশীদারের মূলধন কারবারের ঋণ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং মুনাকার ভ্রাস-বৃদ্ধি অল্পসারে তাহারা তাহাদের ঋণের উপর হস্ত পায়। ইহারা বস্তুত: কারবারের ঋণদাতা।

### নামমাত্র অংশীদার (Nominal Partner) :

এইরূপ অংশীদার কারবারে মূলধন ও নিয়োগ করে না এবং কারবার-পরিচালনার ও অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু কারবারের সঙ্গে ইহাদের নাম ও ব্যক্তিগত প্রভাব যুক্ত থাকে এবং ফলে কারবারের ঋণের জন্য ঋণদাতার কাছে সাধারণ অংশীদারের মতই দায়ী থাকে।

### আচার-আচরণে অল্পমিত অংশীদার (Partner by holding out) :

অনেক সময় দেখা যায় যে, এক একজন ব্যক্তি নিজের আচার আচরণে এমন ভাব প্রকাশ করে যে, তৃতীয় পক্ষ তাহাকে কারবারের অংশীদার বলিয়া মনে করে, যদিও প্রকৃত পক্ষে সে কারবারের অংশীদার নয় (এইরূপ ব্যক্তিকে আচার আচরণে অল্পমিত অংশীদার বলা যায়। এইরূপ অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট তাহার কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য অংশীদারী কারবার দায়ী হয় না। অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আচার আচরণে অংশীদার হইয়া পড়ে।

### অংশীদারী কারবারে নাবালকের স্থান (The Place of a minor in the Partnership Business) :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অংশীদারী কারবার চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া অংশীদারী কারবার গঠন করে তাহাদের আইনত চুক্তি করিবার অধিকার থাকা চাই। কিন্তু নাবালকের আইনত চুক্তি করিবার অধিকার নাই বলিয়া সে অংশীদারী কারবারের অংশীদারও হইতে পারে না।

অংশীদার হইবার অধিকার না থাকিলেও, অত্যন্ত অংশীদারগণের সম্মতি প্রাপ্ত নাবালককে অংশীদারী কারবারে গ্রহণ করা যায় এবং জোপের স্বযোগও দেওয়া যায়। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে বতর্কিত সে

থাকে। অন্তান্ত অংশীদারের মত তাহার দায় অসীম নহে। সে কারবারের অংশীদার হিসাবে থাকিবে কি থাকিবে না এই সিদ্ধান্ত সাবালক হইবার ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ্ত ঘোষণায় জানাইতে হইবে। যদি সে কারবারের অংশীদার হিসাবে থাকিতে সাবাস্ত করে তাহা হইলে সাবালক অবস্থায় প্রথম যেদিন সে কারবারে যোগদান করিয়াছিল সেইদিন হইতে কারবারের কার্য-কলাপের জন্য সে দায়ী বলিয়া গণ্য হয়। আর যদি অংশীদার হিসাবে না থাকিবার সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা হইলে তাহার দায় প্রকাশ্ত ঘোষণার দিন পর্যন্ত ধার্য হয়।

সাবালক হইবার পর অংশীদার হিসাবে থাকিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনটাই যদি সে প্রকাশ্ত ঘোষণায় দ্বারা না জানায় তাহা হইলে আইনত সে কারবারের অংশীদার বলিয়া গণ্য হইবে।

**অংশীদারী অধিকার, কর্তব্য, এবং দায় (Rights, duties and liabilities of a Partner) :**

অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য নিম্নেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। চুক্তি যখন লিখিত হয় তখন লিখিত চুক্তিতে এই সকল অধিকার ও কর্তব্যের উল্লেখ থাকে। অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় অংশীদারী আইন অনুসারে অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য স্থির হয়। আইনে নিম্নলিখিত অধিকার ও কর্তব্যের বিশেষ উল্লেখ আছে :—

**অধিকার (Rights) :**

(১) সকল অংশীদারেরই কারবারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। এইরূপ পরিচালন কার্যের জন্য কোন অংশীদার বেতন লইতে পারিবে না। অবশ্য চুক্তিতে পরিচালন-কার্যের জন্য কোন অংশীদারকে বেতন দিবার উল্লেখ থাকিলে, বেতন দিতে কোন বাধা নাই।

(২) কারবারের নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে প্রত্যেক অংশীদারের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকিলে ও সাধারণত এইরূপ নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করা হয়। তবে কারবারের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইতে হইবে। অল্পরূপে তাহা কারবারে কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ করিতে হইলে, কোন বর্তমান অংশীদারকে বহিষ্কৃত করিতে হইলে অথবা চুক্তিপত্রের ধারাগুলির কোন পরিবর্তন করিতে হইলে সন্তান অংশীদারের সন্মতি প্রয়োজন।



(৩) প্রত্যেক অংশীদারের কারবারের হিসাব-পত্র ও অন্যান্য দলিল পরীক্ষা করিবার অধিকার আছে।

(৪) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ না থাকিলে কারবারের লাভ ও ক্ষতি সকল অংশীদার সমান হারে ভোগ ও বহন করিবে।

(৫) কোন অংশীদার চুক্তি অস্বীকারী বত মূলধন কারবারে নিয়োগ করিতে বাধ্য তাহার অতিরিক্ত অর্থ যদি সে কারবারে নিয়োগ করে, তত্বেই হইলে তাহার এই অতিরিক্ত অর্থের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে স্বত্ব পাইবার অধিকার থাকিবে।

(৬) যদি কোন অংশীদার কারবারের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এমন কার্য করে বাহার কলে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি-পূরণ লাভের অধিকার থাকিবে।

(৭) যদি কারবারের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন সাধন করা হয়, অথবা যদি কোন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, কিংবা কারবার প্রথমে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও যদি সেই সময় অতিক্রান্ত হইবার পরও কারবার চালু রাখা হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই অংশীদারগণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(৮) কোন অংশীদার বিশেষ প্রয়োজনবোধে কারবার বন্ধ করিয়া দিবার বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কারবার বন্ধ হইয়া গেলে কারবারের দায় মিটাইয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি-নির্দিষ্ট হারে অথবা চুক্তির অভাবে সমানহারে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

### কর্তব্য ( Duties ) :

(১) সকল অংশীদারকে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে কারবার পরিচালনা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রত্যেক অংশীদারকে পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে।

(২) সকল অংশীদারকেই পারস্পরিক 'চূড়ান্ত সন্ধিমান' ( *Uberimae fidei* ) বজায় রাখিতে হইবে। কারণ, এই পারস্পরিক চূড়ান্ত সন্ধিমানের উপর ভিত্তি করিয়াই অংশীদারী কারবার গড়িয়া উঠে।

(৩) কোন অংশীদারই কারবারের নাম ভাঙ্গাইয়া নিজে ব্যক্তিগত ক্ষতি-পূরণ চেষ্টা করিবে না। অন্তঃপাতিত, ভোগ্য অংশীদারী, ভাগীদার

সম্পত্তি নিজের ব্যক্তিগত অধিধার জন্ত বা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৪) কারবারের জন্ত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কোন অংশীদার ব্যক্তিগত ভাবে কোনরূপ দস্তরি (Commission) লইতে পারিবে না।

(৫) কারবারের দৈনন্দিন পরিচালন কার্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের হত্যায়ত সকল অংশীদারকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে।

### দায় (Liabilities) :

(১) সাধারণ অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের দায় সীমাহীন (Unlimited liability) অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদার তাহার সকল সম্পত্তির বিনিময়ে কারবারের দেনা অথবা ক্ষতি সংক্রান্ত দায় মিটাইতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কারবারের সকল প্রকার দেনার জন্ত সকল অংশীদার যৌথ ও এককভাবে (jointly and severally) দায়ী থাকিবে।

(৩) কোন নতুন অংশীদার, কারবারে তাহার যোগদানের পূর্ববর্তী সময়ের দেনার জন্ত দায়ী হয় না। অবশ্য চুক্তির বলে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

(৪) কোন অবসর প্রাপ্ত অংশীদার তাহার অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কারবারের সকল দেনা ও কার্যের জন্ত দায়ী থাকে। অবশ্য পাওনাদারে সম্মতি ক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ অংশীদারকে তাহার অবসর গ্রহণে পূর্বে সংগঠিত কারবারের দেনার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া বাইতে পারে।

(৫) একজন অংশীদার কারবার সংক্রান্ত তাহার কার্যকলাপের দ্বারা অন্যান্য সকল অংশীদারকে দায়বদ্ধ করিতে পারে।

### অংশীদারী কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ (Registration of Partnership Business) :

অংশীদারী কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক নহে। তবে রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে অংশীদারী কারবারকে কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় যেমন—(১) রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে অংশীদারী কারবার কোন তৃতীয় পক্ষে নিকট হইতে এক শত টাকার অতিরিক্ত ঋণ আদায়ের জন্ত আদালতে দায়ী হইতে পারিবে না;

(২) কোন অংশীদার তাহার নিজের অধিকার ও স্বার্থ অক্ষত রাখিবার জন্ত অংশীদার বা কারবারী প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আদালতে দায়ী হইতে পারিবে না।

## ১. বাণিজ্যিক তত্ত্ব

এই দুইটি অস্থিবিধা দূর করিবার জন্ত এবং ভবিষ্যতে অংশদারগণের মধ্যে বিরোধ ও মত পার্থক্যের সম্ভাবনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণত অংশদারী-কারবার রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে অংশদারী কারবার রেজিস্ট্রিকৃত না হইলেও কোন তৃতীয় পক্ষের অথবা অংশদারগণের নিজেদের মধ্যে নিয়মিত অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে—

(১) তৃতীয় পক্ষ প্রয়োজন হইলে কারবারের বিরুদ্ধে অথবা অংশদারগণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারে;

(২) কোন অংশদার কারবার ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত, কারবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর কারবারের হিসাব পরীক্ষার জন্ত, অথবা কারবারের সম্পত্তি হইতে কারবারের দেনা মিটাইয়া বাহা উদ্ধৃত থাকে তাহার অংশের দাবি করিয়া আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারে।

ভারতবর্ষে অংশদারী কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ নিয়রূপ উপায়ে সংগঠিত হইয়া থাকে।

(১) প্রত্যেক রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট এলাকার জন্ত একজন রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করে। যে সকল অংশদারী কারবারের প্রধান কার্যালয় অথবা কোন শাখা এই এলাকায় অবস্থিত সেই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিকরণের উদ্দেশ্যে যে কোন সময়ে তিন টাকা ফি এবং সকল অংশদারের সহি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করিতে পারে।

(২) উল্লিখিত বিবরণীতে নিয়মিত বিবরণগুলির উল্লেখ থাকে—

(ক) কারবারী প্রতিষ্ঠানের নাম :

(খ) কারবারের কর্মস্থল অর্থাৎ কোন এলাকার কারবার পরিচালিত হইবে তাহার উল্লেখ ;

(গ) অংশদারগণের কারবারে যোগদানের তারিখ ;

(ঘ) প্রত্যেক অংশদারগণের নাম ও ঠিকানা

(ঙ) কারবারের মেয়াদ।

বিবরণীতে লিখিত বিবরণগুলি সম্পর্কে রেজিস্ট্রার সন্দেহ হইলে এবং তাহা কোনরূপ অভিযোগ না থাকিলে তাহার অফিসে সংরক্ষিত কারবারে রেজিস্ট্রারে এই সকল বিবরণগুলি লিখিয়া রাখা হয়। পরে যে কোন ব্যক্তি এই বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া এই রেজিস্ট্রার পরিদর্শন করিতে পারে এবং রেজিস্ট্রারে লিখিত বিবরণগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

বিবরণীতে লিখিত বিষয়গুলির ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন সাধন করা হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রারের গোচরীকৃত করিতে হইবে।

**অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব (Duration of Partnership Business) :**

অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব এইরূপ কারবারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি কোন অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা যদি কোন একটা বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই নির্দিষ্ট সময় অস্তে অথবা সেই বিশেষ কার্য সম্পাদিত হইয়া গেলে ঐরূপ অংশীদারী কারবারের অবসান বা বিলোপ সাধন করা হয়। এইরূপ অংশীদারী কারবারকে বিশেষ অংশীদারী কারবার (Particular Partnership) বলা হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও অথবা কোন বিশেষ কার্য সম্পাদিত হইয়া যাইবার পরও এই ধরনের অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব বজায় থাকিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব ও পূর্বের স্তায় বজায় থাকে।

যে অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অংশীদারী কারবারকে 'ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবার' (Partnership at will) বলা হয়। এইরূপ অংশীদারী কারবার অংশীদারগণের ইচ্ছানুসারে চলিতে থাকে এবং কারবার ভাঙ্গিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

**অংশীদারী কারবারের অবসান ও বিলোপ (Dissolution of Partnership Business) :**

বিভিন্ন উপায়ে অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটান হইতে পারে। যথা—

(১) চুক্তি অনুসারে অবসান, (২) কোন আকস্মিক ঘটনা অথবা পূর্ব নির্দিষ্ট ঘটনা সংগঠিত হইবার ফলে অবসান, (৩) অংশীদারের অভিপ্রায় অনুসারে 'ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবারের' অবসান, (৪) বাধ্যতামূলক অবসান, (৫) আদালতের নির্দেশানুসারে অবসান।

**চুক্তি অনুসারে অবসান :** সকল অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে অথবা অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তি অনুসারে অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটান যায়।

আকস্মিক ঘটনা অথবা পূর্বনির্দিষ্ট ঘটনা সংগঠিত হইবার

ফলে অবসান :

(১) যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিংবা যদি কোন বিশেষ কা

সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অংশদারী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নির্দিষ্ট সময় অন্তে অথবা বিশেষ কাৰ্খটি সম্পাদিত হইবার পর অংশদারী কারবারের বিলোপ ঘটে।

(২) যদি কোন অংশদারের মৃত্যু হয় অথবা যদি কোন অংশদারকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলেও অংশদারী কারবারের অবসান হয়।

#### অংশদারের অভিপ্রায় অনুসারে অবসান :

যদি কোন অংশদার কারবারের অবসান ঘটাইবার অভিপ্রায় জানাইয়া অপরাপর অংশদারগণকে নোটিশ দেয়, তাহা হইলে ঐচ্ছিক অংশদারী কারবারের অবসান হয়।

#### বাধ্যতামূলক অবসান :

(১) যদি সকল অংশদারকে অথবা একজন ব্যতীত অপর সকল অংশদারকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে অংশদারী কারবারের বাধ্যতামূলক বিলুপ্তি ঘটে।

(২) যদি ঘটনাক্রমে কারবারের কার্যকলাপকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় তাহা হইলেও বাধ্যতামূলকভাবে কারবারের অবসান ঘটান হয়।

#### আদালতের নির্দেশানুসারে অবসান :

যদি কোন অংশদার কারবারের অবসানের জন্য আদালতে হাজিরা দাখিল করে, তাহা হইলে আদালত নিম্নলিখিত যে কোন একটি কারণে কারবারের অবসান ঘটাইতে পারে :—

- (১) যদি কোন অংশদার বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়ে,
- (২) যদি কোন অংশদার কার্য-সম্পাদনে স্বার্থীভাবে কাজ করিয়া পড়ে,
- (৩) যদি কারবার পরিচালনকালে কোন অংশদার তৃতীয় অপরাধ করে,
- (৪) যদি কোন অংশদার ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রমশঃ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চলে, অথবা তাহার আচার-আচরণের ফলে অন্যান্য অংশদারগণের সঙ্গে তাহার মধ্যে মিলিত ভাবে কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে,
- (৫) যদি কোন অংশদার তাহার কারবারের অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে, অথবা তাহার অংশ যদি আদালত কর্তৃক আটক করা হয়,
- (৬) যদি আদালত মনে করে যে লাভজনক ভাবে ঐ কারবার পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়,

(৭) যদি অন্য কোন কারণে আদালত এই কারবারের বিলোপ সাধন করার ক্ষমতা দেন তবে ।

**অংশীদারী কারবারের সুবিধা-অসুবিধা ( Advantages and disadvantages of Partnership Business ) :**

**সুবিধা :**

(১) অংশীদারী কারবার গঠনে বিশেষ কোন আইনগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয় না বলিয়া এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ ;

(২) এক মালিকী কারবারের তুলনায় অংশীদারী কারবারে মূলধনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় অংশীদারী কারবারের পরিধি বিস্তৃত করিয়া বহুল উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা সম্ভব ;

(৩) অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ নিজ নিজ সামর্থ্যও দক্ষতা অনুযায়ী কারবারের বিভিন্ন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া সমগ্র কারবারের পরিচালন-ব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে ;

(৪) অংশীদারগণের দায় সীমাহীন বলিয়া এবং তাহারা সকলে বোধ ও এককভাবে কারবারের দেনার জন্য দায়ী থাকে বলিয়া অংশীদারী কারবারের পক্ষে বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ সহজসাধ্য হয় ;

(৫) অংশীদারগণের দায় সীমাহীন হওয়ায় এবং তাহারা বোধ ও এককভাবে দায়ী থাকে বলিয়া, অংশীদারগণ অভ্যন্তরীণ সতর্কতার সঙ্গে কারবার পরিচালনা করে ;

(৬) বিরোধ উপস্থিত হইলে বা মতপার্থক্য দেখা দিলে অংশীদারগণ ইচ্ছানুসারে কারবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে পারে বলিয়া অংশীদারগণের স্বার্থ এবং চুক্তির অঙ্গ থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে পড়িয়া ব্যক্তিগত মতামত বিপরীত দিবার প্রয়োজন হয় না ।

(৭) প্রয়োজনবোধে নতুন অংশীদার গ্রহণ করিয়া, মূলধনের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া এবং কারবারের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করিয়া সমগ্র কারবারের পরিবর্তন ও পরিবর্তন করা সহজসাধ্য ।

**অসুবিধা :**

(১) অংশীদারী কারবারে একজন অংশীদার তাহার কার্যকলাপের দ্বারা অন্যান্য সকল অংশীদারকে দায়বদ্ধ করিতে পারে বলিয়া, অনেকে এইরূপ কারবারে যোগদান করিতে উৎসাহ বোধ করে না

(২) কোন অংশীদার সর্বসম্মতিক্রমে ছাড়া কারবারে তার অংশ হস্তান্তর করিতে পারে না বলিয়া অনেকে এইরূপ কারবারে মূলধন নিয়োগ করিতে সম্মত হয় না ;

(৩) পারস্পরিক সন্নিধান; সত্যতা ও বন্ধুত্বের উপর অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যে এই সকল গুণাবলী দৃষ্ট হয় না, ফলে অংশীদারী কারবার বিনষ্ট হয় ;

(৪) অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্বও দৃঢ় নয়। কারণ, অংশীদারগণের মধ্যে সত্যতার অভাব দেখা দিলে, তাহাদের মধ্যে মতপার্থক্য উপস্থিত হইলে, অথবা কোন অংশীদারের মৃত্যু বা মান্তক বিকৃতি ঘটিলে, কোন অংশীদারকে ছেড়লিয়া ঘোষণা করা হইলে অংশীদারী কারবারের অবসান হয়। অনেক সময় দেখা যায় বহু-লাভজনক কারবারী প্রতিষ্ঠান এই সকল কারণে অসময়ে ভাঙিয়া যায় ;

(৫) মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করাও অংশীদারী কারবারে সহজসাধ্য নয়। কারণ, মূলধন যোগানের ক্ষেত্রে অংশীদারগণের ব্যক্তিগত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফলে, বহল-উৎপাদন-কারবারের উপযোগী মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

### যৌথ-মূলধনী কারবার : ( Joint Stock Company )

#### সংজ্ঞা Definition :

যখন কিছু সংখ্যক লোক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া অর্থ বা অর্থের সমতুল্য সম্পদের যোগানের দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করিয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে, সেই প্রতিষ্ঠানকে যৌথ মূলধনী কারবার বলা হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এক একটি অংশকে শেয়ার (share) বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি এই সব শেয়ার ক্রয় করে তাহাদিগকে শেয়ারহোল্ডার বলা হয় এবং তাহারা কারবারের মালিক বলিয়া গণ্য হয়। শেয়ার হোল্ডারগণ ইচ্ছানুসারে নিজেদের শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারে। সাধারণত শেয়ারহোল্ডারগণের দায়িত্ব (liability) তাহাদের মূলধনের পরিমাণ অস্থায়ী সীমাবদ্ধ হয়। শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালক বোর্ডের (Board of Directors) দ্বারা কারবার পরিচালিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার আইনসম্মত ভাবে বিধিবদ্ধ করিতে হয় এবং এইরূপ বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কারবারের আইনগত নিজস্ব সত্তা (legal entity) তৈরি

হয়। কারবারের নিজস্ব এই সত্তা কারবার সংগঠনকারীদের সত্তা হইতে আলাদা। কিন্তু অংশীদারী কারবারে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে অংশীদারী কারবারের নিজস্ব কোন সত্তা নাই, অংশীদারগণের সত্তাই উহার সত্তা। যৌথ মূলধনী কারবারের নিজস্ব সত্তা থাকার ফলে, কারবারের নামেই ঋণ-সংগ্রহ, নামলা-পরিচালনা ইত্যাদি কার্য সম্পাদিত করা হয় এবং আইনের দৃষ্টিতে তাহা গ্রহণ হয়।

### যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features) :

যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া যৌথ মূলধনী কারবার গঠন করে। কিন্তু রাষ্ট্র বা আইনদ্বারা ইহা স্বীকৃত না হইলে এইরূপ সংগঠন কার্য-করিতে পারেনা। সুতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ হওয়া প্রয়োজন।

(২) এইরূপ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহার আইনগত নিজস্ব সত্তার সৃষ্টি হয়। এবং ইহা সংগঠন কারীদের সত্তা-নিরপেক্ষ।

(৩) এইরূপ কারবারের নিজস্ব সীল মোহর (common seal) থাকে এবং এই সীল মোহরের দ্বারা এইরূপ সংস্থা পরিচিত হয়।

(৪) আইনগত পৃথক সত্তা থাকার দরুন এই প্রকার কারবারের অস্তিত্ব চিরন্তন হয় (Perpetual succession) এবং বিশেষ আইনগত ব্যবস্থাদি ছাড়া এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন বা অবসান ঘটান যায় না ;

সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা এইরূপ কারবারে মূলধনের সংস্থান করা হয় ;

(৬) সদস্যগণই এইরূপ কারবারের মালিক বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য সাধারণ সদস্যগণ কারবারের প্রাত্যহিক পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কারবারের পরিচালনা উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন পরিচালক মণ্ডলীর উপর নির্ভর করে। ফলে এই প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে ;

(৭) সদস্যগণের শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া যৌথ মূলধনী কারবারের সদস্যগণ নিরন্তর পরিবর্তনশীল। ফলে, এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাও প্রায় পরিবর্তন হয় ;

(৮) এই প্রকার কারবারের কর্তৃপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠত্বের সভ্যত্ব সঙ্গতভাবে নিখারিত হয়।

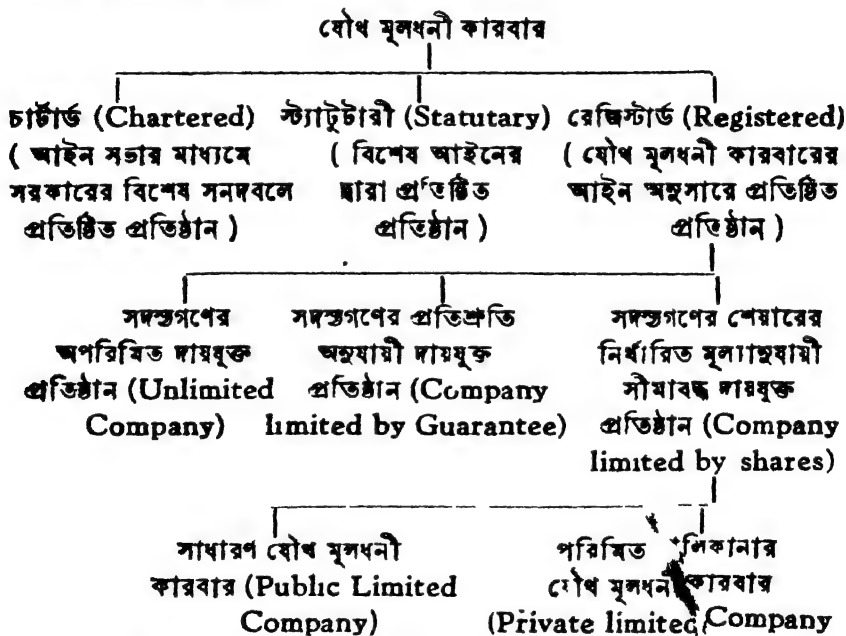


(২) সদস্যগণের দায়িত্ব তাহাদের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় (Limited liability);

(১০) সদস্যগণের মধ্যে মূনাকার বন্টন হয়, তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে।

**যৌথ মূলধনী কারবারের বিভিন্ন রূপ :** (Different types of Joint Stock Company)

নিম্নের রেখা-চিত্রটি অঙ্কন করিলে যৌথ মূলধনী কারবারের প্রণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে।



উপরিস্থ বিভিন্ন প্রণী যৌথ মূলধনী কারবারের সংক্ষিপ্ত রিচয় নিয়ে বর্ণিত গেল।

(১) **চার্টার্ড কোম্পানী (Chartered Company)**

যৌথ মূলধনী কারবারের আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ইংলণ্ড বিশেষ ঘোষণাবলে যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইত। সংগঠকগণক এইরূপ কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন সভার মাধ্যমে রাজার সম্মতি ও অর্থ সাহায্যের আবেদন করিতে হইত। এইরূপ কারবারের নামের সঙ্গে 'চার্টার্ড' এই কথাটি যুক্ত থাকিত। ভারতবর্ষে কোন চার্টার্ড কোম্পানী নাই।

(২) স্ট্যাটুটারী কোম্পানী (Statutory Company) :

আইন সভার বিশেষ আইনের বলে স্থাপিত বোধ মূলধনী কারবারকে স্ট্যাটুটারী কোম্পানী বলা হয়। সাধারণত কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এইরূপ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ট্রামওয়েজ, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সার্ভাই করপোরেশন প্রভৃতি এই জাতীয় স্ট্যাটুটারী কোম্পানী।

(৩) রেজিস্টার্ড কোম্পানী বা রেজিস্ট্রিকৃত বোধ মূলধনী কারবার (Registered Company) :

১৮৬৬ সালের ভারতীয় বোধ মূলধনী কারবারের আইন অনুসারে যে প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিকৃত হয় তাহাকে রেজিস্ট্রিকৃত বোধ মূলধনী কারবার বা রেজিস্টার্ড কোম্পানী বলা হয়।

রেজিস্টার্ড কোম্পানীকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) সদস্যগণের অপরিমিত দায়মুক্ত প্রতিষ্ঠান (Unlimited Company) : যে কারবারের দায়ের জন্ত সদস্যগণের দায়িত্ব অপরিমিত বা সীমাহীন হয়, তাহাকে সদস্যগণের অপরিমিত দায়মুক্ত প্রতিষ্ঠান বলা হয়। এইরূপ বোধ মূলধনী কারবার বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় না।

(খ) সদস্যগণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়মুক্ত প্রতিষ্ঠান (Company limited by Guarantee) :

এইরূপ কারবারের ঋণের দায়িত্ব সদস্যগণ পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বহন করে। সদস্যগণ যে হারে এই ঋণ বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা কোম্পানীর চেম্বারেণ্ডামে উল্লেখ করা হয়। ক্রাব, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

(গ) সদস্যগণের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী দায়মুক্ত প্রতিষ্ঠান (Company limited by Shares) :

এই প্রকার বোধ মূলধনী কারবারের সদস্যগণের দায় তাহাদের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য (face value) অনুযায়ী সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে সদস্যগণের দায় তাহাদের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত হইবে পারিবে না। বর্তমানকালে অধিকাংশ বোধ মূলধনী কারবার এই শ্রেণীভুক্ত।

উক্ত প্রকার কারবারকে অর্থাৎ সদস্যগণের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী দায়মুক্ত প্রতিষ্ঠানকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবার (Public limited Company) :

এই ধরনের কারবারী প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত সকল প্রণীত জন-সাধারণের নিকট আবেদন করে। এই আবেদনে সাড়া দিয়া যে সকল ব্যক্তি শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছার পত্র প্রেরণ করে তাহাদের সকলের নিকট অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবারের সমস্ত আবেদনকারী জনসাধারণের মধ্য হইতে নির্ধারিত হয়। সুতরাং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সমস্ত সংখ্যা অধিক হয় এবং কারবারের মালিকানার পরিসর ও বিস্তৃত হয়।

সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবারের সর্বনিম্ন সমস্ত সংখ্যা সাত এবং সর্বাধিক সমস্ত সংখ্যা শেয়ারের সংখ্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ। কোম্পানীর নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রারের নিকট এইরূপ প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে আইনের দৃষ্টিতে তাহা স্বীকৃতি পায় না। কারবার রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পর সংগঠকেরা শেয়ার ক্রয়ের জন্ত জনসাধারণের নিকট আবেদন করে। শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা মূলধনের ন্যূনতম অংশ (minimum subscription) সংগৃহীত হওয়ার পর কারবারের কার্যারম্ভের জন্ত কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট পুনরায় আবেদন করিতে হয়। নিবন্ধকের নিকট হইতে অনুমতি পাওয়া গেলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কার্যারম্ভ করিতে পারে। সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার সহজে হস্তান্তর করা যায়।

(২) পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার (Private Limited Company) :

এই ধরনের কারবারী প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন সমস্ত সংখ্যা দুই, এবং কর্মচারী সমস্ত বাদে, সর্বাধিক সমস্ত সংখ্যা পঞ্চাশ। সুতরাং বুঝা যায় যে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বল্প সংখ্যক সমস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ার অথবা অন্য পত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতে পারে না এইরূপ কারবারে নানা রূপ বাধা নিবেদন আরোপ করিয়া শেয়ার হস্তান্তরের অধিকারকেও সঙ্কচিত করা হইয়া থাকে।

সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবার ও পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a private limited company and a public limited company) :

**সাধারণ বোধ মূলধনী কারবার :**

(১) ইহার সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা সাত এবং সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা কারবারের শেষারের সংখ্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) ইহার নামের শেষে 'লিমিটেড' কথাটি যুক্ত থাকে।

(৩) শেষার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিবরণ পত্র (prospectus) প্রকাশ করিতে হয় এবং তাহা কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট (Registrar of companies) প্রেরণ করিতে হয়।

(৪) ইহার ক্ষেত্রে শেষার সহজে হস্তান্তর করা যায়।

(৫) এইরূপ কারবারে মূলধনের নূনতম অংশ (minimum subscription) সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রোডাক্টের মধ্যে শেষার বন্টন (allotment of shares) করা যায় না।

(৬) এইরূপ কারবার রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পরই কার্যারম্ভ করিতে কোম্পানী নিবন্ধকের (Registrar) নিকট হইতে কার্যারম্ভের প্রমাণপত্র (Certificate of commencement) পাইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে হয়।

**পরিমিত মালিকানাধীন বোধ মূলধনী কারবার :**

(১) ইহার সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা দুই এবং কর্মচারী সদস্য বাদে, সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ।

(২) ভারতীয় কোম্পানী আইন (company Act) অনুসারে ইহার নামের শেষে 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথাটি যুক্ত করিতে হয়।

(৩) শেষার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন বিবরণ পত্র (prospectus) প্রকাশ করিতে হয়না এবং তাহা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবার ও কোন প্রয়োজন নাই।

(৪) ইহার ক্ষেত্রে শেষার সহজে হস্তান্তরযোগ্য নয়।

(৫) এইরূপ কারবারে মূলধনের কোন নূনতম অংশ (minimum subscription) সংগৃহীত হওয়া পর্যন্ত অর্পণ না করিয়াই শেষার বন্টন (allotment of shares) করা যায়।

(৬) এইরূপ সরকার রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পরই কার্যারম্ভ করিতে পারে।

**সাধারণ বোঁধ মূলধনী কারবার :**

(১) ইহার করপক্ষে তিনজন পরিচালক বা ডিরেক্টর থাকিতে হইবে।

(৮) এইরূপ কারবারের ঠাহারী পরিচালক হইবেন, তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে হয় এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক এই মর্মে তাঁহাদের সম্মতি-পত্র লইতে হয়।

(২) এইরূপ কারবারে স্ট্যাটুটারী মিটিং করা আইনত বাধ্যতামূলক।

**পরিমিত মালিকানার বোঁধ মূলধনী কারবার :**

(১) ইহার নূনতম পরিচালক বা ডিরেক্টর সংখ্য দুই।

(৮) এইরূপ কারবারে পরিচালকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ও ক্রয় করিতে হয় না এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া সম্মতি পত্র দিবারও তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না।

(২) এই প্রকার কারবারে স্ট্যাটুটারী মিটিং করিবার প্রয়োজন নাই।

**অংশীদারী কারবার ও বোঁধ মূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য :**

(Distinction between partnership Business and Joint Stock Company) :

**অংশীদারী কারবার :**

(১) এইরূপ কারবারের জন্ত বিশেষ কোন আইনগত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয় না। সুতরাং ইহা গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

(২) আইনের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবারের নিজস্ব কোন সত্তা নাই। অর্থাৎ অংশীদারী কারবারের সত্তা অংশীদারগণের সত্তা-নিরপেক্ষ নয়। সুতরাং কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে, কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে বা দেউলিয়া হইলে অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটে। আবার

**বোঁধ মূলধনী কারবার :**

(১) এইরূপ কারবার গঠন করিতে নানা প্রকার আইনগত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং ইহা গঠনকরা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

(২) আইনগত ভাবে বোঁধ মূলধনী কারবারের নিজস্ব সত্তা স্বীকৃত। সুতরাং কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে, কোন সদস্য দেউলিয়া হইলে বা কোন সদস্য তাহার শেয়ার হস্তান্তর করিলে কারবারের অস্তিত্বের অবসান হয় না। আবার কারবারের নামে নিজস্ব শীলবোঁহর দ্রুত

**অংশীদারী কারবার :**

কারবারের নামে কোন দলিল-পত্রে স্বাক্ষর করা হইলে অথবা কারবারের নামে কোন বাবলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হইলে তাহা আইনত গ্রাহ্য হয় না।

(৩) অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই এবং সর্বাধিক সংখ্যা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বর্ত্তীত অস্ত্রান্ত ক্ষেত্রে কুড়ি, ব্যাঙ্ক কক্ষে বশ।

(৪) অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের দায় অপরিমিত বা সীমাহীন।

(৫) অংশীদারী কারবারে কারবার পরিচালনায় সকল অংশীদারেরই অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে একজন অংশীদারে কার্য কলাপের ফলে অস্ত্রান্ত অংশীদারগণও দায়বদ্ধ হয়।

(৬) অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে কারবারে কোন অংশীদারের অংশ হস্তান্তর করা যায় না।

(৭) অংশীদারী কারবারে

**যৌথ মূলধনী কারবার :**

দলিল পত্র আইনত গ্রহণ হয়। কারবারের নামে বাবলা মোকদ্দমা দায়ের করা যায়।

(৩) সাধারণ যৌথ মূলধনী— (public limited company) কারবারে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা সাত, সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবারে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা দুই এবং সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা, কর্মচারী সদস্য বাদে, পঞ্চাশ।

(৪) যৌথ মূলধনী কারবারে সদস্যগণের দায় তাহাদের নিজ নিজ শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যানুসারে সীমাবদ্ধ।

(৫) সকল সদস্য কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না; উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর উপর কারবার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। একজন সদস্যের কার্য-কলাপের ফলে অন্যান্য সদস্যগণ দায়বদ্ধ হয় না।

(৬) যৌথ মূলধনী কারবারে সদস্যগণের শেয়ার সহজে হস্তান্তরযোগ্য।

(৭) যৌথ মূলধনী কারবারে

## অংশীদারী কারবার :

অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য অংশীদারী চুক্তি পত্রের দ্বারা স্থির করা হয়। প্রয়োজন বোধে নিজেদের মধ্যে সম্মতিক্রমে সহজেই এই চুক্তি পত্রের রদবদল করা যায়।

## যৌথ মূলধনী কারবার :

অধিকার ইহার স্মারক লিপিতে (Memorandum of Association) বিধিবদ্ধ করা হয়। আর, এই স্মারকলিপি পরিবর্তন করিতে হইলে নানাপ্রকার আইনগত ব্যবস্থাদি করিতে হয় বলিয়া ইহার পরিবর্তন সাধন কষ্ট সাধ্য। অল্পরূপ ভাবে, পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্যও কারবারের পরিমেল নিয়মাবলীর (Articles of Association) দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় এইং এই পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন করাও খুব সহজ সাধ্য হয়। কেননা পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক প্রস্তাবের (Special Resolution) প্রয়োজন হয়।

(৮) অংশীদারী কারবারে মূলধনের পরিমাণ খুব অধিক না হইলেও প্রয়োজন বোধে অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে সহজেই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব।

(৮) যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক কিন্তু মূলধনের পরিমাণ কারবারের স্মারকলিপিতে নির্দিষ্ট করা থাকে বলিয়া ইহার ক্রম বৃদ্ধি করিতে হইলে নানারূপ জটিল আইনগত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয়। তাহা ইহা খুব সহজসাধ্য নয়।

(৯) বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবহার সুযোগ সুবিধা অংশীদারী কারবারে অপেক্ষাকৃত কম।

(৯) যৌথ মূলধনী কারবার বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবহারী সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারে।

(১০) পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে কারবারের

(১০) কারবারের স্মারক লিপিতে কারবারের উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তু

অংশীদারী কারবার :

নীতি ও কর্মশক্তি পরিবর্তন সাধন করা সহজসাধ্য।

যৌথ মূলধনী কারবার :

নিদিষ্ট থাকে বলিয়া সহজে ইহার পরিবর্তন সাধন করা যায় না। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে নীতির পরিবর্তন ও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি জটিল।

(১১) অংশীদারী কারবারের আর্থিক শক্তি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রয়োজনানুসারে কারবারের সম্প্রসারণ করা কষ্টসাধ্য।

(১১) যৌথ মূলধনী কারবারের আর্থিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি বলিয়া প্রয়োজনানুসারে কারবারের সম্প্রসারণ করা সহজ।

কোম্পানী আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ বা রেজিস্ট্রীকৃত হইলেই যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল বলা চলে। কিন্তু আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একজন বা একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগ প্রয়োজন। যে সকল ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এইরূপ কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে তাহাদিগকে বলা হয় প্রবর্তক (promoter)। একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিত ভাবে, অথবা কোন প্রতিষ্ঠানও এইরূপ প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। প্রবর্তকের কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহারাই দেশে মতন মতন শিল্প ও ব্যবসায়ের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া মতন কারবার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। ফলে, ইহারা সক্ষম নিয়োগে উৎসাহী বা আগ্রহশীল ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ কারবারে লাভজনক ভাবে বিনিয়োগের সুযোগ করিয়া দেয়। এইভাবে বিনিয়োগ উদ্যোগী অর্থ ও তাহার বিনিয়োগের সুযোগের মধ্যে সামঞ্জস্য

সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা রূপ প্রবর্তকের সাধারণতঃ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দক্ষ হয় বলিয়া কারবারের সাক্ষ্য সম্পর্কে একরূপ নিশ্চিত থাকে এবং তাহাদের ও কারবারে বিনিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহা ছাড়া প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব অনেকটা প্রবর্তক বহন করে বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ সাধ্য হয়।

কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করিলে প্রথমত এইরূপ কারবারকে আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করিতে হয়। আইনের নিষেধন



হইতে হুকুরিয়া কারবারের কার্যরত পৰ্বন্ত প্রবর্তককে পৰ্যায়ক্রমে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয়।

(১) কারবার নিবন্ধনের (Registration বা Incorporation) ব্যবস্থা করা;

(২) কারবারের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা;

(৩) কারবারের শেয়ার কট্টর করা;

(৪) কারবারের কার্যরতের ব্যবস্থা করা।

কারবার গঠনের জন্য সকল ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

**কারবারের নিবন্ধন:** পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যৌথ মূলধনী কারবার আইনের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং এইজন্য যৌথ মূলধনী কারবারের রিজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক।

সাধারণ যৌথমূলধনী কারবারের জন্য ন্যূনপক্ষে সাত জন এবং পরিমিত মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের জন্য ন্যূনপক্ষে ২ জন সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

যে এলাকার যৌথমূলধনী কারবার স্থাপিত হইবে সেই এলাকার ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধকের নিকট কারবার নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য নির্দিষ্ট কি সহ নিম্নলিখিত দলিলগুলি দাখিল করিতে হয়—

(১) কারবারের স্মারকলিপি (Memorandum of Association) : এই লিপিতে কারবারের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং আধিকা সম্পর্কিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে। এই লিপি মুদ্রিত আকারে দাখিল করিতে হয় এবং ইহা প্রবর্তকদের সহি-যুক্ত হইতে হইবে। ন্যূনপক্ষে একজন ১, চৌর সম্মুখে প্রবর্তকেরা এই লিপিতে স্বাক্ষর করিবে এবং সাক্ষীও ইহার সত্য্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নিজের নাম সহি করিবে। স্বাক্ষরকারীদের ন্যূনপক্ষে কারবারের একটি শেয়ার ক্রয় করিতে হয়।

(২) কারবারের পরিষদ নিয়মাবলী—(Article of Association) : ইহাতে কারবারের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়ম ও সর্তাদির উল্লেখ থাকে। এই নিয়মাবলী হয় কারবারের প্রবর্তকেরা রচনা করিবে, আর অন্তর্গত ভারতের কোম্পানী আইনে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। এই নিয়মাবলী সম্বলিত দলিল স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৩) পরিচালকদের নাম সংশ্লিষ্ট তালিকা: ইহাতে পরিচালকদের ঠিকানা ও পেমার উল্লেখ থাকে।

(৪) উল্লিখিত পরিচালকদের পরিচালক হিসাবে কাজ করিবার সম্মতি-যুক্ত পত্র।

(৫) কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা সংশ্লিষ্ট দলিল।

(৬) কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন বর্ধনক টাকার অধিক হইলে মূলধন বিলিয় নিয়ামকের (Controller of Capital Issue) নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুমতি পত্র।

(৭) কারবার পরিচালনার জন্ত যদি কোন 'ম্যানেজিং এজেন্ট' বা 'সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারারস' নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে তাহার চুক্তি-পত্র।

(৮) কারবারের নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয় সকল সর্ভাদি যথাযথ পালন করা হইয়াছে এই মর্মে প্রধান বিচারালয়ের কোন এডভোকেট (Advocate), এটর্নি (Attorney), বা কোন আইন ব্যবসায়ী অথবা কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, কোন ডিরেক্টর, কোম্পানীর ম্যানেজার অথবা সেক্রেটারী কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

উপর্যুক্ত দলিল সমূহ নিবন্ধকের নিকট দাখল করা হইলে তিনি ঐ সকল দলিল বিচার করিয়া দেখিবেন এবং নিজে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে কোম্পানীর নিবন্ধন পত্র (Certificate of Incorporation) প্রদান করিবেন। নিবন্ধনপত্র প্রদান করা হইলেই আইনত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইল এবং আইনের দৃষ্টিতে ইহার সিজন্স সম্ভা হইল।

কারবারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত জনসাধারণকে আহ্বান

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়া রেজিস্ট্রিকৃত হইবার পর পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার (Private Limited Company) কারবারের কার্য আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ যৌথ মূলধন কারবার রেজিস্ট্রিকৃত হইবার পরই কার্যারম্ভ করিতে পারে না। ইহাকে কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমতঃ জনসাধারণকে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া বিবরণ পত্র (Prospectus) প্রচার করিতে হয়। অথবা বিবরণ-পত্রের পরিবর্তে একটি বিবরণ বিবরণ (Statement in lieu of prospectus)

নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। প্রাইভেট কোম্পানীকে এইরূপ কোন বিবরণ পত্র প্রেরণ অথবা দাখিল করিতে হয় না।

### কারবারের শেয়ার বণ্টন :

বিবরণ পত্র প্রচার করার পর শেয়ার ক্রেতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বণ্টনের প্রণতি আসে। তবে শেয়ার বণ্টনের পূর্বে নূনতম মূলধন ( minimum subscription ) আদায় করা ইত্যাদি কয়েকটি সর্ত পালন করিতে হয়। এই সকল সর্তাদি যথাযথ পালন করার পূর্বে আবেদন কারীগণের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করা যায় না।

### কারবারের কার্যারম্ভ :

সাধারণ যৌথ মূলধনী কারবারের ( Public Limited Company ) কার্যারম্ভ করিতে হইলে কোম্পানীর নিবন্ধকের ( Registrar of Joint Stock Companies ) নিকট হইতে কার্যারম্ভের অমুমতি পত্র ( certificate of commencement ) সংগ্রহ করিতে হয়। অমুমতি পত্র পাইতে হইলে নিম্নলিখিত সর্তাদি পালন করা হইয়াছে এই সর্তে কোম্পানীর পরিচালক বা কর্মসচিব কর্তৃক একটি পরীক্ষিত ঘোষণাপত্র নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। যথা :—

(ক) বিবরণ-পত্রে অথবা ইহার পরিবর্তে যে বিবরণ দাখিল করা হইয়া থাকে, তাহাতে নির্দেশিত নূনতম টাঙ্গা ( Minimum Subscription ) ঠিকমত আদায় করা হইয়াছে ;

(খ) প্রত্যেক পরিচালক তাঁহার নিজের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়াছেন ;

উক্ত দলিল সমূহ পরীক্ষা করিয়া কোম্পানীর নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইলে কোম্পানীকে কার্যারম্ভের অমুমতি পত্র ( Certificate of Commencement ) দান করা হয়।

কোম্পানীকে নিবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া কার্যারম্ভ পূর্ণ উপরিত্ত ঙ্গারিটি পূরণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

### যৌথ মূলধনী কারবারের স্মারক লিপি ( Memorandum of Association ) :

যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি প্রস্তুত করিতে হয় তাহাকে কোম্পানীর স্মারক-লিপি বা মেমোরান্ডাম

অথ এসোশিয়েশন বলা হয়। স্মারক-লিপিতে নিম্নলিখিত ধারাগুলির উল্লেখ থাকিবে। বলা :—

(১) নাম : (Name Clause) :

কারবারের নাম ও নামের শেষে সাধারণ বোধ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে 'লিমিটেড' এই শব্দটি এবং পরিমিত মালিকানার বোধ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথাটি যুক্ত করিতে হইবে।

(২) ঠিকানা : (Situation Clause) :

কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং যে রাজ্যে তাহা অবস্থিত তাহার নামোল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উদ্দেশ্য : (Object Clause) :

কারবারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ কি জাতীয় শিল্পে বা ব্যবসায়ে কারবার আত্মনিয়োগ করিবে তাহার উল্লেখ থাকিবে। এই উদ্দেশ্য-ধারাটিকে খুব ব্যাপক করাই বিধেয়। কারণ, এই ধারাটির পরিবর্তনসাধন কষ্টসাধ্য। সেই জন্য এই ধারাটি ব্যাপক অর্থে ভবিষ্যতে কোন মতন শিল্পে—আত্ম-নিয়োগের সম্ভাবনা থাকিলে তাহারও উল্লেখ যদি থাকে তাহা হইলে এই ধারাটির কোন পরিবর্তন করিতে হয় না।

(৪) দায় : (Liability Clause) :

কোম্পানীর সদস্যগণের দায় তাহাদের শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ কি না, (limited by Shares) অথবা তাহা তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিমিত limited by Guarantee ) কি না কিংবা তাহা অসীম (Unlimited) কন তাহার স্থলটি উল্লেখ থাকিবে।

(৫) মূল ম : (Capital Clause) :

কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ কত এবং তাহা কত সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত করা হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

(৬) সমিতি : (Association Clause) :

স্মারক-লিপির শেষ অংশে সমিতি-জ্ঞাপক একটি ধারা যুক্ত করিতে হয়। ইহাতে মা-ঠিকানা লিখিয়া যুক্ত করিয়া সদস্যগণ এই ঘোষণা করে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিয়া স্মারকলিপিতে নির্দেশিত কোম্পানী গঠনে তাহাদের সম্মতি আছে।

এই স্মারকলিপি মুদ্রিত আকারে কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট দাখিল

করিতে হয় এবং স্বাক্ষরকারী সদস্যগণকে অন্ততপক্ষে একজন সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিতে হয়।

**কারবারের পরিষেল নিয়মাবলী : (Articles of Association) :**

‘পরিষেল নিয়মাবলী’ কারবারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহাতে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ পরিচালনার বিধি-ব্যবহার উল্লেখ থাকে। পরিচালক-মণ্ডলীর গঠন, ইহার ক্ষমতা এবং কর্তব্য, কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, কোম্পানীর সভা আবস্থান ও পরিচালনা, হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মকানুন ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কোম্পানীর ‘স্মারক লিপির’ (Memorandum) বৃত্ত পরিষেল নিয়মাবলীও কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয় এবং স্মারক লিপিতে যাহারা স্বাক্ষর করে, পরিষেল নিয়মাবলীতে ও তাহাদের স্বাক্ষর করিতে হয়। স্মারকলিপিতে যে বিষয়-বস্তুর উল্লেখ থাকে তাহার বর্হীকৃত কোন বিষয় পরিষেল নিয়মাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না।

শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধ যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে পরিষেল নিয়মাবলী রচনা না করিলেও চলে। সেইরূপ অবস্থায় কোম্পানী আইনের ‘টেব্লে-এ’ তে বর্ণিত আর্টিকেলস্ প্রযোজ্য হয়। অবশ্য অপরিমিত দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Unlimited Company) পরিমিত মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার (Private limited Company) ও সদস্যগণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (Company limited by guarantee) ক্ষেত্রে পরিষেল নিয়মাবলী স্বতন্ত্র ভাবে প্রণয়ন করা বাধ্যতামূলক।

পরিষেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কোম্পানীর আইন অনুসারে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক প্রস্তাব দ্বারা ইহার পরিবর্তন সাধন করা যায়। ইহার পরিবর্তনে যদি আইনানুগ হইত তাহা হইলে এই পরিবর্তনের জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ বা অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

পরিষেল নিয়মাবলীতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকে—

(১) বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে মূলধনের বিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার-স্বত্বাধারীদের অধিকার ;

(২) মূলধনের পরিমাণ ও তাহা পরিবর্তনের প্রণালী ;

(৩) শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য কিম্বিতে পরিশোধনীয় হইলে, অর্থদেয়

( application ), বন্টন ( allotment ) এবং তলবের ( Calls ) সময় দেয় কিস্তির পরিমাণ ;

(৪) কোন শেয়ারক্রেন্ডা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে তাহা হইলে তাহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিবার নিয়ম এবং বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বার বিলি করার প্রণালী ;

(৫) শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম এবং ইহার জন্য কোন ফি দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহার পরিমাণ ;

(৬) শেয়ারের মূল্য তলব করিবার পদ্ধতি এবং তাহা পরিশোধ করিবার উপায় ;

(৭) কোম্পানীর ঋণ-গ্রহণের ক্ষমতা ;

(৮) পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা ; তাহাদের যোগ্যতাসূচক শেয়ারের পরিমাণ ;

(৯) পরিচালকগণের ক্ষমতা, তাহাদের সংখ্যা এবং পারিশ্রমিক ;

(১০) ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী নিয়োগের বিধি-ব্যবস্থা ;

(১১) কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting) ও অতিরিক্ত সাধারণ সভা (extra-ordinary General Meeting) আহ্বান ও পরিচালনার উপায় ;

(১২) পরিচালক সমিতির (Board of Directors) সভা আহ্বান এবং উক্ত সভার কার্যাবলীর পরিচালনার নিয়ম ;

(১৩) সভ্যদের ভোট গ্রহণের পদ্ধতি ও তাহাদের ভোটাধিকার ;

(১৪) কোম্পানীর সীলমোহর (Seal) সংরক্ষণের ব্যবস্থা ;

(১৫) কোম্পানীর হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ;

(১৬) কোম্পানীর লভ্যাংশ ঘোষণার নিয়ম এবং লভ্যাংশের কিছু অংশকে সঞ্চয়-তহবিলে জমা করিবার পদ্ধতি ;

(১৭) কোম্পানীর বিলোপ সাধন বা অবসান (Winding up) ঘটাইবার পদ্ধতি ।

**স্মারকলিপি ও পরিষেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য : (Distinction between Memorandum of Association and Articles of Association)**

**স্মারকলিপি :**

**পরিষেল নিয়মাবলী :**

(১) স্মারকলিপি প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর সনদ (Charter) বলিয়া কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ পরিচালনার

**স্মারকলিপি :**

ণ্য করা হয়। ইহাতে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ থাকে। ইহার দ্বারা কোম্পানীর সঙ্গে কোম্পানীর বহির্ভূত পক্ষের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহা নির্দেশিত হয়।

(২) কোম্পানীর স্মারকলিপি বস্তুতঃ কোম্পানীর সহিত কোম্পানীর বহির্ভূত কোন পক্ষের সম্পর্ক নির্দেশ করে।

(৩) স্মারকলিপির রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক।

(৪) স্মারক-লিপির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সহজসাধ্য নয়। কারণ, ইহার বিভিন্ন ধারা পরিবর্তনের জন্য আদালতের অনুমোদন-সাপেক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক প্রস্তাব পাশ করিতে হয়।

(৫) স্মারক-লিপি কোম্পানীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারবারের কোন কার্যকলাপ ইহার বিধি বহির্ভূত হইতে পারে না।

**পরিমেল নিয়মাবলী :**

পায় ও পদ্ধতির উল্লেখ থাকে। স্মারক লিপিতে উল্লিখিত বিষয়ের বহির্ভূত কোন বিষয় পরিমেল-নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

(২) পরিমেল নিয়মাবলীতে কোম্পানীর সহিত কোম্পানীর দস্তাদের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়।

৩) পরিমেল নিয়মাবলীর করণ বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, কোম্পানীর কোন স্বতন্ত্র পরিমেল-নিয়মাবলী রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে কোম্পানী-আইনের ‘টেবল-এ’ তে নির্দেশিত কোন একটি পরিমেল-নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ, ইহার কেবল বিশেষ উদ্দেশ্য মূল প্রস্তাব পাশের প্রয়োজন হয়। আদালতের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

(৫) পরিমেল নিয়মাবলীতে এমন কোন ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিতে পারে না বাহা স্মারক লিপির বিধি বহির্ভূত। সুতরাং ইহা স্মারক-লিপির অধীনস্থ দলিল।

**বিবরণ পত্র ( Prospectus ) :**

কোম্পানী নিবন্ধনের পর মূলধনের সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর পক্ষের

ও ঋণপত্র প্রকাশ ও প্রচার করা হয় তাহাকে কোম্পানীর বিবরণ-পত্র বা প্রসপেক্টাস বলে। বিবরণ-পত্রে কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তুর বিস্তারিত উল্লেখ ও বর্ণনা থাকে।

ভারতীয় কোম্পানী আইনে প্রসপেক্টাসের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে—“any prospectus, notice, circular, advertisement or ther document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or dabentures of a body Corporate.”

বিবরণ-পত্র মুদ্রিত আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। তবে জনসাধারণের মধ্যে ইহা বিতরণ করিবার পূর্বে অবশ্যই কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং নিবন্ধক ইহার পরিবর্তন বা সংশোধনের কোন নির্দেশ না দিলেই তাহা প্রচার করা যায়।

নিবন্ধন পত্রে কোম্পানীর পরিচালকগণ অথবা অন্য কোন উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিবে এবং যে তারিখে ইহা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা হয় সেই তারিখের উল্লেখ থাকিবে। এই তারিখ উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিবন্ধকের নিকট বিবরণ-পত্র দাখিল করিবাব পর ২০ দিনের মধ্যে ইহা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে হয়। বিবরণ-পত্রে কারবাব সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সত্য গোপন করা হইলে স্বাক্ষরকারীগণ দায়ী হয় এবং ইহা আইনত দণ্ডনীয়।

কোন হুতন কারবাবের পক্ষে বিবরণ-পত্র প্রচার করা বাধ্যতামূলক নহে। বিবরণ-পত্র প্রচার করা না হইলে এই মর্মে একটি বিবৃতি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করি ি হয় এবং তখন ঐ কারবাবের ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানী-আইনের ৫ সঙ্গিক বিধি-সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

প্রত্যে বিবরণ-পত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে বিবরণ-পত্রের প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

**বিবরণ-পত্র প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্য :**

বিবরণ-পত্র প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :—

(১) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া কারবাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের মনে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা হয় ;

(২) ইহার দ্বারা কারবাবের সাফল্য সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের



সাধারণকে তাহাদের সঞ্চয় কারবারে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়া তোলা হয় ;

(৩) যে সকল সর্তাদির উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণ কারবারে তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করে, বিবরণ-পত্র সেই সকল সর্তাদির প্রমাণ দলিল বলিয়া গণ্য হয় ;

(৪) বিবরণ পত্রে প্রস্তাবিত কারবারের যে সকল বিষয় বস্তুর উল্লেখ তাহার জন্ত সাক্ষরকারী-গণকে দায়ী করা যায়। ভবিষ্যতে কখনও যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে বিবরণ-পত্র কারবারের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা করিয়া হয় নাই, অথবা বিকৃত তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া আসল সত্য গোপন করিয়াছে, তাহা হইলে পরিচালকগণ আইনত দণ্ডনীয় হয়। সুতরাং সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত্ত বোধ করিতে পারে

**বিবরণ-পত্রের বিষয় বস্তু :**

বিবরণ পত্রে বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

(১) স্মারক-লিপিতে বর্ণিত বিষয়গুলি ;

(২) কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারের সংখ্যা ও তাহার শ্রেণিবিভাগ ;

(৩) ক্রেতাকে শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের কত অংশ করিয়া আবেদন (application) বন্টন (allotment) এবং তলবের (Calls) সময় দিতে হইবে তাহার নির্দেশ ;

(৪) যে ন্যূনতম টাকা (minimum subscription) আদায় করিতে পারিলে কোম্পানী শেয়ার বন্টন করিবার অধিকারী হয় সেই ন্যূনতম টাকা পরিমাণ ;

(৫) কোম্পানী গঠনের প্রাথমিক ব্যয়ের (Preliminary expense) পরিমাণ ;

(৬) পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা ;

(৭) পরিচালকগণের যোগ্যতা সূচক শেয়ারের (qualifying shares) পরিমাণ ও তাহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ ;

(৮) কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা 'সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স' এর নাম, ঠিকানা ও তাহাদের পারিশ্রমিক তাহাদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন চুক্তি হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ;

(৯) কোম্পানী প্রবর্তকদের (Promoters) তাহাদের কার্যের অন্ত কোন অর্থ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে দেয় অর্থের পরিমাণ ও তাহা কিভাবে দেওয়া হইবে তাহার বিবরণ ;

(১০) কোম্পানী গঠনের সময় কোন সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, ক্রয়-মূল্যের পরিমাণ ও তাহা পরিশোধের উপায় ;

(১১) যদি কেহ কোম্পানীর শেয়ার অথবা ঋণ-পত্র বিক্রয় করিবার দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণকারীকে কি পরিমাণ বাট্টা বা কমিশন দেওয়া হইবে ;

(১২) কোম্পানীর শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারগণের ভোটাধিকার ;

(১৩) কোম্পানীর সহিত অন্ত কোন পক্ষের চুক্তি হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ও তাহা পরিদর্শনের স্থান ও সময় ;

(১৪) কোম্পানীর হিসাব-পরীক্ষকগণের নাম ও ঠিকানা ;

(১৫) কোম্পানী-প্রবর্তনে যদি কোন পরিচালকের বিশেষ কোন স্বার্থ থাকে তাহার উল্লেখ ;

(১৬) কোম্পানী শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে মুনাফার কত অংশ বিলি করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে ও তাহার পরিমাণ কি হইতে পারে ।

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কোম্পানীর উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে বাহাতে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণকে তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর বিবরণ পত্রে উপযুক্ত প্রধান বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকে ।

### ম্যূনত চাঁদা (Minimum Subscription) :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ন্যূনতম চাঁদা সংগৃহীত না হইলে কোম্পানী শেয়ার বণ্টন করিতে পারে না । ন্যূনতম চাঁদা শেয়ার বিলির (Issue) দ্বারা সংগৃহীত করা হইয়া থাকে । ইহার পরিমাণ কি হইবে তাহা নির্ভর করে কি উদ্দেশ্যে ইহা করিতে হইবে তাহার উপর । তবে ইহার পরিমাণ কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে ও বিবরণ-পত্রে উল্লেখ করা হয় । নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ন্যূনতম চাঁদা সাধারণত ব্যয় করা হইয়া থাকে :—

(১) কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয় (Preliminary expenses) ও সংগঠন-ব্যয় (Formation expenses) ;

(২) কোম্পানী-কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকিলে তাহার মূল্য-পরিশোধ ;

(৩) কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়, সংগঠন ব্যয়, জীত সম্পত্তির মূল্য যদি ঋণ করিয়া মিটান হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ঋণ-পরিশোধ ;

(৪) যদি কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয়ের জন্ত দালাল (agent) অথবা দায়িত্বগ্রাহক (Under writer) নিযুক্ত করা হইয়া থাকে তাহাদিগকে দেয় কমিশন ;

(৫) কোম্পানীর কার্যকরী মূলধন ;

(৬) অন্তান্ত কোন বিষয়ে ব্যয় করা প্রয়োজনীয় হইলে তাহা।

উপযুক্ত বিভিন্ন ব্যয়-নিবাহের জন্ত যে নূনতম অর্থ শেয়ার মিলির দ্বারা সংগ্রহ করা হয় তাহাকে নূনতম টান্ডা বলা হয়।

**দায় গ্রহণ (Under writing) :**

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোন কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার অথবা ইহার অংশবিশেষ বিক্রয় করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহাকে কোম্পানীর দায়-গ্রাহক (Under writer) এবং তাহার কার্যকে দায়-গ্রহণ (Under-writing) বলা হয়। এইরূপ দায়-গ্রাহক তাহার প্রতিশ্রুত শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইলে অবিক্রীত শেয়ার সে নিজেই ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণের পরিবর্তে সে কোম্পানীর নিকট হইতে কমিশন আদায় করে এবং এই কমিশনের পরিমাণ কি হইবে কোম্পানীর পরিষদ-নিয়মাবলীতে ও বিবরণ পত্রে তাহা উল্লেখ থাকে।

**দায়-গ্রাহক (Under writer) :** কোম্পানীর প্রবর্তক এবং অর্থ বিনিয়োগকারী জনসাধারণ, উভয়কেই নানাভাবে সাহায্য করে। দায়-গ্রাহকের অবস্থিতির জন্তই কোম্পানী প্রবর্তকের অর্থচিন্তা অনেকটা কমিয়া যায় ; কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়-ব্যাপারেও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি ত পারে। কোম্পানীর মূলধনের কি পরিমাণ বিলি (Issue) করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়াও দায়-গ্রাহক কোম্পানী প্রবর্তককে সাহায্য করিতে পারে। আবার দায়-গ্রাহক অনেক সময় শেয়ার বিক্রয় করিবার পূর্বেই কোম্পানীর প্রবর্তককে অর্থ দিয়া সাহায্য করে।

দায় গ্রাহক (Under writer) সঞ্চয়-বিনিয়োগে ইচ্ছুক ব্যক্তিকেও নানাভাবে সাহায্য করিতে পারে। বেশের সামগ্রিক ব্যবসায়িক অবস্থা সম্পর্কে ইচ্ছুক ব্যক্তি বলিয়া কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাক্ষ্যেয় সমর্থনও

আছে এই সম্পর্কে তাহার ধারণাও অনেকটা স্থম্পষ্ট থাকে। সুতরাং যে সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে সে নিশ্চিত কেবল মাত্র সেই প্রকার প্রতিষ্ঠানের শেষার বা ঋণ-পত্র বিক্রয়ের দায়িত্বই সে গ্রহণ করে। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এইরূপ দায়-গ্রাহকের নাম যুক্ত থাকে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের শেষার ক্রয় করিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীও উৎসাহিত বাধ্য করে।

(যৌথ-মূলধনী কারবারের মূলধন (Capital of Joint Stock Company) :

যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধনকে প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : (১) স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)—যতদিন কারবারের অস্তিত্ব বজায় থাকে ততদিন স্থায়ী মূলধনও কারবারে নিয়োজিত থাকে। কারবার প্রতিষ্ঠার জম্ম জমি, বাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা স্থায়ী মূলধনের পর্দায়ে পড়ে। এইরূপ মূলধন কারবারের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তুলিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং ইহা স্থায়ীভাবে কারবারে নিযুক্ত থাকে।

(২) কার্যকরী মূলধন (Working Capital) :

কারবারের চলতি ব্যয়, যথা : কঁচামাল ক্রয়, মজুরি, বিক্রয় ব্যয় ইত্যাদি নির্বাহ করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহা কার্যকরী মূলধনের পর্দায়ে পড়ে। পণ্য বিক্রয় করিয়া এইরূপ মূলধন ফেরৎ পাওয়া যায় এবং তাহা পুনরায় কারবারে নিয়োজিত করা যায়। এইরূপ মূলধন তাই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়। এই কারণে কার্যকরী মূলধনকে আবার আবর্তিত মূলধন (Circulating Capital)ও বলা হয়।

কারবারের উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর মূলধনই সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে :—

শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা : কারবারের অহরহোদিত মূলধনকে ক্রম ক্রম নির্ধারিত মূল্যের শেষারে বিভক্ত করা হয়। এই সকল শেষার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এইরূপ শেষার বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করাই যৌথ-মূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহের প্রধানতম উপায়। শেষারের নির্ধারিত মূল্য কম হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বর্ধিত ব্যক্তিগত কোম্পানীর শেষার ক্রয়ের সুযোগ পায়। সুতরাং বহুসংখ্যক ব্যক্তি এইরূপ

শেয়ার ক্রয় করিতে পারে বলিয়া কারবারের মূলধনের পরিমাণও বেশি হইতে পারে। পূর্বে-উল্লেখ করা হইয়াছে যে শেয়ার-ক্রেতা গণই কোম্পানীর মালিক বলিয়া গণ্য হয়।

### ঋণ-পত্র বা ডিবেঞ্চর বিক্রয়ের দ্বারা :

কোম্পানীর ঋণ-পত্র বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ক্রেতাগণের মত কোম্পানীর ঋণপত্র-ক্রেতারা কোম্পানীর মালিক বলিয়া গণ্য হয় না। তাহারা যেমন কোম্পানীর পরিচালন-কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে না, সেইরূপ কোম্পানীর মুনাফা-ভোগেরও তাহাদের কোন অধিকার নাই। তাহারা কেবল তাহাদের প্রদত্ত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়।

### ঋণ সংগ্রহের দ্বারা :

জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া ও কারবারের মূলধনের সংস্থান করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে কারবারের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

### ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণ-দানকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ সংগ্রহের দ্বারা :

ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়াও কখন কখন মূলধনের সংস্থান করা হইয়া থাকে। তবে এই ধরনের ঋণ সাধারণতঃ অধিক দিন আটক রাখা যায় না বলিয়া স্থায়ী মূলধন সংগঠনে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক-ঋণের গুরুত্ব খুব বেশি নহে। অধিকন্তু এই প্রকার ঋণের পরিমাণও খুব অধিক হয় না। কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে যৌথ-মূলধনী কারবারের মূলধনকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

### (১) অনুমোদিত বা রেজিস্ট্রিকৃত মূলধন (A thorised or Registered Capital) :

স্মারক-লিপিতে (Memorandum of Association) বর্ণিত যে পরিমাণ মূলধন জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা সংগ্রহ করিবার \* অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানী রেজিস্ট্রিকৃত হয় সেই মূলধনকে অনুমোদিত বা রেজিস্ট্রিকৃত মূলধন বলা হয়।

### (২) বিলিকৃত মূলধন (Issued Capital) :

অনুমোদিত মূলধন যত মূল্যের বহু সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্ত শেয়ারই জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থে

উপস্থিত করা হয়। যত সংখ্যক শেয়ার বিক্রয়ার্থে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহাকে বিলিকৃত মূলধন বলা হয়।

(৩) বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন : (Subscribed Capital) :

বিলিকৃত মূলধন অর্থাৎ শেয়ারের যে অংশ বিক্রয় করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহার মধ্যে যে অংশ ক্রেতার দ্বারা জনসাধারণ আবেদন করে তাহাকে বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন বলা হয়।

(৪) তলবী-মূলধন (Called-up Capital) :

সাধারণত শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের সমস্ত টাকা একই সঙ্গে ক্রেতাকে দিতে হয় না। কোম্পানী শেয়ারের টাকা সাধারণত কয়েকটি কিস্তিতে (instalments) আদায় করে। শেয়ারের মূল্যের যে অংশ ক্রেতাদের প্রদান করিবার জন্য কোম্পানী আহ্বান জানায় তাহাকে তলবী-মূলধন (Called-up Capital) বলা হয়।

বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন হইতে তলবী-মূলধন বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাকে অ-তলব মূলধন (un-called capital) বলা হয়।

(৫) আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) :

তলবী-মূলধনের যে অংশ প্রকৃতপক্ষে আদায় করা হয় তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলা হয়।

(৬) সংরক্ষিত-মূলধন (Reserve Capital) :

কোম্পানীর মূলধনের যে অংশ সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ যে অংশ কোম্পানী বিশেষাধিকার অথবা অবসানের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে আদায় করার জন্য কোম্পানী আহ্বান (calls) জানাইতে পারে না তাহাকে সংরক্ষিত মূলধন বলা হয়। কোম্পানীর আর্থিক সক্ষমতিকে হ্রাস করার জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়।

অদায়ী তলবী-মূলধন (calls in Arrear) ও অগ্রিম তলবী মূলধন (Call in Advance) :

তলবী মূলধনের যে অংশ আদায় করা যায় নাই অর্থাৎ যে অংশ শেয়ার ক্রেতাপ্রতি পরিশোধ করে নাই তাহাকে অদায়ী তলবী মূলধন বলা হয়।

যদি কোন শেয়ারের ক্রেতা শেয়ার মূল্য বাবদ অর্থ কোম্পানী তলব করিবার পূর্বেই পরিশোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে এই প্রকার তলবের পূর্বে প্রাপ্ত অর্থকে অগ্রিম তলবী মূলধন বলা হয়।

## বৌধ-মূলধনী কারবারের শেয়ার ও তাহার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ (Different Kinds of Shares of Joint Stock Company) :

কোম্পানীর শেয়ারের যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় তাহা নিম্নরূপ :

### (১) প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Shares) :

লভ্যাংশ বন্টনের ব্যাপারে অথবা কোম্পানীর অবসান হইলে মূলধন ফেরৎ পাইবার ব্যাপারে এই জাতীয় শেয়ারের ক্রেতাগণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে কোম্পানীর মুনাফা হইলে অন্তান্ত শ্রেণীর-ক্রেতাগণকে মুনাফার অংশ প্রদান করিবার পূর্বে নির্দিষ্ট হারে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়। অর্থাৎ শেয়ার ক্রেতাগণের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণ অগ্রাধিকার পায়।

কোম্পানীর অবসান হইলে ঋণদাতাগণের (Creditors) প্রাপ্য পবিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে প্রথমে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে তাহাদের মূলধন ফেরৎ দিতে হয়।

প্রেফারেন্স শেয়ারকেও আবার গুণানুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(ক) কুমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার (Cumulative Preference Shares) : এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিতে হয়। যদি কোম্পানী কোন বৎসর মুনাফা অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর দেয় লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকে। ভবিষ্যতে কোন বৎসর কোম্পানীর মুনাফা হইলে তাহা হইতে পূর্বে এই শ্রেণীর শেয়ারের সমস্ত বকেয়া প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হয়। তাহার পরও কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তবে অন্তান্ত শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(খ) নন-কুমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার (Non Cumulative Preference Shares)

এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর চলতি-বৎসরের মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। কোন বৎসর কোম্পানীর মুনাফা না হইলে এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর দেয় লভ্যাংশ সঞ্চিত হয় না এবং ভবিষ্যতে কোন বৎসর কোম্পানীর মুনাফা হইলে ইহাদের বকেয়া প্রাপ্য মিটাইবারও কোন প্রয়োজন হয় না।

**(গ) পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স শেয়ার (Participating Preference Shares) :**

এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ-যে শুধু নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় তাহা নয়, উপরন্তু তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া যে অবশিষ্ট লভ্যাংশ অন্তান্ত্র শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় তাহার উপরও ইহারা ভাগ পাইবার অধিকারী।

যে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর এই বিশেষ সুবিধা আরোপ করা হয় না তাহাকে নন-পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স শেয়ার (Non Participating Preference Shares) বলা হয়।

**(ঘ) রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (Redeemable Preference Shares) :**

কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে (Articles of Association) ব্যবস্থা থাকিলে কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তে এই শ্রেণীর শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া যায়। অবশ্য মূল্য ফেরত দিবার পূর্বে দেখিতে হইবে এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর প্রাপ্য সমস্ত টাকা ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছে কিনা। ভারতে কি কি সর্তে এই শ্রেণীর শেয়ার বিক্রয় করা যায় তাহা ভারতের কোম্পানী আইনের ২০৫ ধারার 'বি' উপধারাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

যে সকল প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য উপযুক্তভাবে ফেরত দেওয়া হয় না তাহাকে নন-রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার ( Non-Redeemable Preference Shares ) বলা হয়।

**(২) অর্ডিনারি শেয়ার বা ইকুইটি শেয়ার ( Ordinary Shares or Equity Shares ) :**

এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর পরিচালকগণ কর্তৃক ঘোষিত হারে লভ্যাংশ পায়। তবে প্রথমে লভ্যাংশ হইতে নির্দিষ্ট হারে প্রেফারেন্স-শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে মুনাফা বন্টন করিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলেই তাহা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার গণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। কোম্পানীর অবসান ঘটিলে মূলধন ফেরত দিবার ক্ষেত্রেও প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণের পর অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডারগণের দাবী মিটান হইয়া থাকে। অর্ডিনারি শেয়ারের বে লভ্যাংশ বন্টন করা হয় তাহার হার নির্দিষ্ট নয় ; কোম্পানীর



মুনাফার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোম্পানীর মুনাফা না হইলে বা সামান্য হইলে ইহারা কোনও লভ্যাংশই পায় না বা লভ্যাংশের অল্প দাবি করিবার অধিকার তাহাদের নাই।

প্রেক্ষাবেশ শেয়ার হোল্ডারগণের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ, কিন্তু অভিনারি শেয়ার হোল্ডারগণের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ নয়।

### ডেফারড্ শেয়ার (Deferred Share) :

কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রেক্ষাবেশ ও অভিনারি শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টন করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ডেফারড্ শেয়ার। হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। কোম্পানীর বিলোপ সাধন ঘটিলেও প্রথমে প্রেক্ষাবেশ ও অভিনারি শেয়ার হোল্ডারগণের পরে ইহাদের দাবি মিটান হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাকে অনেক সময় বিলম্বিত শেয়ার (Deferred Share) বলা হয়।

ডেফারড্ শেয়ার সাধারণত কোম্পানী-প্রবর্তকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহা প্রায় বাজারে বিক্রয় করা হয় না। এইজন্য অনেক সময় ইহাকে সংস্থাপকের শেয়ার (founders' Share) ও বলা হয়। এই জাতীয় শেয়ারের মূল্য অতি স্তায্য। এই শ্রেণীর শেয়ারের বিলি-ব্যবস্থা ও ইহার উপর লভ্যাংশ বিতরণ করিবার ব্যবস্থাদি কোম্পানীর স্মারক-লিপি ও পরিমেল-নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। কোম্পানী সংস্থাপক বা উদ্ভোক্তাদের কোম্পানীর সংস্থাপন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উপর অধিকার দান করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ শেয়ার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনে দুই শ্রেণীর শেয়ারকে স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—প্রেক্ষাবেশ শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ার।

### বোনাস শেয়ার (Bonus Share) :

উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর শেয়ার ব্যতীত পুরাতন শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে কখন কখন আর এক শ্রেণীর শেয়ার বিতরণ করা হয়। ইহাকে বোনাস শেয়ার বলা হয়। ইহার জন্য কোন নগদ মূল্য দিতে হয় না। কোম্পানীর লভ্যের কিছু অংশকে মূলধনে পরিণত করা হয় এবং তাহাকে কয়েকটি পূর্ণমূল্যের শেয়ারে বিভক্ত করিয়া পুরাতন শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উদ্যোগিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বোনাস শেয়ার প্রচলিত হইতে হয়।

### কোম্পানীর স্টক (Stock) :

কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হইলে তাহাকে 'স্টক' (stock) বলা হয়। কোন টাকার অঙ্কের গুণিতকে স্টকের লেনদেন হইয়া থাকে। যেমন, ২,০০০,০০০ লক্ষ টাকার মূলধন আদায় করা হইলে উহাকে ৫,১০,২০ টাকা প্রভৃতি স্টকে বিভক্ত করা যায়। শেয়ারের মূল সম্পূর্ণ আদায় করা হইলে শেয়ারকে ও স্টকে রূপান্তরিত করা যায়। তবে এই ক্ষুদ্র কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে স্থপষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যেমন, কতগুলি পূর্বমূল্য-আদায়কৃত শেয়ার লইয়া যদি একটি ১০০ টাকার স্টক হয়, তাহা হইলে ঐ স্টককে ভাঙ্গিয়া ৫, ১০, ২০, ২৫, ৫০ টাকার যেকোন মূল্যের সমান সংখ্যক কয়েকটি শেয়ার পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ঐ স্টক ভাঙ্গিয়া যতখানি শেয়ার পাওয়া যাইবে তাহার প্রতিটি ১০০ এর গুণিতক হইবে। ইহা হইতে আরও বুঝা গেল যে একটি 'স্টক'কে ভাঙ্গিয়া কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু কোন শেয়ারকে অল্পরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। কেননা শেয়ার এক একটি অবিভাজ্য একক (Indivisible unit) বলিয়া গণ্য হয়।

### শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Share and Stock) :

- | শেয়ার  | স্টক  |
|---|---|
| (১) শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিক আদায় করা যায়।  | (১) স্টকের মূল্য সম্পূর্ণ আদায় করিতে হয়।                        |
| (২) শেয়ারের বিভাজন সম্ভব নয়। ইহা অবিভাজ্য বলিয়া অভ্যর্থনা এবং ইহা ভাঙ্গাংশে হস্তান্তর করা যায়। অংশে হস্তান্তরযোগ্য। | (২) 'স্টক' এর বিভাজন সম্ভব নয়। ইহা ভাঙ্গাংশে হস্তান্তর করা যায়। |
| (৩) প্রত্যেক শেয়ারের নির্দিষ্ট নম্বর থাকে।   | (৩) 'স্টক' এর কোন নির্দিষ্ট নম্বর থাকে না।                        |
| (৪) শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট।   | (৪) 'স্টক' এর মূল্য নির্দিষ্ট নয়।                                |

### কোম্পানীর মাল-পত্র বা ডিবেঞ্চার (Debenture of a Company) :

কারবার চালাইবার পক্ষে কোম্পানীর মূলধন অপূর্ণ হইলে কোম্পানী মাল-পত্র বিলি (Issue) করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে মাল

কোম্পানীর নামাঙ্কিত সিল মোহর (Seal) দ্বারা করিতে হয়। এই সিলের উপস্থিতি ছাড়াও, ঋণের উপর দেয় হুদ, ঋণ পরিশোধের সময়, কোম্পানী কোন সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণ-সংগ্রহ করা হইয়া থাকিলে তাহার বিধি ও উল্লেখ থাকে।

কোম্পানীর ঋণ-পত্রকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।—

### (১) সাধারণ ঋণ-পত্র (Simple or Naked Debenture):

এই শ্রেণীর ঋণ-পত্রে কোম্পানী ঋণের হুদ দিবার এবং ঋণ-পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি মাত্র দেয়। এইরূপ ঋণ-পত্র বিলি করিয়া যে ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাহার জন্য কোম্পানীর কোন সম্পদ বন্ধক রাখা হয় না।

### বন্ধকী ঋণ-পত্র (Mortgage Debenture):

কোম্পানীর কোন সম্পদ (assets) বন্ধক রাখিয়া যে ঋণ-পত্র বিলি করা হয় তাহাকে বন্ধকী ঋণ-পত্র বলা হয়। এইরূপ ঋণ-পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রয়োজন হইলে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও ঋণ-পত্রে-স্বীকৃত ঋণের উপর হুদের টাকা পরিশোধ করিতে হয়।

বন্ধকী ঋণ-পত্র ক্রেতাগণ এই কারণে তাহাদের আসল ও হুদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

কোম্পানীর যে সকল সম্পদ বন্ধক রাখা হয়, সেই সকল সম্পদের উপর বন্ধকী-ঋণ-পত্র ক্রেতাগণের দাবি দুই প্রকার হইতে পারে। যথা :—

**স্থির দাবি (fixed charge):** এইরূপ ক্ষেত্রে যে সকল সম্পদ বন্ধক রাখা হয় তাহা ঋণ-পত্র ক্রেতাগণের বিনামুহুরতিতেই লেন-দেন করা যায় না।

**অস্থির দাবি (floating charge):** এইরূপ ক্ষেত্রে যতক্ষণ ঋণের হুদ নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয় অথবা আসল পরিশোধেও কোন অনিয়ম হয় না ততক্ষণ বন্ধকী সম্পদ ঋণ-পত্র ক্রেতাগণের বিনামুহুরতিতেই লেন-দেন করা যায়।

### (৩) পরিশোধ ঋণ-পত্র (Redeemable Debenture):

কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তে বা কোন নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ-পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে ঋণ-পত্র বিলি করা হয় তাহাকে পরিশোধ্য ঋণ-পত্র বলা

(৪) **অ-রেজিস্ট্রিকৃত ঋণ-পত্র (Un-registered Debenture) :**

কম্পানীয়ার ঋণ-পত্র বিলি করিয়া যে ঋণ-সংগ্রহ করা হয় তাহা কম্পানীর চাকালগেই পরিচালিত করিতে হয় না। কেবল যখন কারবারের অবদান হয় অথবা যখন প্রদানে ছেদ পড়িলে এই ঋণ-পত্র-পরিচালিত করিবার প্রায় আসে।

(৫) **রেজিস্ট্রিকৃত ঋণ-পত্র (Registered Debenture) :**

এই প্রকার ঋণ-পত্রে-ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে এবং কোম্পানী ঋণ-পত্র-ক্রেতার নাম ঠিকানা মন্বলিত তালিকা রক্ষা করে। কোম্পানীর তালিকায় যতক্ষণ ক্রেতার নাম ইত্যাদির পরিবর্তন করা না হয় ততক্ষণ এই জাতীয় ঋণ-পত্র হস্তান্তর করা যায় না।

**অ-রেজিস্ট্রিকৃত ঋণ-পত্র (Un-registered Debenture) :**

এই শ্রেণীর ঋণ-পত্রে কোন ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয় না। এই প্রকার ঋণ-পত্রের পিছনে কেবল সহি করিয়া দিলেই ইহা হস্তান্তর করা হয় সুতরাং ইহার হস্তান্তর অনেক সহজ-সাধ্য।

**ঋণ-পত্র ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Debentures and Shares) :**

**ঋণ-পত্র**

**শেয়ার**

(১) ঋণ-পত্রের বিনিময়ে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহা কোম্পানীর ঋণ বলিয়া গণ্য হয়।

(১) শেয়ারের বিনিময়ে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহা কোম্পানীর মূলধন।

(২) ঋণ-পত্র ক্রেতা কারবারের উত্তম (creditor)।

(২) শেয়ার ক্রেতা কারবারের মালিক।

(৩) ঋণ-পত্র ক্রেতা ঋণের পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় এবং এই সুদ কোম্পানীর মুনাফা-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ কোম্পানীর মুনাফা না হইলেও এই সুদ দিতে হইবে।

(৩) শেয়ার-ক্রেতা নির্দিষ্ট ব পরিবর্তনশীল হারে কোম্পানীর লভ্যাংশ পায়। কোম্পানীর মুনাফা না হইলে ইহাদের লভ্যাংশ পাওয়া প্রায়ই আসে না।

(৪) ঋণ-পত্র ক্রেতা কোম্পানীর পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

(৪) শেয়ার-ক্রেতা কোম্পানীর পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

## ঋণ-পত্র

## শেয়ার

(৫) সাধারণত ঋণ-পত্রের অর্থ পরিশোধ্য।

(৫) একমাত্র পরিশোধ্য প্রেক্ষা-  
রেল শেয়ার ছাড়া অন্যান্য শেয়ারের  
অর্থ কারবার চলাকালিন পরিশোধ্য  
-নয়।

(৬) কোম্পানীর অবসান হইলে  
ঋণ-পত্র ক্রেতার দাবি শেয়ার ক্রেতার  
দাবির পূর্বে মিটাইয়া দিতে হয়।

(৬) কোম্পানীর অবসান হইলে  
প্রথমত কোম্পানীর যাবতীয় ঋণ  
পরিশোধ করিয়া পরে শেয়ার ক্রেতা-  
গণের দাবি মিটাইতে হয়। ) ০৮৮

**যৌথ-মূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management and Administration of Joint Stock Company) :**

শেয়ার হোল্ডারগণই যৌথ মূলধনী কারবারের মালিক। কিন্তু সকল শেয়ার-হোল্ডারগণের পক্ষে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্ত শেয়ার-হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচিত করিয়া পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করে এবং এই পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সকল নির্বাচিত সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে বলা হয় পরিচালক বা ডিরেক্টর। যৌথভাবে ইহাদের বলা হয় পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড অব ডিরেক্টরস। সাধারণ যৌথ-মূলধনী কারবারে (Public Limited company) কমপক্ষে তিনজন এবং পরিমিত দায়যুক্ত যৌথ মূলধনী কারবারে (Private Limited Company) কমপক্ষে দুইজন পরিচালক নিয়োগ করিতে হয়।

কোম্পানী আইন অনুসারে যৌথ মূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালকমণ্ডলীর উপর অর্পণ করা হইলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার অংশ গ্রহণ করা পরিচালক-মণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্ত পরিচালক-মণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীনে (১) ম্যানেজিং ডিরেক্টর (২) ম্যানেজিং এজেন্ট (৩) ম্যানেজার অথবা (৪) সেক্রেটারীস এবং ইন্টার্নস, ইহাদের যে কোন একটির নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে ইহাদের মধ্যে বাহ্যিক নিয়োগ করা হয় তাহার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই চুক্তিতে নিয়োগের শর্ত, যে শব্দের জন্ত নিয়োগ

করা হইল এবং যে যে কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে তাহা, পারিভ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে এবং এই চুক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি সাপেক্ষ।

**পরিচালক নিয়োগ ও তাহাদের অবসর গ্রহণ (Appointment and Retirement of Directors) :**

কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভায় শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে কোম্পানীর পরিচালক (Director) নির্বাচিত করে। কোন ব্যক্তিকেই ত্রু পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা যায়।

কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর-কারীগণ কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত করে এবং এই সকল পরিচালকদের নাম কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে লিখিত থাকে। উক্ত পরিচালকগণ যে পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে ইচ্ছুক এবং তাহারা যোগ্যতাসূচক ন্যূনতম শেয়ার ক্রয় করিয়াছে বা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এই মর্মে তাহাদের একটি স্বীকৃতি-পত্র বা দলিল কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়।

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময় উপযুক্ত উপায়ে পরিচালকগণ নিযুক্ত না হইলে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সাধারণ বার্ষিক সভায় পরিচালক নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত, স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীগণই কোম্পানীর প্রথম পরিচালক হিসাবে কার্য করে।

কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে এমন ব্যবস্থাও থাকিতে পারে যে সাধারণ ঘোষণা-মূলধনী কারবার (Public Limited company) ও তাহার অধীনস্থ কোম্পানী (subsidiaries) সমূহে সকল পরিচালকগণই প্রতি বৎসর অবসর গ্রহণ করিবে। পরিচালক অবসর গ্রহণ করিলে যে শ্রুত পদের সৃষ্টি হয় তাহা শেয়ার হোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করে।

উপরিউক্ত উপায়ে অবসর গ্রহণ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোম্পানী-পরিচালককে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করিতে হয় :

(১) পরিমেল-নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করিতে সক্ষম না হইলে ;

(২) তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা দেউলিয়া ঘোষণা করা হইলে ;

(৩) আদালতে ফৌজদারী অপরাধের ছয়মাসের অধিক কালের জন্ত দণ্ডিত হইলে; অথবা আদালত কর্তৃক পরিচালক হইবার অবোধ্য বলিয়া ঘোষিত হইলে;

(৪) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার শেয়ার তুলবী-অর্থ ( call money ) দিতে অপারগ হইলে;

(৫) যদি পরিচালক বোর্ডলী ( Board of Directors ) বিনামূল্যে তে পর পর কোম্পানীর তিনটি সভায় অথবা তিনমাস কাল পর্যন্ত যাবতীয় সভায় অস্থগত থাকে;

(৬) কোম্পানীর কোন চুক্তিতে নিজের স্বার্থ জড়িত থাকিলে তাহা গোপন করা হইলে;

(৭) বিশেষ নোটিশের বলে ( Special resolution ) কোন প্রস্তাবের দ্বারা পরিচালক পদ হইতে অপসারণ করা হইলে।

**কোম্পানী পরিচালকগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ( Powers and functions of Directors ) :**

কোম্পানী-পরিচালকদের ক্ষমতা কোম্পানীর পরিষদ-নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষমতা পরিচালকগণ যৌথভাবেই প্রয়োগ করিতে পারে, একক ভাবে নয়। অবশ্যই পরিচালকগণের ক্ষমতা কোম্পানীর স্মারকলিপির বিষয় বহির্ভূত হইতে পারিবে না।

আইনত কোম্পানীর পরিচালকগণ নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে :—

(১) শেয়ার ক্রেতাগণকে শেয়ারের তুলবী-অর্থ ( call money ) প্রদানের জন্ত আহ্বান করিতে পারে;

(২) ঋণ-গ্রহণ করিতে পারে;

(৩) ঋণ-পত্র ( Debentures ) বিলি ( Issue ) করার ঋণ-সংগ্রহ করিতে পারে;

(৪) ঋণ-দিতে পারে;

(৫) কোম্পানীর পক্ষ হইয়া অপরের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে  
কোম্পানী পরিচালকের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ :—

(১) পরিচালকগণ কোম্পানীর দৈনন্দিন পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতি

(২) কোম্পানীর নথি-পত্র, হিসাব নিকাশ ও তদন্তক্রান্ত খাতাপত্র প্রস্তুত ও প্রকাশ করে ;

(৩) কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভা আহ্বান করে ;

(৪) কোম্পানীর মুনাফা বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে ;

(৫) কোম্পানীর কার্য-পরিচালনার ক্ষমতা কর্তৃত্বাধীন নিয়োগ করে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের বরখাস্ত করে ;

(৬) দুইটি সাধারণ অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে কোন পরিচালকের পদ শূন্য হইলে সেই অন্তর্বর্তীকালের ক্ষমতা বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করে ;

(৭) কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করে ।

**কোম্পানী পরিচালকগণের কর্তব্য ও দায় (Duties and Liabilities of Directors) :**

**কর্তব্য :** পরিচালকগণের কর্তব্য সম্পর্কেও কোম্পানীর পরিমেল-নিয়মাবলীতে নির্দেশ থাকে এবং তাহাদের কর্তব্যও নানাবিধ। তন্মধ্যে কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ :—

(১) সরকারের অনুমোদন ব্যতিত কোন পরিচালক ৬৫ বৎসর বয়সের পর আর পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারে না। সুতরাং কোম্পানীর নিকট প্রত্যেক পরিচালকের সঠিক বয়স ঘোষণা বা প্রকাশ করা কর্তব্য ;

(২) কোন পরিচালক একই সঙ্গে ২০ টির অধিক যৌথ-মূলধনী কারবারের পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারে না। সুতরাং কয়টি কারবারের পরিচালক হিসাবে সে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করাও তাহার কর্তব্য,

(৩) পরিমেল-নিয়মাবলীতে নির্দেশ না থাকিলে কোন পরিচালক নিজের স্বার্থে কোম্পানীর সহিত কোন চুক্তি করিতে পারে না ; নিজের স্বার্থে কোম্পানী হইতে কোনও কাজ গ্রহণ ও করিতে পারে না ;

(৪) পরিচালক অপর কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকিলে যে কোম্পানীর তিনি পরিচালক সেই কোম্পানীর নিকট তাহা প্রকাশ করিতে হয় ;

(৫) কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভা আহ্বান করা কর্তব্য ;

(৬) কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট যে সকল দলিল পত্রাদি দাখিল করা হইয়া থাকে তাহার স্বার্থ সম্পর্কে ঘোষণা করাও পরিচালকের কর্তব্য।



## পরিচালকের দায় (Liabilities of Directors) :

কোম্পানী-পরিচালকের প্রধান দায়গুলি নিম্নলিখিত রূপ :-

(১) কোম্পানী ঋণের জন্য পরিচালকের দায় তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ ;

(২) সততা ও যত্নের সঙ্গে কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করা পরিচালকের কর্তব্য। কিন্তু কোম্পানীর কার্য পরিচালনায় ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ও অবহেলা হইলে বা পরিচালক ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হইবে ;

(৩) কোম্পানীর কার্য পরিচালনার জন্য পরিচালকগণ যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে, তাহার জন্য পরিচালকগণের কোন ব্যক্তিগত দায় থাকে না। কোম্পানীর পরিষদ-নিয়মাবলীতে পরিচালকগণকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় সেই ক্ষমতাবলে এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষমতা বহির্ভূত কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে পরিচালকগণ-ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে ;

(৪) পরিচালকগণ কোম্পানীর কোন দলিল পত্রে শীলমোহর ছাড়া সহি করিলে সে সকল দলিলে বর্ণিত বিষয়ে তাহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব জন্মায় ;

(৫) বিশ্বাস ভঙ্গ, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, আইনভঙ্গ ইত্যাদির জন্য ও পরিচালকগণ দায়ী ;

(৬) কোম্পানীর স্মারকলিপি-বহির্ভূত কোন কার্যকলাপের জন্য অথবা স্মারকলিপি-বহির্ভূত কোন বিষয়ে কোম্পানীর অর্থ ব্যয়ের জন্য পরিচালকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী ;

(৭) আইনের অনুমোদন ব্যতীত মূলধন হইতে লভ্যাংশ বন্টন করা, কোম্পানীর নিকট কোন পরিচালকের ঋণ মকুব করা, অংশত আদায়ীকৃত শেয়ারকে (partly paid-up) সম্পূর্ণ আদায়ী কৃত শেয়ারে (fully paid-up) রূপান্তরিত করা ইত্যাদি পরিচালকগণের ক্ষমতাবহির্ভূত। সুতরাং এইরূপ কার্যের জন্য পরিচালকগণের ব্যক্তিগত দায় জন্মায় ;

(৮) কোন অসারু কার্যকলাপ অথবা নিজের স্বার্থের জন্য কোম্পানীর অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদির জন্য ও পরিচালকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী।

## **ব্যবস্থাপক-পরিচালক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর (Managing Director)**

পরিচালক মণ্ডলী কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার কার্য না করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে একজন পরিচালকের উপর উহার ভার অর্পণ করিলে সেই পরিচালক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ব্যবস্থাপক-পরিচালক কুলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য কোম্পানী আইনে তাহাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে এমন কোন নির্দেশ নাই।

ব্যবস্থাপক-পরিচালকের উপর যে কার্যের ভার অর্পণ করা হয় তাহা পরিচালক মণ্ডলীর সহিত চুক্তির দ্বারা, কোম্পানীর স্মারকলিপি বা পরিমেল-নিয়মাবলীর ক্ষমতা বলে, অথবা শেয়ারহোল্ডারগণের সাধারণ সভায় বা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা স্থির হয়।

ব্যবস্থাপক পরিচালকের ক্ষমতা ও তাহার নিয়োগপত্রে নির্দিষ্ট করা হয়।

পরিচালক ব্যতীত অপর কেহ ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারে না এবং একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিককালের জন্য কেহ ব্যবস্থাপক-পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারে না। অবশ্য ৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ব্যবস্থাপক-পরিচালকের পুননিয়োগ সম্ভব।

ব্যবস্থাপক-পরিচালকের নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যবস্থাপক-পরিচালক দুইটির অধিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপক-পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারে না।

ব্যবস্থাপক পরিচালকের পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ৫ ভাগের বেশী হইতে পারে না।

### **ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার (Manager):**

কারবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য পরিচালক মণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীনে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে তাহাকে ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার বলা হয়।

ব্যবস্থাপকের নিয়োগ, কার্যকাল, দায়িত্ব ও পারিশ্রমিক ইত্যাদি ব্যবস্থাপক পরিচালকের নিয়োগ, কার্যকাল, দায়িত্ব ও পারিশ্রমিক ইত্যাদির অনুরূপ। অর্থাৎ ব্যবস্থাপককেও চুক্তির দ্বারা অথবা উপযুক্ত প্রস্তাবের দ্বারা

নিযুক্ত করা হয়, তাহার কার্যকাল একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক অথবা পরিষে-  
নিয়মাবলীর দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, তাহার পারিশ্রমিকও ব্যবস্থাপক-পরিচালকের  
অনুরূপ। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণত কোম্পানী  
বহির্ভূত ব্যক্তিকেই ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। অবশ্য উপযুক্ত প্রস্তাবের  
দ্বারা কোন পরিচালককেও ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, সরকারের বিনামূল্যে কোন ব্যবস্থাপক একটির অধিক  
কোম্পানীর ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইতে পারে না।

**সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স্ (Secretaries and Treasurers) :**

কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্ত ১৯৫৩ সালের ভারতীয়  
কোম্পানী আইনে ‘সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স্’ নিয়োগের ব্যবস্থা  
হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি বিশেষকে এই পদে নিয়োগ করা যায় না। কেবল কোন  
অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ-মূলধনী কারবার ‘সেক্রেটারিস্ এবং  
ট্রেজারার্স্’ হিসাবে কার্য করিতে পারে। পরিচালক মণ্ডলীর তদারকি,  
নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণধীনে ‘সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স্’ কোম্পানীর পরিচালনার  
ভার সম্পূর্ণ অথবা অংশত গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পারিশ্রমিকও  
কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ৭½ ভাগের বেশি হইতে পারে না।

‘সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স্’ দের ক্ষমতা ও এই আইনবলে সীমাবদ্ধ  
করা হইয়াছে। ইহাদের কোন পরিচালক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই।  
কোম্পানীর পক্ষ হইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিবার অধিকারও ইহাদের দেওয়া  
হয় নাই।

**ম্যানেজিং, এজেন্ট বা পরিচালন-প্রতিনিধি (Managing Agent) :**

কোন কোম্পানীর চুক্তি অনুসারে সেই কোম্পানীর পরিচালকদের  
নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণধীনে যদি কোন ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার বা যৌথ-মূলধনী  
কারবার কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই  
ব্যক্তি অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ-মূলধনী কারবারকে ম্যানেজিং  
বা পরিচালন-প্রতিনিধি বলা হয়।

ভারতীয় বোধমূলধনী কারবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পরিচালন-প্রতিনিধি এদেশে বোধমূলধনী কারবার সংগঠনে প্রথম হইতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের মত শিল্পে অল্পমাত্রা দেশে বৃহদায়তন কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠনের উপযোগী জ্ঞান, অর্থ সংস্থান প্রভৃতির নিতান্তই অভাব ছিল। তখন হইতেই এই জাতীয় পরিচালন-প্রতিনিধি উক্ত অস্থিবিধাগুলি দূর করিয়া বৃহদায়তন বোধমূলধনী কারবারী সংগঠনের দায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছে। ইহারা কোম্পানীর প্রবর্তনার, অর্থসংস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, দ্রব্য উৎপাদন, দ্রব্য বিক্রয় এবং ব্যবস্থাপনার অন্তান্ত সকল বিষয়েই নিজেদের নিযুক্ত করে। এইরূপ বহু দায়িত্ব পালন করিবার ফলে কালক্রমে তাহাদের ক্ষমতাও অত্যধিক হইয়া পড়ে এবং প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় পরিচালন-প্রতিনিধি ব্যবস্থায় নানারূপ ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। এই ক্রটি বিষয়ে স্থানান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

**পরিচালন-প্রতিনিধির কার্যাবলী (Functions of Managing Agents):**

পরিচালন-প্রতিনিধির কার্যাবলী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:—

- (১) কারবার সংগঠন বা প্রবর্তন
- (২) কারবারের অর্থ সংস্থান
- (৩) কারবারের ব্যবস্থাপক।

**কারবারের প্রবর্তন (Promotion):**

পরিচালন-প্রতিনিধিগণ উদ্যোগী হইয়া হুতন হুতন শিল্প অথবা কারবার সংস্থাপন বা প্রবর্তন করে। স্তত্রাং কোম্পানী-প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যয়, গোড়ার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি সমস্তই তাহারা বহন করে। এই ভাবে প্রথমদিকে কারবারের বিরাট ঝুঁকি ইহাদের উর্বর বর্তায়। পরিচালক-প্রতিনিধিরা এইরূপ দায়িত্ব বহন করিতে উদ্যোগী হয় বলিয়াই ভারতবর্ষের মত শিল্পে অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রা দেশে বৃহদায়তন শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা সহজসাধ্য হইয়াছে।

**(২) কারবারের অর্থ সংস্থান (Financing):**

অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতের মত অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রা দেশে বৃহদায়তন বোধ-মূলধনী শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠানের অভ্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা খুব সহজ সাধ্য নয়। অর্থসংস্থান দিক হইতে পরিচালন

## ‘বাণিজ্যিক জীবন’

প্রয়োজন নানানভাবে যোগদানকারী কারবারকে সহায়তা করে। অধোক্ষণ হইলে ইহার কোম্পানীকে ঋণ দিয়া অথবা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া কারবারের অর্থ সংস্থান করে। আবার আধীনস্থ হইয়া ব্যক্তি প্রকৃতি অত্যন্ত ক্ষমত্ব হইতে ঋণ সংগ্রহে সক্ষমতা করে। ইহা ছাড়া কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণ পত্র বিক্রয়ের দ্বারা বা ঋকি বহন করিয়া ও ইহার কোম্পানীর অর্থ সংস্থানে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে।

### (৩) কারবারের ব্যবস্থাপনা (Management) :

কারবারের ব্যবস্থাপনার পরিচালন-প্রতিনিধির প্রধান কার্য। ইহাদের নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান শুধুভাবে কারবার পরিচালনার বখেটে সাহায্য করে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, কোম্পানীর প্রবর্তন অর্থ সংস্থান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচালন-প্রতিনিধির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এতদসঙ্গেও কালক্রমে পরিচালন-প্রতিনিধি ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি দেখা দেয়।

### পরিচালন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ :—

(১) একই পরিচালন-প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বহু কারবারের পরিচালন-প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করে। ফলে প্রত্যেকটি কারবারের পরিচালনার সমান ভাবে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া পরিচালন-প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব হয় না।

(২) একই সঙ্গে কারবারের পরিচালন-প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার ইহার অনেক ক্ষেত্রে এক কারবারের অর্থ অত্র কারবারে নিয়োগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অসার্ক কোম্পানীকে অথবা বাচাইয়া রাখে ইহাতে সার্ক কোম্পানীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালন প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেয়। ফলে, কোম্পানীর সামগ্রিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের যত বেশি সম্ভব মুনাফা ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়। ইহাতে কারবারের স্বার্থ ক্ষুব্ধ হয়।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিচালন-প্রতিনিধিরা তাহাদের নিজস্ব অর্থায়নিক হাড়াও নানা ভাবে কোম্পানী হইতে অর্থ আদায় করিয়া নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। ফলে কোম্পানীর অর্থ সংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

করিয়া, কোম্পানীর শেয়ার লইয়া ঘটকাবাজী করিয়া, কোম্পানীর নামে নিজের ব্যক্তিগত কারবার চালাইয়া, কোম্পানীর গোপন সংবাদ-বাহিরে সরবরাহ করিয়া ও আরও নানা ভাবে ইহার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে।

(৫) পরিচালন-প্রতিনিধিরা যাদও পরিচালক মণ্ডলীর কর্তৃত্ব, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রাধীন, কার্যত দেখা যায় যে পরিচালক মণ্ডলীতে অধিকসংখ্যায় নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচিত করিয়া নিজেরাই প্রকৃত পক্ষে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসে। ফলে শেয়ারহোল্ডারগণের অধিকার বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

(৬) ভারতীয় পরিচালন-প্রতিনিধিরা অধিকাংশক্ষেত্রে বংশায়ক্রমিক ভাবে নিযুক্ত হয়। ফলে, কোন একজন দক্ষ পরিচালন-প্রতিনিধির মৃত্যুর পর হয়ত একজন অযোগ্য বংশধরের হাতে কোম্পানীর পরিচালনাও ব্যবস্থাপনার ভার বর্তাইতে পারে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেই এইরূপ ক্ষতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য যে ক্ষেত্রে পরিচালন-প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানগুলি অংশীদারী অথবা বোধমূলধনী হয় সেই ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না।

পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার ক্ষতি গুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী আইনেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই সকল বিধি নিষেধ গুলি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনে পরিচালন-প্রতিনিধির নিয়োগ, কার্যকলাপ পারিশ্রমিক ইত্যাদি ব্যাপারে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন, ১৯৩৬ সালের আইন অনুসারে স্থির হইয়াছিল যে কোন ম্যানেজিং এজেন্ট বা পরিচালন-প্রতিনিধি একাদিক্রমে ২০ বৎসরের জন্ত নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের আইন অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে কোন পরিচালন প্রতিনিধি ২৫ বৎসরের অধিক কালের জন্ত নিয়োগ করা যাইবে না এবং ইহাদের পুনর্নিয়োগও ১০ বৎসরের অধিক কালের জন্ত করা যাইবে না কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে ১৯৬০ সালের ১শ্রী আগস্টের পর পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হইবে। ১৯৬৩ সালের ১৫ই আগস্টের পর কোন পরিচালন-প্রতিনিধি একই সঙ্গে ১০শ্রী অধিক কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ-করিতে পারিবে না। ইহার

পারিশ্রমিক সম্পর্কেও ১৯৫৬ সালের আইনে এই স্থির হইয়াছে যে কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগের বেশি ইহার পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আবশ্যক। কোম্পানীর সাধারণ সভায় হিসাবপত্র অনুমোদিত হইবার পূর্বে ইহা বা কোন পারিশ্রমিক পাইবে না। কোম্পানীর মুনাফা পর্যাপ্ত না হইলে ইহার কখনও ৫০,০০০ টাকা পারিশ্রমিক পাইতে পারিবে।

(কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকারের সভা (Meetings of Company) :

(১) কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting of a Company)

বৈধমূলধনী কারবারের পক্ষে প্রতিবৎসর শেয়ার হোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা অর্থনৈতিক বাধ্যতামূলক। হুতন কোম্পানী গঠনের তারিখ হইতে অন্তত ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হয়। পরে বৎসরান্তে একবার এইরূপ সভা আহ্বান করিতে হয়। তবে দুইটি বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তর্বর্তীকাল কখনও ১৫ মাসের অধিক হইতে পারিবেন। কোম্পানীর আর্থিক বৎসর (financial year) শেষ হইবার ৯ মাসের মধ্যে এইরূপ সভা আহ্বান করিতে হয়। অবশ্য কেন্দ্র-বিশেষে কোম্পানীর নিবন্ধক যুক্তিযুক্ত মনে করিলে কোম্পানীর আবেদন ক্রমে এই রূপ বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন।

কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী অথবা তাহাদের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী এইরূপ সভা আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ সভার নোটিশ প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের নিকট সভার তারিখের অন্তত ২১ দিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হয়।

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণত পরিচালক নির্বাচন, হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষিত হিসাব বিবেচনা, কোম্পানীর লভ্যাংশ ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে।

কোম্পানীর অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extra-Ordinary General Meeting of a Company) :

কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে কোন অতিরিক্ত বিষয় বিবেচনার শেয়ার হোল্ডারগণের যে সভার ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে কোম্পানীর সাধারণ সভা বলা হয়। কোম্পানীর পরিচালকগণ অথবা শেয়ার-

হোল্ডারগণ এইরূপ সভা আহ্বান করিতে পারে। এইরূপ সভা আহ্বান করিতেও ২১ দিনের নোটিশ দিতে হয়। যে সকল শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর আদায়ী-কৃত মূলধনের এক দশমাংশের অংশীদার এবং যাহাদের নিকট হইতে সমস্ত তলবী অর্থ (Call money) যথার্থ, আদায় করা হইয়াছে অথবা যে সকল শেয়ারহোল্ডারের ভোটদানের অধিকার আছে তাহাদের এক দশমাংশ সম্মিলিত ভাবে এইরূপ জরুরী সাধারণ সভার জন্ত নির্দেশ দিতে পারে। যদি কোম্পানীর পরিচালক যত্নশীল এইরূপ নির্দেশের ২১ দিনের মধ্যে জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান না করে তাহা হইলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরাই এইরূপ সভা আহ্বান করিতে পারে।

কোম্পানীর জরুরী সাধারণ সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাকে জরুরী সিদ্ধান্ত (Extra ordinary resolution) বলা হয়।

**কোম্পানীর বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক সভা (Statutory Meeting of a Company) :**

কোন নবগঠিত কোম্পানীকে নিবন্ধকের নিকট হইতে কার্যারম্ভের অসম্পূর্ণতা-পত্র (Certificate of Commencement) পাইবার একমাস অন্তে কিন্ত ছয় মাসের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণের একটি সাধারণ সভা বাধ্যতামূলক ভাবে আহ্বান করিতে হয়। ইহাকে কোম্পানীর বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক সভা বলা হয়। এইরূপ সভা আহ্বান না করা আইনত দণ্ডনীয়। এইরূপ সভা আহ্বৃত না হইলে সরকার কোম্পানী গুটাইবার আদেশ দিতে পারে।

কোম্পানীর পরিচালকগণ অথবা কর্মসচিব (Secretary) সভার ২১ দিন পূর্বে একটি বিবরণী-বা রিপোর্ট প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের নিকট দাখিল করে। ইহাকে বলা হয় বিধিবদ্ধ বিবরণী—বা স্ট্যাটুটরী রিপোর্ট (Statutory Report). এই বিবরণীতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয় :—

(১) কোম্পানীর বিলিকৃত শেয়ার এবং এইরূপ শেয়ার দাবী বৃত্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ ;

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের উপর দত্ত অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ ও বিবরণ ;



(৩) বিবরণী প্রস্তুতের সাতদিন পূর্ব পর্যন্ত বত নগদ টাকা আদায় হইয়াছে এবং বত নগদ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ;

(৪) পরিচালক, পরিচালন প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও সেক্রেটারিস্ এবং ট্রেজারার্স দের নাম, ঠিকানা ও পেশা ;

(৫) কোন চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন চুক্তির সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সেই চুক্তির বিশদ বিবরণ ;

(৬) দায়গ্রহণের চুক্তি ( Underwriting ) হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ;

(৭) পরিচালক, পরিচালন-প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে কত তলবী অর্থ আদায় করা যায় নাই তাহার পরিমাণ ও বিবরণ ;

(৮) কোন পরিচালক, পরিচালন-প্রতিনিধি বা ব্যবস্থাপককে যদি কোন কমিশন অথবা দালালী দেওয়া হইয়া থাকে তাহার বিশদ বিবরণ ।

### ভোট-প্রতিনিধি (Proxy) :

যদি কোন সদস্য কোম্পানীর সভায় নিজে উপস্থিত হইয়া ভোটদান করিতে না পারে তাহা হইলে কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রতিনিধি মারফৎ ভোট দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অবশ্য কোম্পানীর পরিষদ-নিয়মাবলীতে এইরূপ ভোট প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা চাই । শেয়ারহোল্ডার ছাড়া অন্য কেহ এইরূপ ভোট প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারে না । ভোট-প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হইলে, এই মর্মে একটি পত্র সাধারণ সভার অন্তত তিন দিন পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হয় । অন্তর্গত ভোট-প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায় না ।) *cm*

### যৌথ-মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Joint Stock Company) :

সংক্ষেপে যৌথ-মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ ।

#### সুবিধা :

(১) এইরূপ কারবারের অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব । কারণ শেয়ারের মূল্য অল্প হওয়ায় বহু-সংখ্যক গল্পবিত্ত লোককে ও এইরূপ শেয়ার ক্রয়ের অন্ত আকর্ষণ করা যায় ।

(২) সমস্ত কারবারের পরিচালনা অধিক সুবিধা সহজতরভাবে হইতে পারে ।

যুক্তি বহনের ক্ষমতাও বাড়ে। বহুল উৎপাদনের ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং তাহার ফলে সম্ভোগকারীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায়।

(৩) শেয়ারহোল্ডারগণের দ্বারা ক্রীত শেয়ারের নির্ধারিত মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ও তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগে উৎসাহ বোধ করে। তাহা ছাড়া যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার সহজে হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া ও বিনিয়োগ-কারীরা শেয়ার ক্রয়ে ইচ্ছুক হয়।

(৪) যৌথমূলধনী-কারবারের শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা আয় বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া সাধারণলোক সঞ্চয় করিতে উৎসাহ বোধ করে।

(৫) যৌথমূলধনী কারবারে বিভিন্ন শ্রেণীর দায়বদ্ধ শেয়ার থাকিতে ক্রেতাগণ-ইচ্ছামত এক এক শ্রেণীর শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে যাহারা বেশি ঝুঁকি বহন করিতে অনিচ্ছুক, তাহারাও নিজেদের সঞ্চয়-বিনিয়োগের সুযোগ পায়।

(৬) যে সকল ব্যক্তির আর্থিক সম্বল যথেষ্ট কিন্তু কারবার পরিচালনার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্য নাই তাহারা এবং যে সকল ব্যক্তির দক্ষতা ও নৈপুণ্য আছে কিন্তু আর্থিক সম্বল নাই তাহারা, এই উভয় শ্রেণীর লোক যৌথমূলধনী কারবারে যোগদান করিতে পারে বলিয়া এই ধরনের কারবারী-প্রতিষ্ঠানে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে। ফলে, এই ধরনের কারবারের সাফল্য সহজতর হয়।

(৭) আইনেক দ্বারা এইরূপ কারবারী-প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র সম্বল স্বীকৃত হয় বলিয়া ইহাদের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৮) সুদক্ষ পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া এবং প্রয়োজনবোধে পরিচালকমণ্ডলীরও পরিবর্তন সাধন করা যায় বলিয়া এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা অনেকটা ক্রটিমুক্ত।

### অসুবিধা :

(১) এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাও মালিকানার মধ্যে বিভেদ ঘটায়। পরিচালকেরা অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানীর সর্বাধীন উন্নতির দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয় না।

(২) আপত্ত্যবৃত্তিতে এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক হইলেও স্বাধীন, পরিচালক, ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ কিছু সংখ্যক

হস্তে সর্বাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং এই সকল ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে।

(৩) ইহাতে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব বেশি না থাকায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ঘটে।

(৪) যোগ্যতার উপর নির্ভর করিয়া সাধারণত কোম্পানীর উপযুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয় না। অনেক সময় পরিচালকেরা নিজেদের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। ইহাতেও কারবারের ক্ষতি হয়।

(৫) অনেক সময় বিভ্রান্তিকর প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সার্বকতার সম্ভাবনা কম এই রূপ কাব্বারে জনসাধারণ তাহাদের সময় বিনিয়োগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

### সমবায় সমিতি ( Co-operative Societies ) :

নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাহাকে সমবায় সমিতি আখ্যা দেওয়া যায়।

ধনাত্মিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ লোক নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাহাদের উপর নানাপ্রকার শোষণ ও নিপেষণ ও নির্বিচারে চলে। একক ভাবে ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা কখনও সম্ভব নয়। স্বতরাং সংগবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক শোষণকে প্রতিরোধ করিয়া নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানের উদ্দেশ্যে সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে।

### সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য :

(১) গঠন : কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া নিজেদের সাধারণ স্বার্থ (common interest) সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এইরূপ সমিতি গঠন করে।

(২) মূলধন : অল্প-মূল্যের শেয়ার বিক্রয় করিয়া ইহার মূলধন সংগৃহীত হয়। শেয়ার ক্রেতাদের সমিতির সদস্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) ভাষ্য : শেয়ার ক্রেতাদের সীমাবদ্ধ বা অসীম হইতে পারে।

(৪) পরিচালনা : সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর উপর সমিতির পরিচালনার ভার স্তম্ভ হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট

দানের অধিকার থাকে। পরিচালক মণ্ডলীর একজন সভাপতি ও একজন কর্মসচিব থাকে। প্রতি বৎসর দুইজন পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত হয়।

(৫) **মূল্যাকা :** মূল্যাকা অর্জনের উদ্দেশ্যে সমবায়-সমিতি গঠিত হয় না। কিন্তু কারবারের যদি মূল্যাকা হয় তাহা হইলে তাহার এক-অংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা হয় অথবা সদস্যগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়। আর এক অংশ সদস্যগণের ক্রীত শেয়ারের অল্পপাতে তাহাদের মধ্যে বন্টন করা যাইতে পারে।

(৬) **স্বায়িত্ব :** আইনত সমবায়-সমিতির পৃথক সত্তা স্বীকার করা হয়।

**বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়-সমিতি ( Different types of Co-operative Societies )**

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অল্পসারে সমবায়-সমিতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান :—

(১) **উৎপাদক সমবায় সমিতি ( Producers' Co-operative Society ) :**

দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক অথবা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ সম্মিলিত হইয়া নিজেরাই পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর সমবায় সমিতি গঠন করে। ইহারা নিজেরাই মূলধন যোগায় ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেরা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণ মূল্যাকা নিজেরাই ভোগ করিতে পারে। পণ্য-বিক্রয় ও নিজেরা করে, বলিয়া কোন মধ্যস্থ কারবারীকে আয়ের ভাগ দিতে হয় না। ফলে, ইহাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কৃষিজ-দ্রব্য উৎপাদন ও কুটির শিল্পের এই শ্রেণীর সমবায় সমিতি বিশেষ কার্যকরী।

(২) **সম্ভোগকারীর সমবায় সমিতি ( Consumers Co-operative Societies ) :**

খুচরা কারবারীর অবস্থান হেতু সম্ভোগকারীদের বেশি মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করিতে হয়। আবার অনেক সময় অসাধু খুচরা কারবারীরা ভেজালদ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতেও সম্ভোগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল অসুবিধা হ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সম্ভোগকারীরা নিজেরাই সমবায়-সমিতি গঠন করে। এই শ্রেণীর সমবায় সমিতি পণ্য-উৎপাদকের নিবর্ত হইতে

সমস্তসমি পণ্য ক্রয় করিয়া বাজার করে বা অন্য কোন নির্দিষ্ট মতে সম্ভোগকারীর সমস্তসমি পণ্য বাহিরের কেন্দ্রের নিকট বিক্রয় করে। পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা সমস্তসমি যোগান দেয়। সমিতির যে সুশীল হয় তাহার অংশ সাধারণত সমস্তসমি মধ্যে ভাহাদের মোট ক্রয়ের সম্ভোগে বন্টন করা হইয়া থাকে।

### সমবায় ঋণ-দান সমিতি (Co-operative Credit Society) ●

দরিদ্র অথবা স্বল্পবিত্ত কৃষক, শ্রমিক অথবা সাধারণ ব্যক্তি যখন প্রয়োজন হইলে সুবিধাজনক সর্বোৎকৃষ্ট ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাহাকে সমবায় ঋণ-দান সমিতি বলা হয়। এইরূপ সমিতির পুঁজি সাধারণত সমস্তসমি পণ্যের নিকট শেয়ার বিক্রয় কবিয়া সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বা সাধারণের নিকট হইতে আমানত ভাষা করিয়াও এইরূপ সমিতি অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়-সমিতি ছাড়াও সমবায় গৃহ-নির্মাণ সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় বীমা সমিতি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া থাকে।

### রাষ্ট্রীয় কারবার (State Enterprise) :

বর্তমানে আমরা তিন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত। যথা:—(১) দনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, (২) সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যবস্থা, (৩) মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর অর্থাৎ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না তাহাকে দনতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়।

যে ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয় তাহাকে সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা বলা হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানার কোন স্থান নাই। বস্তুতঃ ইহা দনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা।

যে ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে উভয়ের স্থান থাকে তাহাকে 'মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'

(mixed economy) ভারতে এই 'মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' অদ্বৈত হইতেছে।

যতদূর কয়ল পুৰিষীক সকল দেশেরই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সেই দেশের রাষ্ট্রের কৰ্মবৈশিষ্ট্য হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এখন নিম্নক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না সেখানে প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ করে।

রাষ্ট্রীয় কারবারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে।

(১) রাষ্ট্রীয় কারবার শুধু মাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় না। দেশের সামগ্রিক উন্নতি বিধানই ইহার মূখ্য উদ্দেশ্য।

(২) রাষ্ট্রীয় কারবারে সরকারই মূলধনের সবটা বা বেশির ভাগ সরবরাহ করে।

(৩) রাষ্ট্রীয় কারবারে প্রভূত মূলধনের সংস্থান করা যায় বলিয়া ইহার আরতন ধোঁখ-মূলধনী কারবার হইতে বড় হইতে পারে।

(৪) রাষ্ট্রীয় কারবারের কার্যকলাপে ও ফলাফলের জ্ঞাত সরকারকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করিত হয়। সাধারণত এই প্রকারের জবাবদিহি দেশের বিধান সভা ও লোকসভার মাধ্যমে করা হইয়া থাকে।

(৫) রাষ্ট্রীয় কারবারের কোন ব্যক্তির স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত নয় বলিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অনেক সময় নানাপ্রকার ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বে-সরকারী কারবারে অপচয় ও ব্যয় বাহুল্য রোধ করিবার জ্ঞাত মালিক যে পরিমাণ যত্ন নেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কারবারে তাহা অনুপস্থিত থাকে। কারণ রাষ্ট্রীয় কারবারের ফলাফলের উপর কোন কর্মচারীর স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত নয়।

### ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কারবার :

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কারবারে স্থানই সর্বাগ্রে ছিল কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে পরিকল্পনা অঙ্গুসারে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে এবং ক্রমশঃ রাষ্ট্র বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর

অংশ গ্রহণ করিতেছে। ফলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে ও পরিচালনার বহু নূতন নূতন শিল্প ও কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কে শুধু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহা নহে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রেও এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে ঐ সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে ঐ সকল শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র রাষ্ট্রই নূতন কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবে। বিমান পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, রেলপথ, খনিজ তৈল, কয়লা, লৌহ, অস্ত্রসস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি এই পর্ধ্যয়ে পড়ে।

আর এক শ্রেণীর শিল্প সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রাজপথ পরিবহন, সমুদ্র পবিবহন, কৃত্রিম রবার উৎপাদন, রাসায়নিক সার উৎপাদন প্রভৃতি এই শ্রেণী ভুক্ত।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প গঠন ও সম্প্রসারণ হইবে।

ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবারের সংগঠনিক দুই প্রকারের। যথা :—

(১) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এই শ্রেণীর কারবারের মালিকানা, নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের অধীন। বিমান পরিবহন, রেলপথ, ইত্যাদি এই পর্ধ্যয়ে পড়ে।

(২) কোম্পানী আইনের অধীনে সরকারী বোধ-মূলধনী কারবার। এইরূপ কারবারে সরকারের অন্ততপক্ষে শতকরা ৫১% শেয়ার থাকিতে হইবে অবশিষ্ট শেয়ার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের থাকিতে পারে। সিক্সি ফাটলাইর জার লিমিটেড, হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেড ইত্যাদি এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত।

### অনুশীলনী

1. What are the different forms of Business Organisation ?  
( বিভিন্ন ধরনের কারবারী প্রতিষ্ঠান কি কি তাহার উল্লেখ কর। )
2. What do you understand by Sole Proprietorship Business ? What are its special features ?  
( এক-মালিকী কারবার বলিতে কি বুঝ ? এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য-গুলি কি কি ? )
3. What are the advantages and disadvantages of Sole Proprietorship Business ?  
( এক-মালিকী কারবারের সুবিধা-অসুবিধা কি কি ? )
4. What do you understand by Joint Family Business ? What are its special features ?  
( যৌথ পারিবারিক কারবার বলিতে কি বুঝ ? ইহাব বৈশিষ্ট্য কি ? )
5. What is Partnership Business ? Describe its special features ?  
( অংশীদারী কারবার কাহাকে বলে ? ইহাব বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর। )
6. What is Partnership Deed or Articles of Partnership ? What are its important clauses ?  
( অংশীদারীর চুক্তিপত্র কাহাকে বলে ? এই পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি কি কি ? )
7. What are the different types of Partnership Business ? What are the different types Partners ?  
( বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারী কারবার কি কি ? বিভিন্ন ধরনের অংশীদারের উল্লেখ কর। )
8. Describe the rights, duties and liabilities of a Partner ?  
( অংশীদারের অধিকার, কর্তব্য ও দায় কি কি ? তাহার বর্ণনা দাও। )
9. What do you understand by Registration Partnership Business ? How Partnership registered ?



( অংশীদারী কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ বলিতে কি বুঝ ? অংশীদারী কারবারের রেজিস্ট্রিকরণ কি উপায়ে সংগঠিত হয় ? )

10. Describe how the Partnership Business is dissolved.

( অংশীদারী কারবারের বিলোপ সাধন কি উপায়ে সংগঠিত হয় তাহা বর্ণনা কর । )

11. What are the advantages and disadvantages of Partnership Business ?

( অংশীদারী কারবারের সুবিধা অসুবিধাগুলি কি কি ? )

12. What do you mean by Joint Stock Company ?  
What are its salient features ?

( যৌথমূলধনী কারবার কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য কি কি ? )

13. Describe the different of Joint Stock Company.

( বিভিন্ন ধরনের যৌথমূলধনী কারবারের বর্ণনা দাও । )

14. Distinguish between a Private Limited Company and a Public Limited Company or between Partnership Business and Joint Stock Company.

( সাধারণ যৌথমূলধনী কারবার ও পরিমিত মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । )

অথবা

অংশীদারী কারবার ও যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । )

15. Write short notes on: (a) Memorandum of Association, (b) Articles of Association, (c) Prospectus.

( নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) স্মারকলিপি (খ) পরিষদ নিয়মাবলী (গ) বিবরণ পত্র । )

16. Distinguish between Memorandum of Association and Articles of Association.

( স্মারকলিপি ও পরিষদ নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । )

17. Point out the different sources from which a Joint Stock Company usually raises its capital.

( যৌথমূলধনী কারবার সাধারণত যে সকল বিভিন্ন সূত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করে তাহাদের উল্লেখ কর । )

18. Describe in short the different classes of Capital of a Joint Stock Company.

( যৌথমূলধনী কারবারের বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। )

19. Describe the different types of Shares of a Joint Stock Company.

( যৌথমূলধনী কারবারের বিভিন্ন ধরনের শেয়ারের বর্ণনা দাও। )

20. What do you understand by Debenture of a Joint Stock Company? What are the points of difference between a share and a debenture?

( কোম্পানীর ঋণ-পত্র কাহাকে বলে? কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণ-পত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? )

21. Who can be appointed Director of a Company? What are the rights and duties of Directors?

( পরিচালক নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে? পরিচালকের অধিকার ও কর্তব্য কি কি? )

22. What do you know about Managing Agents? What are their functions?

( পরিচালন প্রতিনিধি সম্পর্কে কি জান? ইহাদের কার্যাবলী কি? )

23. Point out the drawbacks of the Managing Agent system in India.

( ভারতে পরিচালন-প্রতিনিধির ত্রুটির উল্লেখ কর। )

24. Write short notes on: (a) Annual General Meeting, (b) Statutory Meeting, (c) Under writer, (d) Proxy, (e) Special Resolution.

( নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা, (খ) বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক সভা, (গ) দারগ্রাহক, (ঘ) ভোটপ্রতিনিধি, (ঙ) বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব। )

25. What do you understand by Co-operative Society? What are its salient features?

( সমবায় সমিতি কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? )

26. What is a State Enterprise? What do you know about State Enterprise in India?

( রাষ্ট্রীয় কারবার কাহাকে বলে? ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবার সম্পর্কে কি জান? )

## অষ্টম অধ্যায়

### কারখানা ও অফিস সংগঠন

#### (Factory and office Organisation)

বর্তমানে বহুল উৎপাদন, শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ ইত্যাদির জ্ঞান সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং নৈপুণ্য ও দক্ষতাসহিত উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে হইলে যে স্থানে পণ্য উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ কারখানা (factory) তাহাকে সুসংহতভাবে গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে সমস্ত কারখানা সংগঠনকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বিভাগের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করিয়া সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারই উন্নতি বিধান করা হয়। প্রত্যেক কারখানায় কয়টা বিভাগ থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট করা যায় না। যে উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করা হয় তাহার উপরই কারখানার বিভাগীকরণ নির্ভর করে। অবশু সাধারণভাবে প্রত্যেক কারখানায় নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দখা যায়।

#### (১) ক্রয় বিভাগ : (Purchase Department) :

উৎপাদনের জ্ঞান প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করাই এই বিভাগের কাজ। কারখানার অন্যান্য বিভাগে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহাও এই বিভাগের মারফৎ ক্রয় করা হইয়া থাকে। দ্রব্যের বাজার মূল্য ও দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা এই বিভাগ পরিচালিত হয় বলিয়া সমস্ত ক্রয় ব্যবস্থাই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়।

#### (২) মজুদ বা ভাণ্ডার বিভাগ (Stores Department)

উৎপাদনের জ্ঞান যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইয়া থাকে তাহা এবং উৎপাদিত দ্রব্য মজুদ রাখা এই বিভাগের কার্য। মজুদ দ্রব্যের যেন অপচয় না হয় এবং তাহা যেন সুরক্ষিত থাকে সেই দিকে এই বিভাগ লক্ষ্য রাখে। এই বিভাগ হইতেই কারখানার অন্যান্য বিভাগে প্রয়োজন মত দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামগ্রী যেন মজুদ করা না হয়, মজুদ হ্রাস পাইলে তাহা যথাশীঘ্র পূরণ করা ইত্যাদি বিষয়েও এই বিভাগেই চরম।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

### (৩) উৎপাদন-বিভাগ (Production Department) :

প্রকৃত দ্রব্য-উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য এই বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কারখানার বিভাগগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। উৎপাদন-পরিকল্পনা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, উৎপাদনের পড়তা ব্যয় (costing) ইত্যাদি উৎপাদন সংক্রান্ত নানা প্রকার কার্যের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর অর্পিত হয়।

### (৪) বিক্রয়-বিভাগ (Sales Department) :

উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিক বিক্রয় ব্যবস্থা করাই এই বিভাগের কাজ। যথাযথ মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য বাহাতে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা যায় এই বিভাগ তাহার চেষ্টা করে।

ক্রয়-বিভাগের মত বিক্রয় বিভাগও বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও নিপুণ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া বিক্রীত দ্রব্য প্রেরণ-করা, দ্রব্যের প্যাকিং বা মোড়াই করা প্রভৃতি কাজও সাধারণত এই বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কোথাও কোথাও এই সকল কাজের জন্য আলাদা বিলি বিভাগ (Despatch Department) গঠন করা হয়।

### (৫) প্রচার-বিভাগ (Publicity Department)

বর্তমানকালে কোন দ্রব্যের গুণাগুণ, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারের দ্বারা ক্রেতা সাধারণের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে না পারলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব নয়। এই কারণে প্রচার-বিভাগ গঠন করা হইয়া থাকে। এই বিভাগের অভিজ্ঞ পরিচালকগণ বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে ও হ্রতন হ্রতন চাহিদা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে।

### (৬) অফিস (Office)

কারখানার বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, কারখানার বাহিরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, হিসাবপত্র, অর্থসংস্থান চিঠি-পত্রের আদান প্রদান, কর্মচারী নিয়োগ, সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কার্য এই বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

কারখানার বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করিতে

## স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসে উৎসবের কার্যে সাক্ষ্য অর্জন করা যায় না। কারখানায় অফিসে এই দায়িত্ব পালন করে।

### অফিস সংগঠন : (Office Organisation) :

অফিসকে আধুনিক কারবারের আয়ুর্কেত্র বলা চলে। বর্তমানে কারবারী সংগঠনে যে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিচ্ছে তাহাতে সুসংগঠিত অফিসের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। অফিস-সংগঠনটি কিরূপ হইবে তাহা কারবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

কারবারের আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয় তাহা হইলে মালিকের পক্ষে কারবারের বিভিন্ন বিভাগ স্বয়ং তদারক করা সম্ভব। সুতরাং সে ক্ষেত্রে কারবারের অফিস সংগঠনেও বিশেষ কোন জটিলতা থাকে না। কিন্তু বৃহদায়তন কারবারী-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। বৃহদায়তন কারবারের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের নানা জটিলতা দেখা দেয়। সুতরাং অফিসের কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য অফিসটিকেও তখন নানা বিভাগে বিভক্ত করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে। অফিসের সংগঠনটি কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে অফিসের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর উপর। তবে প্রত্যেক অফিস সংগঠন সম্পর্কেই কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন—

(১) অফিসকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগকে একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিয়ন্ত্রাধীন করা হয়।

(২) বিভাগীয় কর্মচারীগণের প্রত্যেকের কাজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৩) বিভাগীয় কর্মচারীগণের বসিবার ও দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির দ্বারা অফিসঘর সুসজ্জিত করা প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে ইহাতে যেন অফিস-ঘরে চলাফেরার কোন অসুবিধা না হয়।

(৪) অফিসের গোপনীয় তথ্যাদি বাহ্যে প্রকাশ হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ কর্মচারীগণের পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৫) অফিসের অর্থ, শ্রম এবং সময় সংক্ষেপের জন্য অথচ নিতুলভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য বহু আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ প্রয়োজন।

(৬) অফিসঘরে বাহ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে জরুরি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

**অফিসের বিভিন্ন বিভাগ (Different departments of office) :**

বর্তমান কারবারের নানাপ্রকার জটিলতার মধ্যে শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে আধুনিক অফিসকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কারবারের প্রকৃতির উপর অফিসের বিভাগীকরণ বিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে। তবে প্রত্যেক অফিসেই সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখা যায় :—

(১) ক্যাশ বিভাগ (Cash Department) :

কারবারের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন এই বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ক্যাশিয়ার। তাঁহার দ্বারের সুবিধার জন্য তাঁহার সহকারীও নিযুক্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়া কারবারের ছোট-খাটো ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ক্যাশিয়ারের অধীনে petty Cashier নিযুক্ত হইতে পারে।

(২) হিসাব রক্ষণ বিভাগ (Accounts Department) :

কারবারের যাবতীয় হিসাবপত্র প্রস্তুত করা, পরীক্ষা করা ও রক্ষা করা এই বিভাগের কার্য। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা হইলেন হিসাব রক্ষক বা একাউন্ট্যান্ট। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন কর্মচারী এই বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

(৩) স্টেশনারী বিভাগ (Stationery Department) :

অফিসের অন্যান্য সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল, কালি ইত্যাদি এই বিভাগের দ্বারা মজুদ করা এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

(৪) চিঠিপত্রের আদান প্রদান বিভাগ (Correspondence Department)

কারবারের যাবতীয় চিঠিপত্র রচনা ও আদান প্রদানের দায়িত্ব এই বিভাগ বহন করে। বৃহদায়তন অফিসে কাজের সুবিধার জন্য এই বিভাগের অধীনে চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণ (Receipt and despatch section) নামক একটি উপ-বিভাগও খোলা হয়।

(৫) পরিচালন বিভাগ (Establishment Section) :

অফিসের আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার দায়িত্ব এই বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়। অফিস কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, ছাটি, অবসর

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

গ্রহণ, কর্মচ্যুতি, চাকুরি কালের বিবরণ, বেতনের বিল প্রস্তুত করা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য এই বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় এস্টাব্লিশমেন্ট অফিসার।

অনেক সময় অফিসের আয়তন খুব বড় হইলে কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্মচারী বিভাগ (Personnel Department) নামে একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয় এবং একজন পৃথক ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তার অধীনে ইহা পরিচালিত হয়। অগ্রদ্বার পরিচালন বিভাগই (Establishment Section) এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

অফিসের উপযুক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে আরও বিভাগ খোলা যাইতে পারে।

### অফিসের নিম্নম মাসিক কার্যাবলী :

আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিব যে একটি আধুনিক অফিসে প্রত্যহ বহু সংখ্যক চিঠিপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। বাহির হইতে যে সকল চিঠিপত্র অফিসে আসে তাহাতে বর্ণিত বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর কারবারের সাফল্য ও সুনাম অনেকাংশে নির্ভর করে। এই কারণে অফিসের নিম্নম মাসিক কার্যাবলীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সংক্রান্ত কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

অফিসে বাহির হইতে কোন একটি পত্র প্রাপ্তির পর তাহার উপর পর্যায়ক্রমে যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

### পত্র-গ্রহণ বিভাগ :

(১) প্রথমত পত্রটি পত্র-গ্রহণ বিভাগে (Receiving Section) আসিয়া সেই পত্রটি খুলিয়া এই বিভাগ ইহার উপর প্রাপ্তির তারিখ, ক্রমিক সংখ্যা এবং অফিসের কোন বিভাগে ইহা প্রেরণ করা হইবে তাহা লিপিবদ্ধ করে। তাহার পর একটি বিবরণ পুস্তকে পত্র প্রাপ্তির তারিখ, ক্রমিক সংখ্যা, প্রেরিত পত্রের সূচক সংখ্যা ও তারিখ, পত্র প্রেরকের নাম ঠিকানা ও পত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা হয়—যাহাতে ভবিষ্যতে এই পুস্তক হইতেই কোন পত্রের বিষয় জানিবার সুবিধা হয়। বিবরণ পুস্তকে ইহার পর পত্রটি নির্দিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

বিবরণ পুস্তকের একটা সাধারণ নমুনা দেওয়া হইল।

### বিবরণ পুস্তক ( Inward Letter Register )

প্রাপ্তির তারিখ ( Date of Receipt )	ক্রমিক সংখ্যা ( Inward.No. )	প্রেরিত পত্রের সূচক সংখ্যা ( Letter No. )	প্রেরকের নাম ও ঠিকানা ( Senders Name and Address )	বিষয়বস্তু ( Contents )	মন্তব্য ( Remarks )

প্রয়োজন হইলে বিবরণ পুস্তকে অন্তান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন উপায়ে চিঠি পত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ডাকযোগে চিঠিপত্র আসিলে ডাকপিওন তাহা বিলি করে। আবার ডাকবিভাগ হইতে সরাসরি চিঠিপত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও করা যায়। বাৎসরিক ২৫৮ টাকা ভাড়া দিয়া ডাকবিভাগে একটি পোষ্ট-বক্স ভাড়া নেওয়া হয়। ঐ বক্সের একটি নম্বর দেওয়া থাকে। প্রত্যেক চিঠিতে ঐ নম্বর লেখা থাকে এবং ডাকবিভাগ হইতে ঐ বাক্সে চিঠি-পত্র জমা দেওয়া হয়। অফিস হইতে পিওন আসিয়া প্রত্যহ ঐ বাক্স হইতে চিঠি-পত্র সংগ্রহ করে।

পত্র প্রেরণ বিভাগ অথবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করিবার সময় প্রয়োজন হইলে অন্তান্ত আনুষঙ্গিক চলিলপত্রও মূল পত্রটির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়।

(২) পত্রটি নির্দিষ্ট বিভাগে প্রেরিত হইলে সেই বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পত্রোত্তরের খসড়া রচনা করিয়া তাহা বিভাগীয় অফিসারের নিকট দাখিল করিবে। বিভাগীয় অফিসার প্রয়োজন বোধে খসড়ার সংশোধন করিয়া অথবা সংশোধন না করিয়াই তাহাতে সহি করিয়া দিলে উহা টাইপ করিবার জন্য টাইপিং সেকশানে প্রেরণ করা হয়।



অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্মচারীর নির্দেশ ব্যতীত বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে পত্রোত্তর রচনা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মচারীরা সর্বদা নানারূপ জরুরী কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেকটি পত্র সম্পূর্ণ পাঠ করা সম্ভব হয় না। তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য সাধারণ কর্মচারীগণ পত্রের সারসর্ম্ম (Precis) রচনা করিয়া তাহা উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট পেশা করে।

সারসর্ম্ম পত্রের মূল বিষয়টি অতি যত্নের সহিত লিখিত হয় যাহাতে উর্ধ্বতন কর্মচারীর পক্ষে উহা পাঠ করিয়া যথাযথ নির্দেশ দিতে বা পত্রের উত্তর রচনা করিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে কোন পত্রে লিখিত বিষয়ের সঙ্গে পত্র-প্রাপ্তির পূর্বে সংগঠিত এক বা একাধিক বিষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান। এইরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পর্য রক্ষা করিয়া অফিস-নোট (Office note) রচনা করিয়া তাহা উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। উর্ধ্বতন কর্মচারী তাহা পাঠ করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া থাকেন।

### (৩) পত্র-প্রেরণ বিভাগ :

পত্রোত্তর টাইপ করা হইলে তাহা উপযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া পত্র প্রেরণ বিভাগে (Despatch Section) আসে। ঐ বিভাগে হইতে তাহা উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করা হয়। অবশ্য এই বিভাগ হইতে যে কেবলমাত্র জবাবী পত্রই বাহিরে প্রেরণ করা হয় তাহা নহে, অন্যান্য সকল পত্রই বাহিরে প্রেরণ করিবার কার্য এই বিভাগ সম্পাদন করে। বাহিরে পত্র-প্রেরণ করিবার পূর্বে তাহা পত্র-বহির্গমন পুস্তকে (Outward Letter Register) লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এই পুস্তকের নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

পত্র ডাকযোগে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে প্রথমত মূল পত্রটি ও তাহার সঙ্গে আবশ্যিক অন্যান্য কোন কাগজপত্র পাঠাইতে হইলে সেই সকল এক সঙ্গে বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। তাহার পর পত্রটি খাষে ভরিয়া খামের উপর ঠিকানা লিখিয়া ও উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগাইয়া ডাক বাক্সে ফেলিতে হয়। অনেক সময় খামের উপর ডাকটিকিট না লাগাইয়া তাহার উপর বিভিন্ন মূল্যের টিকিটের ছাপ দিয়াও তাহা ডাকে পাঠান হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ছাপ দেওয়া হয় তাহাকে বলে 'ফ্রাঙ্কিং মেশিন' (Franking Machine)। এইরূপ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য অর্থের বিনিময়ে ডাকবিভাগ হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। চিঠি প্রেরণ

করিতে যত মূল্যের ডাকটিকিট ব্যবহৃত হয় তাহার একটি :হিসাব এই বিভাগ রক্ষা করে। অনেক সময় সুযোগ থাকিলে ডাকে পত্র প্রেরণ না করিয়া অফিসের পিওনের মারফৎ হাতে হাতে চিঠি বিলি করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে।

পত্র বহির্গমন পুস্তক  
Outward Letter Register

তারিখ (Date)	পত্রের সূচক সংখ্যা (Number)	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা (Name and Address of the person to whom sent)	বিষয়বস্তু (Content)	পত্র বিলির উপায় (Method of Delivery)

(৪) নথিকরণ বিভাগ ( Filing Department )

জবাবী পত্রের সাধারণত দুইটি করিয়া কপি (Copy) টাইপ করা হয়। একটি বাহিরে প্রেরণ করা হয়। আর একটি কপি অফিসে রাখা হয়। এই কপিটিকে বলা হয় অফিস কপি ( Office Copy ), বাহিরে পত্র প্রেরণ করিবার পর এই অফিস-কপি ও তাহার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র শৃংখলার সঙ্গে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নথিকরণ বিভাগে ( Filing Section ) প্রেরণ করা হয়।

এই বিভাগে যে কেবল জবাবী পত্রেরই নথিকরণ হয় তাহা নহে। অধিকন্তু প্রত্যহ যে সকল পত্রাদি আসে অথবা অফিস হইতে যে সকল পত্র বাহিরে প্রেরণ করা হয়, অফিসের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দলিল ও কাগজ-পত্র, নানাপ্রকার রিপোর্ট, রেকর্ড ইত্যাদির সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বও নথিকরণ-বিভাগের উপর স্তম্ভ। এইভাবে কাগজ-পত্রাদির নথিকরণ

কোন নম্বরে বসানো হয়। কালক্রমিক পদ্ধতির মধ্যে তাহা পাওয়া যাবে।

(১) কালক্রমিক পদ্ধতি ( Chronological Order ) :

কালক্রমিক পদ্ধতি বিভিন্ন উপায়ে নথিবদ্ধ করা যায়। যথা—

(১) আক্ষরিক অক্ষরানুসারী ( Alphabetical Order ) :

এই প্রথা অনুসারে কোন ব্যক্তি, স্থান, বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের নামের আক্ষরিক অক্ষরানুসারী কালক্রমিক পদ্ধতি নথিবদ্ধ করা হয়। ইহাতে অক্ষরানুসারী এই যে, একই আক্ষরিক বস্তু নামের বহু ব্যক্তি, স্থান, বিষয় বা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। ফলে, প্রয়োজনীয় কালক্রমিক বাহির করিতে সময় বেশি লাগে। ফলে সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়।

(২) ক্রমিক সংখ্যা অনুসারী ( Numerical Order ) :

এই প্রথা অনুসারে কালক্রমিক পদ্ধতি ক্রমিক সংখ্যার ছাপ দিয়া তাহা তদনুসারী নথিবদ্ধ করা হয়। কোন নম্বরে কি বিষয়-বস্তুর কালক্রমিক পদ্ধতি পাওয়া যাইবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

(৩) বিষয়বস্তু অনুসারী ( Subject Classification ) :

এই প্রণালীতে বিষয়বস্তু অনুসারে কালক্রমিক পদ্ধতি পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং তদনুসারী নথিবদ্ধ করা হয়।

(৪) ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারী ( Geographical Division ) :

ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারী কালক্রমিক পদ্ধতি নথিবদ্ধ করা যায়। যে অঞ্চলে কালক্রমিক প্রেরণ করিতে হইবে অথবা যে অঞ্চল হইতে এই সব পাওয়া যাইবে সেই সকল অঞ্চলের নামানুসারে ও কালক্রমিক পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ দিয়া তাহা নথিবদ্ধ করা হয়।

(৫) কালক্রম অনুসারী ( Chronological Order ) :

কালক্রম অনুসারী ও কালক্রমিক পদ্ধতি নথিবদ্ধ করা যায়। সাধারণত বিল (Bill), ভাউচার (Voucher), অর্ডার (Order) ইত্যাদি এই প্রণালী নথিবদ্ধ করা হয়।

সংযোগ ব্যবস্থা ( Communications ) :

চিঠিপত্রের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন নৈক সময়সাপেক্ষ বলিয়া দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান বা লিপিবদ্ধ করিবার

উদ্দেশ্যে অকস্মে আনাগোনার ব্যতিক্রম উপার অবলম্বন করা হইয়া থাকে। নিচে এইরূপ কয়েকটি উপায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) টেলিফোন (Telephone) :—জ্ঞাত সংবাদ আদান প্রদানের জন্ত এই যন্ত্রটির স্বর্ভাবমানে ব্যাপক ব্যবহার হইতেছে। ইহার দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলের কোন ব্যক্তির সঙ্গেও সহজ যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। ইহাতে সময় সঞ্চয় হয়। আবার কোন সংবাদের গোপনীয়তাও রক্ষা করা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে কোন ব্যক্তির সঙ্গে ট্রাক-টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা যায়। যেমন কলিকাতা ও মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের মধ্যে ট্রাক-টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

(২) টেলিগ্রাফার (Teleprinter) :

দূর দেশ-বিদেশের সংবাদাদির টাইপ করা প্রতিলিপি সাহায্যে অকস্মে বলিয়াই পাওয়া যায় তাহার জন্ত এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। সংবাদ-পত্র অকস্মে, ঠিক বাজারে, ব্যাক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে জন্ত এই যন্ত্রটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

(৩) টেলিগ্রাম (Telegram) :

ব্যক্তিগত মৌখিক সংযোগ স্থাপন না করিয়াও জ্ঞাত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্ত ‘তার’ যোগে তাহা প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ‘তার’ যোগে সংবাদ প্রেরণ ব্যয় সাপেক্ষ, এই জন্ত এই ব্যবস্থায় সংবাদ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রেরণ করা হয়।

(৪) কেবলগ্রাম (Cablegram) :

‘তার’ যোগে যখন বিদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করা হয় তাহাকে বলে কেবলগ্রাম। যেমন ইহার সাহায্যে কলিকাতা-নিউইয়র্ক, কলিকাতা-লণ্ডন প্রভৃতির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়।

(৫) রেডিও গ্রাম (Radiogram) :

অতি জ্ঞাত সংবাদ আদান প্রদানের জন্ত বেতার বিভাগের সাহায্যে রেডিওগ্রাম বা বেতারে সংবাদ লেনদেনের ব্যবস্থা করা যায়।

(৬) সাক্ষেতিক শব্দ (Codes) :

টেলিগ্রাম বা কেবলগ্রামে সংবাদ প্রেরণের ব্যয় হ্রাসের জন্ত এবং কোন সংবাদের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক সময় সাক্ষেতিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাক্ষেতিক শব্দের বিশেষ অর্থ নির্দেশ করা

হইয়া থাকে। অবশ্য সংবাদ প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের এই সব সাক্ষাতিক শব্দের শুষ্ক অর্থ জানা না থাকিলে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না।

### (১) ফোনোগ্রাম (Phonogram) :

তারযোগে (Telegram) সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত সংবাদটি লিখিয়া তার-বিভাগে পাঠাইতে হয়। অনেক সময় এই ভাবে সংবাদ লিখিয়া তারবিভাগে পাঠাইবার পরিবর্তে টেলিফোনে তারবিভাগকে সংবাদটি জানাইয়া দেওয়া হয়, তারবিভাগ সেই সংবাদটি টেলিগ্রামে প্রেরণ করে। এইরূপে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে অতিরিক্ত 'কল চার্জ' দিতে হয়। অর্থাৎ টেলিগ্রামের খরচ ব্যতীত টেলিফোনে সংবাদটি তারবিভাগে পাঠাইবার ক্ষত্তও মাশুল দিতে হয়।

### অফিসে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি :

আধুনিক অফিসে শ্রম, সময় ও অর্থ-সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এখন নানাপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিতুল ভাবে অধিক পরিমাণ কার্য সম্পাদন করা যায়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :—

### (১) টাইপ রাইটার (Typewriter) :

এই যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে অধিক সংখ্যার চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করা যায়। বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক অফিসে এই যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত।

### (২) ডুপ্লিকেটর (Duplicator) :

এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল, রেখাচিত্র, নকশা প্রভৃতির প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যায়।

### (৩) কটোস্ট্যাট (Photostat) :

এই যন্ত্রের সাহায্যে চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদির ইচ্ছামত প্রতিক্ষাণ গ্রহণ করা যায়।

### (৪) ডিক্টাফোন (Dictaphone) :

উর্ধ্বতন কর্মচারীরা চিঠিপত্রের জবাব বা কোন নির্দেশ এই যন্ত্রের দ্বারা অবসর সময়ে বা সুযোগমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। পরে নিম্নতন কর্মচারীরা ইহা গ্রামোফোনের দ্বারা বাজাইয়া সেই নির্দেশ জানিয়া লইয়া কার্যকর্য সম্পাদন করিতে পারে অথবা কোন পত্রের জবাব টাইপ করিয়া

(৫) স্পিকোফোন (Speakophone) :

বৃহদাধুন অফিসে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপনের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

(৬) টেলিপ্রিন্টার (Teleprinter) :

এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী অঞ্চল হইতে প্রেরিত সংবাদাদির টাইপ করা প্রতিলিপি সঙ্গে সঙ্গে অফিসে বসিয়াই পাওয়া যায়। বর্তমানকালের বহু বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানে এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার চলিতেছে। সংবাদপত্র অফিস, শেষার বাজারের অফিস প্রভৃতিতে এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

(৭) ফ্র্যাঙ্কিং মেশিন (Franking Machine) :

এই যন্ত্রের দ্বারা খামের উপর যথাযোগ্য মূল্যের ডাকটিকিটের ছাপ মুদ্রিত করা যায়। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে পূর্বে ডাকবিভাগ হইতে লাইসেন্স করাইয়া লইতে হয়।

(৮) এ্যাড্রেসিং মেশিন (Addressing Machine) :

বড় বড় অফিস হইতে প্রত্যাহ বহু সংখ্যক চিঠি বাহিরে প্রেরিত হয়। কোন ব্যক্তির দ্বারা এই সকল চিঠির উপর ঠিকানা লিখাইতে হইলে অনেক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন। এই সময় ও শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে ঠিকানা লিখবার জন্য এ্যাড্রেসিং মেশিন ব্যবহৃত হয়।

(৯) একাউন্টিং মেশিন (Accounting Machine) :

এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিতুল হিসাব পত্র প্রস্তুত করা যায়। ইহার দ্বারা বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিতুল ভাবে করা যায়।

(১০) টাইম রেকর্ডিং মেশিন (Time Recording Machine) :

সময় অমুদায়ী মজুরী দিবার ব্যবস্থা থাকলে কর্মচারীদের কার্যরত ও কার্যবিবর্তিত সময় নিতুলভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত সময়ের নিতুল হিসাব রাখা যায়।

উপর্যুক্ত যন্ত্রগুলি ছাড়াও প্রয়োজন বোধে আরও নানাপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে সময় ও শ্রমের লাভ করা সম্ভব। নিতুলভাবে কোন কার্য সম্পাদন করিতেও এই যন্ত্রের বিশেষ উপযোগী।

### ব্যবসায়-বাণিজ্যে ডাকবিভাগের স্থান ও গুরুত্ব :

বর্তমান ক্ষণতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ডাকঘরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত (১) সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, (২) পণ্য বিলির ব্যবস্থা করিয়া, এবং (৩) পণ্য মূল্য পরিশোধের সুযোগ দান করিয়া ডাকঘর ব্যবসায়-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। ডাক বিভাগ মারফৎ চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, কেবলগ্রাম ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া সংযোগ রক্ষা করা যায়, কোন কোন পণ্য পার্শ্বল করিয়া প্রাপকের নিকট বিলি করার ব্যবস্থা করা যায়। মণি-অর্ডার করিয়া পণ্য-মূল্য পরিশোধেরও ব্যবস্থা করা যায়।

উপবিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রে ডাক-বিভাগের মাধ্যমে কিভাবে কাৰ্য সম্পাদিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) সাধারণত চিঠি পত্র পোষ্টকার্ড, অন্তর্দেশীয় পত্র বা খামে প্রেরণ করা হয়। পোষ্টকার্ড অথবা অন্তর্দেশীয় পত্র ডাকঘর হইতে ক্রয় করা হয় এবং তাহার উপরই পত্র লিখিতে হয়। খামে চিঠি লিখিতে হইলে প্রথমত অন্ত কান্ডে পত্র লিখিয়া তাহা খামে ভরিয়া খাম বন্ধ করিতে হয়। উপযুক্ত মূল্যের খামও ডাকঘরে বিক্রয় করা যায়। আবার ডাকঘর হইতে উপযুক্ত মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া সাদা খামের উপর তাহা আঁটিয়া দেওয়া যায়। পোষ্টকার্ড, অন্তর্দেশীয় পত্র বা খাম সব কয়টি ডাকবিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিতে হয়। ডাকঘরে অথবা শহরের বিভিন্ন স্থানে পোষ্ট বক্স থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে ডাকপাওন এই সকল বাক্স হইতে পত্রসংগ্রহ করিয়া থাকে। সাধারণ চিঠিপত্র উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট যুক্ত করিয়া পোষ্ট বাক্সে ফেলিয়া দিলেই হয়। সাধারণ চিঠিই জরুরী বিলি করিবার প্রয়োজন হইলে সেই চিঠির গায়ে এক্সপ্রেস ডেলিভারি (Express Delivery) এইরূপ লিখিয়া দিতে হয় অথবা ঐরূপ লেবল আঁটিয়া দিতে হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত ডাকটিকিট যুক্ত করিতে হয়।

চিঠি রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠাইতে হইলে খামের উপর রেজিস্ট্রিকৃত (Registered) এইরূপ লিখিতে হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত ডাকটিকিট লাগে। এইরূপ চিঠি ডাকঘরের নির্দিষ্ট কাউন্টারে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট প্রদান করা রসিদ লইতে হয়। আবার প্রাপকের রসিদ পাইতে হইলে প্রাপ্তি প্রমাণ পত্র (Acknowledgement Due) খামের সহিত বাধিয়া দিতে হয়।

কতগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট পত্র, যেমন সংবাদ পত্র, যে কোন মুদ্রিত বিষয়, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি বুক-পোস্টেও প্রেরণ করা যায়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ডাকটিকিট লাগে।

বুকপোস্টে কিছু পাঠাইতে হইলে কোনরূপ মুখবন্ধ মোড়কে ইহা পাঠান চলিবে না। ইহা এমন ভাবে মোড়াই করিতে হইবে-যাহাতে সীল নষ্ট না করিয়া মোড়কের ভিতরের বস্তু প্রয়োজন হইলে পরীক্ষা করা যায়।

ডাকবিভাগের মারফৎ তারবার্তা প্রেরণ করিয়া সংবাদ আদান প্রদান করা যায়। তারবার্তা প্রেরণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করিতে হয়। ঐ ফর্মে প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখিয়া ব্যক্তব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হয় এবং প্রেরকের সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা ও লিখিতে হয়। ঐ ফর্ম যথাযোগ্য ভাবে ভর্তি করিয়া ডাকবিভাগের নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিলে তারবার্তায় লিখিত শব্দ সংখ্যা অনুযায়ী কত ডাকটিকিট প্রয়োজন হইবে তাহা জানিতে পারা যায়। তাহার পর উপযুক্ত ডাক টিকিট ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে লাগাইয়া পুণরায় উহা জমা দিলে তাহার পরিবর্তে রসিদ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র সংবাদ প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত মাশুল দিয়া জরুরী তারবার্তা (Express Telegram) পাঠান যায়।

(১) ডাকবিভাগের মাধ্যমে কোন কোন পণ্যও প্রেরণা করা যায় এবং এইরূপে পণ্য প্রেরণ করিতে হইলে পার্সেল করিয়া প্রেরণ করিতে হয়। পার্সেলে কোন পণ্য প্রেরণ করিতে হইলে তাহা প্রথমত মোড়াই করিতে হয় এবং ডাকঘরে তাহা ওজন করিয়া ওজন অনুযায়ী ডাকটিকিট লাগাইয়া তাহা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট জমা করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে রসিদ লইতে হয়।

অনেক ব্যবসায়ী ডাকযোগে পণ্য প্রেরণ করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের মূল্য ও ডাক মারফৎ আদায় করিবার ব্যবস্থা করে। সেইরূপ ক্ষেত্রে পার্সেলটিকে সংক্ষেপে V. R. P (Value Payable Post) বলা হয়। পণ্য বিলি করিয়া প্রাপকের নিকট হইতে পণ্য মূল্যের অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং ডাকবিভাগই তাহা মণি-অর্ডার করিয়া পণ্য প্রেরকের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এইজন্য একটি মণি-অর্ডার ফর্মও যথাযোগ্যভাবে লিখিয়া উক্ত পার্সেলের সঙ্গে জমা দিতে হয়।

(৩) ডাকযোগে অর্থও প্রেরণ করা যায়। মণি-অর্ডার করিয়া তাহা পাঠান হয়। ইহার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করিতে হয়। সেই ফর্মে প্রেরকের



ও প্রাপকের নাম ঠিকানা, অঙ্কে ও শব্দে অর্থের পরিমাণ যথাযথভাবে লিখিয়া অর্থের পরিমাণ অস্থায়ী নির্দিষ্ট মাণ্ডল সহ ডাকঘরের নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিলে রসিদ দেওয়া হয়। সত্তর অর্থ প্রেরণ প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত মাণ্ডল দিয়া তারযোগে মণি-অর্ডার T. M. O. করা যায়।

অনেক সময় ডাকঘর হইতে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে পোষ্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়া তাহা প্রাপকের নিকট পাঠান হয়। প্রাপক তাহা স্থানীয় ডাকঘরের ভান্ডাইয়া উল্লিখিত টাকা পায়।

চিঠিপত্র, পার্সেল বা মণি-অর্ডার করিতে হইলে যে পরিমাণ ডাকটিকিট বা মাণ্ডল দিতে হয় তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল—

#### সাধারণ খাম

- (১) ২½ তোলা পর্ষস্ত ওজনের খামের জন্য ১৫ নম্বা পয়সা  
অতিরিক্ত প্রতি ২½ তোলা বা তাহার

উন্নয়নের জন্য

#### (২) আন্তর্দেশীয় পত্র :

- (ইহা ডাকঘর হইতেই ক্রয় করিতে হয় ১০ "   
খামের মতন ইহার মদ্যে অল্প কিছু প্রেরণ করা যায় না)

#### (৩) পোষ্টকার্ড

- একক পোষ্টকার্ডের জন্য ৫ "   
জবাবী পোষ্টকার্ডের জন্য ১০ "   
স্থানীয় একক পোষ্টকার্ডের জন্য ৩ "   
স্থানীয় জবাবী পোষ্টকার্ডের জন্য ৬ "

#### (৪) চিঠিপত্রের জরুরী বিলির ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত ১৫ "

#### (৫) বুক-পোষ্ট

- ২৫ গ্রাম পর্ষস্ত ৮ নম্বা পয়সা   
অতিরিক্ত প্রতি ২৫ গ্রাম অথবা তাহার উন্নয়ন ৩ "

#### (৬) পার্সেল

- ৪০ গ্রাম পর্ষস্ত ৫০ নম্বা পয়সা   
অতিরিক্ত প্রতি ৫০ গ্রাম বা তাহার উন্নয়ন ৫০ "

#### (৭) রেজিস্ট্রেশন

অতিরিক্ত ৫০ নম্বা পয়সা

#### (৮) মণি-অর্ডার

- ১০৮ টাকা পর্যন্ত

অতিরিক্ত প্রতি ১০৮ টাকা বা	
তাহার ভগ্নাংশের জন্য	১৫ ”
(২) অন্তর্দেশীয় তারবার্তা	
প্রথম ৮টি শব্দের জন্য	৮০ নয়া পয়সা
অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য	৮ ” ”
এক্সপ্রেস তারবার্তায় প্রথম ৮টি শব্দের জন্য	১’৬০ ” ”
” ” অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য	১৬ ” ”

### বাণিজ্যিক পত্র রচনা

#### ( Commercial Correspondence )

বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে চিঠিপত্রের দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান বা সংযোগ রক্ষা করিতে না পারিলে স্বেচ্ছাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে বাণিজ্যিক পত্র রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যথাযথভাবে বাণিজ্যিক পত্র-লিখনের উপর ব্যবসায়িক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

ব্যক্তিগত পত্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক পত্রের কিছু পার্থক্য আছে। বাণিজ্যিক পত্র রচনা করিবাব সময় যে সকল বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয় নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল।

(১) **সুস্পষ্টতা** : বাণিজ্যিক পত্র এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে পত্রের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। পত্র প্রাপক যেন ইহার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন স্তরাং শব্দ নির্বাচনের সময় দেখিতে হইবে যেন তাহা দ্ব্যর্থবোধক না হয় অথবা বাক্যটি যেন জটিল আকার ধারণ না করে। ভাষা সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য দেখা যায় কোন বিষয় সম্পর্কে পত্র লেখকের ধারণা যদি সুস্পষ্ট হয় তাহা হইলে পত্রটিতে স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্টতা আসে। স্তরাং পত্র লিখিবাব পূর্বে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে উত্তমরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন।

(২) **সংক্ষিপ্ততা** : বাণিজ্যিক পত্র সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনাবশ্যক শব্দ বা বাক্য পরিহার করিতে হয়। এইরূপ পত্রে অপ্রয়োজনীয় ভাব বা ভাষা প্রকাশ করিয়া পত্র প্রাপকের সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

(৩) **সৌজন্য** : বাণিজ্যিক পত্র সৌজন্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সৌজন্য প্রকাশে কোন আধিক্য নাই। কিন্তু ইহাতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। সৌজন্যমূলক ভাষার প্রয়োগের দ্বারা, অবিলম্বে পত্রের উত্তর দান করিয়া ও আরও নানাভাবে সৌজন্য প্রকাশ করা যায়।

(৩) **প্রাসঙ্গিকতা** : এইরূপ পত্র প্রাসঙ্গিক হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যিক পত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া পত্র-প্রাপকের বিরক্তি উৎপাদন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

### বাণিজ্যিক পত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যিক পত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :—

(১) **শিরোনালিপি** : পত্রের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কারবারের স্বরূপ, টেলিফোন নম্বর, ট্রেডমার্ক, টেলিগ্রাফের কোড, এবং কোথাও কোথাও পত্রের সূচক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়। ইহার নীচে ডান দিকে পত্রের তারিখ উল্লেখ করিতে হয়।

#### প্রাপকের নাম ঠিকানা :

পত্রের অভ্যন্তরে শিরোনালিপির নীচে বামদিকে পত্র-প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখিতে হয়। কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে হইলে নামের পূর্বে, শ্রী, শ্রীযুক্ত বা শ্রীমতী লিখিতে হয়। কোন প্রতিষ্ঠানকে পত্র লিখিতে হইলে নামের পূর্বে ‘মেসার্স’ ( Messrs ) লিখিতে হয়।

#### (৩) সম্বোধন :

প্রাপকের নাম ঠিকানার নীচেই সম্বোধনসূচক, প্রিন্সিপালস্, মহাশয়, মান্নবরেন্দ্, সর্বিনয় নিবেদন, ইত্যাদি লিখিয়া সম্বোধন করিতে হয়। কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে হইলে মহাশয় অথবা সর্বিনয় নিবেদন, আর কোন প্রতিষ্ঠানকে পত্র লিখিতে হইলে কেবল মাত্র সর্বিনয় নিবেদন এইরূপ সম্বোধন করাই বাঞ্ছনীয়।

#### (৪) বিষয়বস্তু :

পত্রের এই অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় বস্তু সংক্ষেপে ও সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিতে হয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ থাকিলে পত্রের বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক অঙ্কচ্ছেদে ( প্যারা ) বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

#### (৫) বিদায় ভাষণ :

পত্রের শেষে এবং স্বাক্ষর করিবার পূর্বে নিবেদক, বিনিত, ভবদীয়, বিশ্বস্ত ইত্যাদি লিখিয়া বিদায় সম্বোধন করিতে হয়।

(৬) স্বাক্ষর :

পত্রের শেষে লেখকের স্বাক্ষর থাকে। স্বাক্ষর সকল সময়ে হাতে লিখিতে হইবে। অনেক সময় হাতে লিখিত স্বাক্ষরের নীচে লেখকের নাম আবার টাইপ করিয়া ও দেওয়া হয়। ইহার ফলে স্বাক্ষরে কোন অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না। স্বাক্ষরের কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ :—

- (১) একক মালিক শ্রীভোলানাথ সেন  
 (২) অংশীদারী কারবার সেন, রায় এণ্ড কোং  
 (৩) অংশীদারী কারবারে কোন  
 অকজন অংশীদার অপর অংশীদার  
 গণের পক্ষে সহি করিলে শ্রীশঙ্করানন্দ রায়  
সেন, রায় এণ্ড কোং-এর পক্ষে  
 (৪) যৌথ কারবার শ্রীরাধাবিনোদ চন্দ্র  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।  
 এভারগ্রীন পাবলিসার্স ( প্রাঃ ) লিঃ

অনেকসময় মূলপত্রের সঙ্গে ক্রোড়পত্র প্রেরণ করিতে হয়। মূলপত্রে স্বাক্ষরের সমান লাইনে বামদিকে ক্রোড়পত্রের উল্লেখ করিতে হয়। যেমন, ক্রোড়পত্র—১, ক্রোড়পত্র—৪ ইত্যাদি। আবার সময় সময় সংক্ষেপে ক্রোড়পত্রের পরিচয়ও দেওয়া হয়। যেমন, ক্রোড়পত্র—১ খানা বিল।

পত্র রচনা সমাপ্ত হইবার পর যদি কোন বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলে স্বাক্ষরের নীচে ‘পুনশ্চ’ লিখিয়া তাহার পর সেই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। অবশ্য বাণিজ্যিক পত্রে এইরূপে ‘পুনশ্চ’ লিখিয়া কোন বিষয়ের উল্লেখ করা যথাসাধ্য পরিহার করা কর্তব্য। কারণ, ইহাতে পত্র প্রাপকের এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে পত্র লেখক যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে পত্র-রচনা করেন নাই।

কয়েকটি বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা :

(১) প্রচার পত্র ( Circular letter ) :

নূতন কারবার প্রতিষ্ঠা, নূতন শাখা স্থাপন, নূতন পণ্য বিক্রয়, স্থান পরিবর্তন, কোন অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা কোন নূতন অংশীদার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পৃষ্ঠপোষক, সম্ভাব্য ক্রেতা বা জনসাধারণের অবগতি

জ্ঞাত যে পত্র প্রেরণ করা হয় তাহাকে প্রচারপত্র বলা হয়। প্রচার পত্রের একটি নমুনা দেওয়া হইল :

সেন ফার্মেসী

ঔষধ বিক্রেতা

১২২ নং রাসবিহারী এণ্টেন্স্য,

কলিকাতা—১২

১৪ই জুন ১৯৬২

সবিনয় নিবেদন,

বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ক্রেতা ও জনসাধারণকে অধিকতর যোগ্যতার সহিত সেবা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আগামী ১লা জুলাই হইতে হাজরা রোড ও আশুতোষ মুখার্জী রোডের সংযোগস্থলে, ৫২নং আশুতোষ মুখার্জী রোড এই ঠিকানায় একটি নতুন শাখা খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

আমাদের নতুন শাখাও অত্যন্ত অভিজ্ঞ কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। উপরন্তু আমাদের এই শাখাভবন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এবং এইস্থানে যাতায়াত ব্যবস্থারও অধিকতর স্বযোগ থাকায় আমরা বিশ্বাস করি যে আপনাদের সেবায় আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক যোগ্যতার সহিত অংশ গ্রহণ করিতে পারিব।

অগ্রগ্রহপূর্বক আমাদের নতুন শাখাভবনে একবার পদার্পণ করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

নিবেদক,

শ্রীহরিহর সেন,

মালিক।

(২) ক্রেতার আর্থিক অবস্থা ও সত্ততা সম্পর্কে গোপন অনুসন্ধান।

অনেক সময় কোন ক্রেতার সহিত নতুন ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে তাহার আর্থিক অবস্থা ও সত্ততা সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এইরূপ সংবাদ গোপন রাখা হয়।

নমুনা  
রামকৃষ্ণ রেশমালয়

১১২, রাসবিহারী এভেন্যু

কলিকাতা—১২

তারিখ ২৫/৮/৬২

ঘোষ রায় এণ্ড কোং,

উত্তর পাড়া।

সবিনয় নিবেদন,

এই পত্রের সঙ্গে যুক্ত চিরকূটে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। শুনিয়াছি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও সততা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অগ্রহণপূর্বক আমাদের জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। উক্ত সংখ্যা কত টাকার পণ্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ধারে বিক্রয় করা যায়, দয়া করিয়া তাহাও জানাইবেন।

আপনারা যে সকল তথ্যাদি জানাইবেন তাহা বিশেষ ভাবে গোপন রাখিব। প্রয়োজনে আপনাদের সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

নিবেদক,

ভোলানাথ সেনগুপ্ত,

ম্যানেজার।

(৩) গোপন অমুসন্ধান পত্রের উত্তর :

ঘোষ রায় এণ্ড কোং

উত্তর পাড়া

তারিখ ২/৯/৬২

রামকৃষ্ণ রেশমালয়,

১১২, রাস বিহারী এভেন্যু,

কলিকাতা—১২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২৫/৮/৬২ তারিখের পত্রে উল্লিখিত সেন ব্রাদার্সের সঙ্গে গত ১২ বৎসর ধরিয়া আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহাদের সহিত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে নাই।

অনেক সময় এই প্রতিষ্ঠানের নিকট আমরা ৩০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ধারে বিক্রয় করিয়াছি এবং প্রতিবারই নির্দিষ্ট সময়ে অথবা ধারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ধার পরিশোধ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানের সততা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্ধান আছে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা জানি আপনাদের জানাইলাম। অবশ্য বলা বহুল্য কোন আর্থিক লেনদেনের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমরা অক্ষম।

নিবেদক,  
শ্রীমাধব দত্ত,  
ম্যানেজার।

#### (৪) অর্ডার সম্পাদনে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র :

অর্ডার পূরণ পত্রের নমুনা চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। কোন কারণে অর্ডার পূরণ করা সম্ভব না হইলে তাহাও অর্ডার দাতাকে যথা সময়ে জানাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ পত্রের একটি নমুনা দেওয়া হইল :—

বারাণসী সিন্ধু মিউজিয়াম  
রেশম বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা

প্রাপ্ত : সিন্ধু, বারাণসী

৩১৩৪, শিবালয়,

কোন : বারাণসী ২৬

বারাণসী

স্মারক সংখ্যা সি/বি/১৩২/৬২

তারিখ ২১/২/৬২

বিষয়—রেশম কাপড় সরবরাহ

আপনাদের পত্র নং টি/২/২/৬২

তারিখ ২১/২/৬২

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের উক্ত অর্ডারপত্র যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং পত্রের জ্ঞাত আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে আপনাদের চাহিদামুত্বক বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম বস্ত্রের বিক্রয় ইদানিং অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় আমাদের হাতে সুলভ মালের পরিমাণ যথেষ্ট নাই। এই কারণে যথাযোগ্য মাল সরবরাহ করিয়া আপনাদের অর্ডার পূরণ করিতে অক্ষমতা জানাইতেছি।

আশা করি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ভবিষ্যতে আপনাদের অর্ডার পূরণ করিবার সুযোগ দিলে বাধিত হইব।

নিবেদক,  
আর, ব্রহ্মচারী,  
বিক্রয় ম্যানেজার।

### ●(৫) অর্ডার বাতিলকরণ পত্র

সময় মত মাল সরবরাহ করা না হইলে বা অন্ত কোন সঙ্গত কারণে অর্ডারদাতা অর্ডার বাতিল করিতে পারে। অর্ডার বাতিল করা হইলে তাহা পত্রযোগে যথাসময়ে জানাইয়া দিতে হয়। এইরূপ পত্রের একটি নমুনা দেওয়া হইল :—

রামকৃষ্ণ রেশমালয়,  
১১৯, রাসবিহারী এভেন্যু,  
কলিকাতা—২২  
তারিখ ২১/১০/৬২

বারাণসী সিক মিউজিয়াম,  
৩১৩৪, শিবালয়,  
বারাণসী  
সবিনয় নিবেদন,

বিষয় : রেশমবস্ত্রের অর্ডার নং ৬৪

আমাদের ৩১/১০/৬২ তারিখের ৬৪ নং অর্ডার অস্থায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল না পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উক্ত অর্ডার বাতিল করিতে বাধ্য হইলাম।

আশা করি, উল্লেখ নিম্নয়োজন যে এখন মাল সরবরাহ করা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে আমরা অক্ষম।

নিবেদক  
ভোলানাথ সেনগুপ্ত  
ম্যানেজার

### (৬) যৌথ মূলধনী কারবারের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

দি বেঙ্কল টি ট্রেডার্স লি:

২৮ নং চৌরঙ্গী রোড,  
কলিকাতা।

তারিখ—১১/১০/৬২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে কোম্পানীর তৃতীয় বারি সাধারণ সভা আগামী ১৮ই জুলাই বুধবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় কোম্পানী



রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়ে অমুদ্রিত হইবে। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইবে :—

(১) পরিচালকবর্গের রিপোর্ট, হিসাব, হিসাব পরীক্ষকদের রিপোর্ট ও কোম্পানীর ব্যালেন্স সীট।

(২) লভ্যাংশ বণ্টন।

(৩) পরিচালকবর্গ নির্বাচন

(৪) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ ও তদসংক্রান্ত বিষয়।

(৫) কোম্পানীর কার্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়।

এতদ্বারা ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে কোম্পানীর ‘ট্রান্সফার বুক’, ১১ই জুলাই হইতে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশক্রমে,  
আর, দত্ত,  
সেক্রেটারী।

ত্রি.....

( পত্রপ্রাপক শেয়ার হোল্ডারের নাম ঠিকানা )

### বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনা ( Preparation of Advertisement )

বর্তমানকালে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতাসাধারণকে কোন পণ্য সম্পর্কে উৎসাহিত করিয়া তোলা যায়। ইহাতে পণ্য জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং উহাতে বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

বিজ্ঞাপনের খসড়া বিশেষ যত্নের সঙ্গে রচনা করিতে হয়। চিত্র ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহযোগে বিজ্ঞাপনের খসড়াটি এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পণ্যের গুণ-সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্রেতাকে সম্যক অবহিত করিয়া তাহাকে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করা যায়। যেমন, একদিকে একজন ক্রান্ত ব্যক্তির চিত্র ও অল্পদিকে পাশাপাশি একজন প্রফুল্ল ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া নীচে লেখা হইলে—‘নিয়মিত ওভালটিন পানের পূর্বে ও পরে।’ নিয়মিত ওভালটিন পান করিয়া আপনার সজীবতা ফিরাইয়া আনুন।’

ব্যবসায় বা পণ্যের প্রকৃতি অনুসারে বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনা করিতে হয়। তবে প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনা করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন.—

(১) যথার্থ রঙের প্রয়োগের দ্বারা বা অন্য উপায়ে বিজ্ঞাপনটিকে এমন

ভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

(২) বিশেষ অর্থবহ শব্দের প্রয়োগে ও অদ্ভুত উপায়ে বিজ্ঞাপনটি এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে সম্ভাব্য ক্রেতার মনে আগ্রহ ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

(৩) পাঠকের মনে যাহাতে স্থায়ী রেখাপাত করা যায় বিজ্ঞাপন সেই ভাবে রচনা করিতে হইবে।

(৪) ক্রেতা-সাধারণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনা করিতে হইবে যাহাতে শেষ পর্যন্ত তাহার বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করিতে স্থির করে।

### অনুশীলনী

(1) What are the different departments of a modern factory? Describe, in short, the functions of each department. Is there any necessity of departmentalisation of a factory?

(কারখানার বিভিন্ন বিভাগগুলি কি কি? সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্যের বর্ণনা দাও। কারখানার বিভাগীকরণের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?)

(2) Describe the organisation of a modern office.

(একটি আধুনিক অফিসের সংগঠন বর্ণনা কর)

(3) What are the different means of communication in a modern office? Describe them in short.

(একটি আধুনিক অফিসে সংযোগ রক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে? ইহাদের সংক্ষেপ আলোচনা কর।)

(4) Mention some of the equipments and labour-saving devices used in a modern office.

(আধুনিক অফিসে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও শ্রম-সঞ্চয়কারী উপায়গুলি উল্লেখ কর।)

(5) Point out and discuss the importance and function of Post-offices in modern trade.

(আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে পোষ্ট অফিসের গুরুত্ব ও কার্যাবলী উল্লেখ ও আলোচনা কর)

(6) Give a general idea about—

(a) Postal rates, (b) posting, (c) registrstion, (d) parcel, (e) express delivery, (f) money order and (g) telegrams.

(নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বর্ণনা কর :—

(ক) ডাক মাণ্ডল, (খ) চিঠি ডাকে দিবার পদ্ধতি, (গ) রেজিস্ট্রেশন, (ঘ) পার্সেল, (ঙ) 'এক্সপ্রেস' বিলি (চ) মনি-অর্ডার, (ছ) টেলিগ্রাম।

(7) What is the importance of commercial correspondence in modern business? Mention its chief featur.

(আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাণিজ্যিক পত্রের গুরুত্ব কি? বাণিজ্যিক পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর।)

(8) What is meant by 'filing'? What are the different methods of filing letters?

(নথিকরণ বলিতে কি বুঝায়। চিঠিপত্র কি কি উপায়ে নথিকরণ করা যায়?)

(9) Describe in short, the different stages of dealing an incoming letter till it is finally disposed of

(পত্র পাইবার পর পর্যায়ক্রমে ইহার বিষয়ে যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা দাও।

(10) What do you know about (a) Pre'cis Writing and (b) office notes.

(ক) সার-সর্ম্ম লিখন এবং (খ) অফিস-লিপি সম্পর্কে কি জান?

(11) Draft suitable letter on any one of the following subjects.

(a) Information regarding the financial condition of a Businessman in Madras.

(b) Cancellation of an order.

(নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটি সম্পর্কে যথাযোগ্য পত্র রচনা কর :—

• (ক) মাদ্রাজের কোন ব্যবসায়ীর আর্থিক সঙ্কতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ;

(খ) অর্ডার বাতিলকরণ।

(12) What do you know about drafting of advertisement?

(বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনা সম্পর্কে কি জান?)

## নবম অধ্যায়

### ব্যাঙ্ক ব্যবসায় (Banking)

#### ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা :

ব্যাঙ্ক বলিতে আমরা এমন প্রতিষ্ঠান বুঝিব যাহা সাধারণতঃ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় আমানত (Deposit) হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাহা পুনর্বার ঋণগ্রাহককে উচ্চ হুদে ঋণ দান (loan) করে।

#### কার্যাবলী :-

ব্যাঙ্ক বলিতে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কই বুঝায় এবং তাহার প্রধান দুইটি কার্য আমানত গ্রহণ ও ঋণ দান। এই দুইটি প্রধান কার্য ছাড়াও ব্যাঙ্ক অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে এবং সামগ্রিক ভাবে আধুনিক কালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই বিভিন্ন কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :-

#### (১) আমানত গ্রহণ :

জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক আমানত হিসাবে গ্রহণ করে। এই আমানত টাকা দুইভাবে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা হইতে পারে। যথা : (ক) চলতি হিসাবে (Current Account) (খ) আমানত হিসাবে (Deposit Account) চলতি হিসাবে জমা অর্থ যে কোন সময়ে আমানতকারী তুলিয়া লইতে পারে এবং সাধারণত ব্যাঙ্ক এইরূপ জমা অর্থের উপর কোন হুদ প্রদান করে না। আমানত হিসাবে জমা অর্থ এইরূপ যে কোন সময়ে তোলা যায় না। নির্দিষ্ট মেয়াদ অথবা অথবা মথায়ধ বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিয়া এই অর্থ তুলিতে হয়। ব্যাঙ্ক এই জমা অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে হুদ প্রদান করে।

#### (২) ঋণদান :

ঋণদান ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকা লিখিয়া সরাসরি কোন ব্যক্তিকে ঋণ দান করা যাইতে পারে। আবার কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্কে হিসাব (Account) থাকিলে, সেই হিসাবে তাহার যে পরিমাণ অর্থ জমা আছে তাহার অতিরিক্ত অর্থ (Over draft) ঋণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ঋণের উপর ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে হুদ দাখ্য করে।

## (৩) ছাড়ি ভান্ডান :

বাণিজ্যিক ছাড়ি ভান্ডাইয়া অর্থ প্রদান করা ব্যাঙ্কের আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ক্রেতা নগদ টাকার পরিবর্তে ছাড়ি মারফৎ ক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। ছাড়ি এক ধরনের হস্তান্তর-যোগ্য অঙ্গীকার পত্র। ইহাতে ছাড়ি গ্রাহক (Drawee) নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। ছাড়িকার (Drawer) ছাড়ির মেয়াদ কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তাহার পূর্বেই যে কোন সময়ে ব্যাঙ্কের নিকট তাহা ভান্ডাইয়া (Discounting) অর্থ পাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ছাড়িতে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ হইতে কিছু কম টাকা প্রদান করে। যে পরিমাণ অর্থ কম দেওয়া হয় তাহাকে বাট্টা (Discount) বলে। ব্যাঙ্ক ছাড়ির মেয়াদ কাল উত্তীর্ণ হইলে তাহা ছাড়ি গ্রাহকের নিকট দাখিল করিয়া ছাড়ির পূর্ণ মূল্য আদায় করে।

## (১) আমানতকারীকে সাহায্য দান :

ব্যাঙ্ক আমানতকারীর পক্ষ হইয়া নানারূপ কার্য সম্পাদন করে। আমানতকারী যে সকল চেক (cheque) জমা দেয় তাহা ভান্ডাইয়া আনা, অথবা আমানতকারী যে সকল চেক কাটে তাহার অর্থ প্রদান করা, তাহার পক্ষ হইয়া কোন পেনসনের টাকা আদায় করা, যৌথ-মূলধনী কারবার হইতে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ আদায় করা ইত্যাদি নানারূপ কার্য ব্যাঙ্কের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক অনেক সময় মক্কেলের পক্ষ হইয়া যৌথমূলধনী কারবারের স্টক ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে।

## (২) ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি অধিকাংশ সময়ে ব্যাঙ্কের মারফৎ আদানপ্রদান করা হয়। 'যেমন—ভুগি (Bill of Exchange), চালানী রসিদ (Bill of Lading), চালান (Invoice), বীমাপত্র (Insurance Policy), নিদর্শন পত্র (Letter of Credit) ইত্যাদি ব্যাঙ্কের মারফৎ লেনদেন করা হয়।

## (৩) বিদেশে অর্থ প্রদান করা

কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ছাড়ি (Bank draft) ক্রয় করিয়া বিদেশে কাহারও নিকট প্রেরণ করিলে বিদেশস্থ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি অথবা শাখা ব্যাঙ্ক সেই ব্যক্তিকে ড্রাফটের পরিবর্তে নির্দিষ্ট

অর্থ প্রদান করে। এইরূপ ভাবে ব্যাঙ্কের মারফৎ বিদেশে অর্থ প্রেরণ করা যায়।

### (৭) মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ :

অনেক সময় মানুষ তাহাদের মূল্যবান সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাহা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিক্রিমে এইরূপ সংরক্ষণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যাঙ্ক মানুষের সম্পত্তির অছি ( Trustee ) হিসাবেও কাজ করে।

উপর্যুক্ত কাষগুলি চাড়াও নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাহায্য দান করে। দেশের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাই সাময়িকভাবে ঋণ হিসাবে দান করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য বহু প্রকার অর্থনৈতিক কার্য কলাপের সৃষ্টি পরিচালনায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা বর্তমান কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ব্যাঙ্ক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

### বিভিন্ন শ্রেণীর আমানত ( Different classes of Deposits )

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যগুলির মধ্যে একটি হইল আমানত গ্রহণ। এই আমানত বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে। যথা—  
(১) চলতি আমানত ( Current Diposit ) (২) মেয়াদী আমানত ( Time or Fixed Deposit ) (৩) সঞ্চয় আমানত ( Saving Deposit ) •

**চলতি আমানত :** চলতি হিসাবে ( Current Account ) যে অর্থ জমা রাখা হয় তাহাকে চলতি আমানত বলা হয়। চলতি আমানত যে কোন সময়ে আমানতকারী চেক কাটিয়া তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ আমানতের উপর ব্যাঙ্ক সাধারণত কোন সুদ দেয় না।

**মেয়াদী আমানত :** মেয়াদী হিসাবে ( Fixed Account ) যে টাকা জমা হয় তাহাকে মেয়াদী আমানত বলে। মেয়াদী আমানতের টাকা আমানতকারী যে কোন সময়ে ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারেন। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তে যথাযোগ্য বিজ্ঞপ্তি ( Notice ) দিয়া ব্যাঙ্ক বইতে এইরূপ টাকা তোলা যায়। এইরূপ আমানতের উপর ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক সুদ প্রদান করে।

**সঞ্চয় আমানত :** সঞ্চয় হিসাবে (Savings Account) এ যে টাকা জমা হয় তাহাকে সঞ্চয় আমানত বলে। সঞ্চয় আমানতের টাকা সপ্তাহে একবার অথবা মাসে দুইবার চেক কাটিয়া ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায়। এইরূপ আমানতের উপর ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকে। তবে সেই সুদের হার মেয়াদী আমানতের উপর দেয় সুদের হার অপেক্ষা কম হয়।

**ব্যাঙ্কের ঋণদান পদ্ধতি ( Loans granted by a Bank ) :** ৬

ব্যাঙ্ক সাধারণত কোনরূপ জামানতের (Security) পরিবর্তে ঋণদান করিয়া থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে জামানত ছাড়াও ব্যাঙ্ক ঋণ দান করে।

(১) যখন জামানতের পরিবর্তে ঋণ দেওয়া হয় তখন প্রথমত ব্যাঙ্কের খাতায় ঋণ-গ্রহিতার নামে চলতি হিসাব (Current Account) তুলিয়া সেই হিসাবে ঋণের সমপরিমাণ টাকা জমা লিখিয়া লওয়া হয়। যেন ঋণ-গ্রহিতা ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছে। ঐ অর্থ প্রয়োজনমত ঋণ-গ্রহিতা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে পারে। চলতি হিসাবে যখন ঋণের টাকা জমা দেখান হয় সেই সময়ে আর একটি ঋণ-হিসাবে (Loan Account) ঐ টাকা দেনা হিসাবে দেখান হয়। এবং ঐ দেনার টাকা ঋণ-গ্রহিতা খরচ করুক বা নাই করুক তাহাকে ঐ টাকার উপর সুদ দিতে হয়।

(২) কোন ব্যক্তির চলতি হিসাবে (Current Account) যে পরিমাণ অর্থ জমা আছে তাহার অতিরিক্ত অর্থ তুলিবার ক্ষমতা দান করিয়াও ব্যাঙ্ক সেই ব্যক্তিকে ঋণ দান করিতে পারে। এইরূপ 'জমাতিরিক্ত ঋণকে Overdraft বলা হয়। এই জমাতিরিক্ত ঋণের পরিমাণ কি হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং যে পরিমাণ জমাতিরিক্ত ঋণ তুলিয়া লওয়া হয় তাহার উপর অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করা হয়।

(৩) উপযুক্ত দুই উপায়ে ছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে হণ্ডিভান্ডাইয়া যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহাও ঋণের পর্যায়ে পড়ে।

**বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ( Different types of Banks ) :**

প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটির প্রকৃতি ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

## (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :

ইহা দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কেন্দ্র স্বরূপ। দেশের আর্থিক ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে স্তম্ভ থাকে। (ইহার কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইতেছে)। ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

## (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) :

এইরূপ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে স্বল্প-মেয়াদী আমানত (Deposits) গ্রহণ করে এবং তাহা অল্প কালের জন্ত ঋণ ও দাননের (loan and advances)-মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাময়িক অর্থের প্রয়োজন মিটাইয়া এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। তবে এই জাতীয় ব্যাঙ্কে যে আমানত রাখা হয় তাহা আমানতকারীরা স্বল্প স্বল্প মেয়াদের জন্ত জমা রাখে বলিয়া অথবা ক্ষেত্র বিশেষে চাহিবামাত্র তুলিয়া লইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থায় জমা রাখে বলিয়া ঐ আমানতী টাকা দীর্ঘকালের জন্ত কোন শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

## (৩) বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) :

সাধারণতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দান করা এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থের যোগান দিয়া এই জাতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। আবার এই জাতীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু অথবা বৈদেশিক মুদ্রার আদান-প্রদান করিয়া আন্তর্জাতিক ঋণ-পরিশোধেরও ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ব্যবসায়ীগণ নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিবার জন্ত এই সকল ব্যাঙ্কের সঙ্গে অগ্রিম চুক্তি (forward Contract) করিতে পারে। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের বিনিময় হার অস্বাভাবিক ভাবে উঠানামা করিতে পারে না। বর্তমানে ভারতে যে সকল বিনিময় ব্যাঙ্ক আছে ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে অর্থসংস্থানে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। লয়েডস ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না এই জাতীয় ব্যাঙ্ক।

## (৪) শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) :

এই জাতীয় ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে এবং ঐ আমানতী টাকা দীর্ঘ সময়ের জন্ত শিল্প ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে। শিল্প-প্রতীক্ষার



মূলধন সংস্থানে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান ব্যতীত কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া অথবা শেয়ার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিয়াও (Underwrite) এই জাতীয় ব্যাঙ্ক কোন কোম্পানীর মূলধন সংস্থানে সহায়তা করে।

ভারতে শিল্প-ব্যাঙ্ক শ্রেণীর কোন ব্যাঙ্ক নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতিপয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। যেমন, Industrial Finance Corporation, State Finance Corporation, National Industrial Development Corporation ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

#### (৫) কৃষি ব্যাঙ্ক (Agricultural Bank) :

আমাদের দেশে কৃষকদের দুঃস্বস্তির কথা সর্বজনবিদিত। ইহারা যে শুধু ঋণভারে ভুজ্জরিত তাহা নয়, বহু কৃষক মহাজনদের অতি-লোভের শিকার হইয়া সর্বস্বান্ত হয়। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে ইহাদের মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। কৃষকেরা বাহাতে ঋণ হুদে ঋণ পাইতে পারে এবং অতি সহজ কিস্তিতে সেই ঋণ শোধ করিতে পারে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক তাহার ব্যবস্থা করিবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (State Bank of India) গ্রামাকলে বহু শাখা খোলা হইয়াছে।

#### (৬) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank) :

কৃষকদের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে তাহাদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানের প্রয়োজন আছে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান করিয়া থাকে। জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণদান করা হয় বলিয়া এইভাবে ঋণদানে ঝুঁকির সম্ভাবনা কম।

#### (৭) সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) :

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলের স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সদস্যদের সর্বত্র আদানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহা পুনঃ অল্প হুদে সদস্যদের প্রয়োজন যত ঋণ-হিসাবে

দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যাঙ্কের দ্বারা কৃষক ও অন্যান্য স্বল্পবিত্ত লোক বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়।

### চেক (Cheque) :

- চেক ব্যাঙ্কের লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। চেক হইল ব্যাঙ্কের প্রতি আমানতকারীর আদেশ-পত্র যাহা দাখিল করা যাত্র ব্যাঙ্ক চেকের বাহককে, অথবা চেকে উল্লিখিত ব্যক্তিকে বা তাহার আদেশবাহীকে চেকে নির্দিষ্ট করা পরিমাণ অর্থ প্রদান করে।

‘চেক’ এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা :—

(১) ইহাতে সাধারণত তিন প্রণীর দল বা পক্ষ জড়িত থাকে। যথা — (ক) চেকদাতা, (খ) চেকের অর্থ প্রাপক, এবং (গ) ব্যাঙ্ক। অবশ্য যখন কোন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হইতে তাহার জমা টাকা তুলিবার জন্য চেক-কাটে তখন চেক দাতা ও চেকের অর্থ প্রাপক একই দল হয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে দুইটি দল বা পক্ষ থাকে।

(২) ব্যাঙ্কে যে ব্যক্তির আমানত নাই সে চেক কাটিতে পারে না।

(৩) চেকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করিতে হইলে চেকদাতা ও চেক-গ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন এবং যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হয় তাহার আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।

(৪) চেকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদিত হইলেও ইহা আইনত বাধ্যতামূলক বিনিময় মাধ্যম (Legal tender) নয়। সুতরাং কেহ ইচ্ছা করিলে চেকের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকারও করিতে পারে।

### একটি চেকের নমুনা

## বিভিন্ন প্রকারের চেক

সাধারণ-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চেক প্রচলিত। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :—

### (১) বাহক চেক (Bearer Cheque) :

যে চেকের টাকা ব্যাঙ্কের কাউন্টারে দাখিলকারী চেকের বাহক ব্যক্তিকেই দেওয়া হয় সেইরূপ 'চেক' কে বাহক চেক বলা হয়। এইরূপ চেক ভাড়াইয়া অন্য চেকের পিছনে সহি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তিই ইচ্ছা বহন করিয়া ব্যাঙ্কে দাখিল করিবে তাকেই অর্থ প্রদান করা হয়।

### (২) অর্ডার চেক বা আদেশবহ চেক (Order Cheque)

এইরূপ চেকের টাকা চেকে উল্লিখিত ব্যক্তি বা তাহার নির্দেশিত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। অপর কেহ এইরূপ চেক ভাড়াইয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। এই ধরনের চেকের পিছনে সহি (Endorsement) করিয়া কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকিলে সেই ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ সেই চেক ভাড়াইয়া অর্থ পাইতে পারে না।

### (৩) পূর্ব-তারিখ লিখিত চেক এবং ভবিষ্যৎ-তারিখ-লিখিত চেক (Ante dated and post dated Cheques)

যে তারিখে প্রকৃত পক্ষে চেক লেখা হইল তাহার পূর্ববর্তী কোন তারিখ চেকে লেখা হইলে তাহাকে পূর্ব-তারিখ-লিখিত চেক (Ante-dated Cheque) বলা হয়। এই রূপ চেক সাধারণত তুল সংশোধনের জন্য অথবা হিসাবের সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কাটা হয়। অন্ত্যন্ত ক্ষেত্রে এইরূপ চেকের ব্যবহার নাই বলিলেই চলে।

যে তারিখে প্রকৃত পক্ষে চেক লেখা হইল তাহার পরবর্তী কোন তারিখ যদি চেকে লিখিত হয় তাহা হইলে সেই শ্রেণীর 'চেক' কে ভবিষ্যৎ-তারিখ-চেক বলা হয়। ব্যাঙ্কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা না থাকিলে চেক-প্রদানকারী এইরূপ চেক কাটিয়া কিছু সময় লইতে চেষ্টা করে, যে সময়ের মধ্যে সে তাহার ব্যাঙ্কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। আবার অনেক সময় মূল্য পরিশোধের পূর্বে ক্রীত পণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর চেক কাটা হয়।

## অনাদৃত বা কের চেক (Dishonoured or Returned Cheque)

অনেক সময় চেক দাতার সাহ, চেকের জারখ বা অথের পারমাণ সংক্রান্ত কোন তুল থাকিলে অথবা ব্যাঙ্কে চেকের উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা না থাকিলে আদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত চেক ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে না। এইরূপ 'চেক' কে অনাদৃত বা কের চেক বলা হয়।

### স্টেল বা বাতিল চেক (Stale Cheque) :

সেভিংস একাউন্টের উপর ছয় মাস এবং কারেন্ট একাউন্টের চেক তিন-মাস কাল পরন্ত সময়ের মধ্যে ভাঙ্গান যায়। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইলে ঐ চেক বাতিল হইয়া যায়। এইরূপ 'চেক' কে বাতিল চেক বলা হয়।

### ক্রসড চেক (Crossed Cheque)

কোন চেকের গায়ে সমান্তরাল দুইটি সরলরেখা অঙ্কিত করা হইলে উহাকে ক্রসড চেক (Crossed Cheque) বলা হয়। ঐ দুইটি সমান্তরাল সরল রেখার মধ্যে অনেক সময় "And company" বা সংক্ষেপে "& co" এইরূপ লেখা থাকে।

এই জাতীয় চেকের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা সরাসরি ব্যাঙ্ক এ লইয় গিয়া ভাঙ্গান যায় না। প্রথমত প্রাপক ইহা তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিবে। এবং ঐ ব্যাঙ্ক আরকং এই 'চেক' ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে যদি ব্যাঙ্কে তাহার নিজের কোন হিসাব (Account) না থাকে তাহ হইলে অপর কাহারও হিসাবে ঐ চেক জমা দিয়াও ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা কর যায়। প্রধান কথা, এই প্রকার চেক কোন ব্যাঙ্কের আরকং ভাঙ্গাইতে হইবে আদায়কারী ব্যাঙ্ক এই জাতীয় চেকের দায়িত্ব বহন করে বলিয়া এই জাতীয় চেকের টাকা প্রকৃত মালিক ব্যতিত অপর কাহারও হাতে পড়ার সম্ভাবন কম। এইরূপ চেক হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে অপর কেহ ইহা ভাঙ্গাই অর্থ লইতে পারে না।

### চেক ক্রস করার বিভিন্ন উপায় :

দুইটি উপায়ে চেক 'ক্রস' করা যায়। যথা :—

- (১) সাধারণ ক্রসিং (General crossing) (২) বিশেষ ক্রসিং

সাধারণ ক্রসিং আড়াআড়ি ভাবে চেকের উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করা হইলে উহাকে সাধারণ ক্রসিং বলা হয়। এই রেখা দুইটির মধ্যে ‘& company’, ‘& co’, “not negotiable”, “not negotiable, & co” “A/c payee” প্রভৃতি কথাগুলি থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। এইরূপ ‘সাধারণ ক্রস করা চেক’ প্রাপক অথবা তাহার নির্দেশিত কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্ক মারফৎ ভাড়াইতে হয়। নিম্নে ‘সাধারণ ক্রসিং’-এর নমুনা প্রদত্ত হইল।

১	২	৩	৪	৫	৬
	& Company	& Co	not negotiable	not negotiable & Co	A/c Payee

## (২) বিশেষ ক্রসিং

যে চেকের উপর আড়াআড়ি ভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ রেখাঘরের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম লিখিত থাকে তাহাকে বিশেষ ক্রসিং (Special Crossing) বলা হয়। এইরূপ চেকের অর্থ উল্লিখিত প্রাপক ছাড়া এবং উল্লিখিত ব্যাঙ্ক মারফৎ ছাড়া আর কাহাকেও বা অপর কোন উপায়ে দেওয়া যায় না। নিম্নে বিশেষ ক্রসিং এর কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল :—

## বিশেষ ক্রসিং

১	২	৩
United Bank of India Ltd.	United Bank of India Ltd. Not negotiable	United Bank of India Ltd. A/c Payee.

সাধারণ বা বিশেষ উপায়ে ক্রয় করা চেকে 'not negotiable, A/c Payee', কথাগুলি থাকে। ইহাদের তাৎপৰ্য্য কি তাহা জানা প্রয়োজন।

'Not negotiable' কথাটি যে চেকে থাকে সেই চেক হস্তান্তর যোগ্য নয় এইরূপ বুঝায় না। এই কথা দুইটির তাৎপৰ্য্য এই যে, যে ব্যক্তির নিকট ঐরূপ চেক হস্তান্তরিত হইবে সেই ব্যক্তির ঐ চেকের উপর বৈধ জন্মাইবে তাহা হস্তান্তরকারীর স্বয়ং অপেক্ষা উন্নত হইবে না।

অর্থাৎ যদি ঐ চেকের উপর হস্তান্তরকারীর স্বয়ং বে-আইনী হয় তাহা হইলে বাহার নিকট ইহা হস্তান্তরিত হইল তাহারও ঐ চেকের উপর কোন বৈধ স্বয়ং জন্মাইবে না। ফলে, এই জাতীয় চেক হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে বাহার নিকট উহা হস্তান্তরিত হইবে সে ব্যক্তি চেকের উপর হস্তান্তরকারীর বৈধস্বয়ং সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া লইবে।

চেকের উপর যখন 'A/c Payee' কথাটি লেখা থাকে তখন বাহা নাম লেখা থাকে কেবল সেই ব্যক্তিই চেক ভাঙাইয়া অর্থ পাইতে পারে এইরূপ চেক অপর কাহারও নিকট হস্তান্তর করা যায় না।

### মিকাশ ব্যবস্থা (Clearing System) :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 'ক্রসড চেক' ব্যাঙ্কের হারকং ছাড়া ভাঙা যায় না। সুতরাং কোন আমানতকারী ক্রসড চেক পাইলে তা সে তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিবে। অমুরূপভাবে দূরস্থিত কোন ব্যাঙ্কে উপর কাটা চেক পাইলে তাহা ভাঙাইবার জন্য সে নিজের ব্যাঙ্কেই ভাঙিয়া থাকে। সুতরাং আমানতকারীর ব্যাঙ্কের অপরাপর ব্যাঙ্কের নিব উক্ত চেকগুলির টাকা পাওনা হইল। আবার ঐ একই আমানতকারী তাহার দেনা মিটাইবার জন্য নিজের ব্যাঙ্কের উপর-চেক কাটিয়া দাতাকে দিতে পারে। ঞ্গদাতা তাহার নিজের ব্যাঙ্কে ঐ চেক জমা দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ঞ্গদাতার ব্যাঙ্ক পূর্বোক্ত আমানতকারীর ব্যাঙ্ক নিকট ঐ চেকের টাকা পাইবে। সুতরাং এই উদাহরণে আমানতকারী ও ঞ্গদাতার ব্যাঙ্ক দুইটি একই সঙ্গে পাওনাদার ও দেনাদার হইতেছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যহ শত শত ব্যাঙ্ক একে অপরের নিকট একইরূপে এইভাবে পাওনাদার ও দেনাদার হয়। প্রত্যেকটি চেক ভাঙাইয়া এই দেনাপাওনা মিটাইয়া ফেলা অস্ববিধাজনক, বিশেষত যদি চেকের ভাঙা প্রদানের সংখ্যা অধিক হয়। এই অস্ববিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাব করে এবং তাহার পর নীট পাওনা বা দেনা মিটাইবার ব্যবস্থা করে। এইরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় ‘নিকাশ ব্যবস্থা’ (Clearing System) এবং যে স্থানে প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া হিসাব নিকাশ করে তাহাকে বলা হয় “নিকাশঘর” (Clearing House) সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নিকাশঘর হিসাবে কার্য সম্পাদন করে।

ভারতে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ ‘নিকাশ ঘরের’ কার্য সম্পাদন করে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে এই সব শহরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে অন্যান্য ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া চেকসম্পর্কিত পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব করে। এই হিসাবের পরে দেনাদার ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর তাহার দেনার সমপরিমাণ অর্থের চেক কাটিয়া পাওনাদার ‘ব্যাঙ্ক’কে প্রদান করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সকল ব্যাঙ্কের আমানত জমা থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে নগদ টাকার আদান প্রদান না করিয়াই চেক ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা যায়।

### কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :

সকল দেশেই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের আর্থিক লেন-দেন, মুদ্রা ও ঋণ-ব্যবস্থা করা এই রূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূখ্য কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :—

**সরকারের ব্যাঙ্ক :** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষা করে। সরকারের পক্ষ হইয়া অর্থ সংগ্রহ, অর্থপ্রদান, সরকারী ঋণের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনবোধে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান ইত্যাদী নানাবিধ কার্যের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই সকল কার্যাবলীর ফলে টাকার বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল হয়।

### (২) দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

সরকারের পক্ষ হইয়া বিভিন্ন মূল্যের নোট ছাপানোর পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। ইহাছাড়া বিভিন্ন ধাতুমুদ্রা বাজারে ছাড়িতে হইলেও তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করিতে হয়। দেশে চালু মুদ্রার পরিমাণের উপর ঋণ-মূল্য নির্ভর করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ঋণ-মূল্যের স্থিতি-বিধান করিতে পারে। ঋণ-মূল্যকে স্বাভাবিক

স্তরে রাখিতে না পারিলে দেশের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দ্রব্য-মূল্যকে স্বাভাবিক স্তরে স্থিতিশীল করিতে হয়।

(৩) দেশের ঋণ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ: দেশের ঋণ-ব্যবস্থার (Credit System) নিয়ন্ত্রণ করা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর একটি মূখ্য কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত দুইটি উপায়ে ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। যথা:—(১) ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) (২) সরাসরি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয় (Open Market Operations). ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি করা হইলে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে। ব্যাঙ্কের হার হ্রাস করা হইলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দেশের টাকার বাজার (Money Market) যদি সংগঠিত না হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের হারের পরিবর্তনের দ্বারা ঋণের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

আবার সরাসরি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করে, আর ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইলে তাহা বিক্রয় করে। এই দুইটি উপায় ছাড়াও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) নৈতিক প্রভাব ইত্যাদির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

### (৪) ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক:

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করে। আইন অনুসারে উপনীলভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার ফলে সাধারণ আমানতকারীদের স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। আবার অনেক সময় প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্ককে ঋণ দান করিয়াও সাহায্য করিয়া থাকে।

### (৫) মিকাল অর:

দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেক সংক্রান্ত পারস্পরিক লেনদেনের হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মিটাইয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক সদস্য ব্যাঙ্কেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অর্থ জমা থাকে। সুতরাং সদস্য-ব্যাঙ্ক সমূহের



মধ্যে যে আর্থিক লেনদেন হয় তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঐ সকল সদস্য ব্যাঙ্কের যে হিসাব থাকে তাহাতে জমা-খরচ লিখিয়া মিটান যায়। ইহার জন্ত নগদ অর্থের আদান-প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিকাশ ব্যবস্থা (Clearing System) করিয়া 'নিকাশ ঘরের কার্য' সম্পাদন করে।

### (৬) মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া নিজের দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে।

### (৭) অজ্ঞাত কার্য :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক সময় কৃষি ও শিল্পে বা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়া থাকে। আবার দেশের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ উপদেশ দিয়া সরকারকে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল তাহাতে ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) ও তপশীলী বা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Bank) এই কথা দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপে ইহাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

### ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate ) :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের হণ্ডি ভান্স<sup>\*</sup>ইতে যে হারে সুদ আদায় করে তাহাকেই ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate ) বলা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে হণ্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ভান্সাইয়া অর্থ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হণ্ডির নির্ধারিত অর্থের কিছু কম টাকা দিয়া থাকে এবং যে পরিমাণ টাকা কম দেওয়া হয় তাহাকে বাটা ( Discount ) বলা হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক হণ্ডি গ্রাহকের ( Drawee ) নিকট হইতে হণ্ডির পূর্ণ অর্থ আদায় করে। কিন্তু যদি এমন হয় যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরই অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলে ঐ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সেই হণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বার ভান্সাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। তৎসম্পন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাহার মঙ্কেলের নিকট হইতে যে হারে সুদ বা বাটা আদায় করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তদপেক্ষা কম হারে সুদ বা বাটা

দিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ বা বাট্টা আদায় করে তাহাই ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate )। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে উৎসাহী বা নিরুৎসাহী করিতে পারে এবং ইহার দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের হার ও ঋণগ্রহণ এবং ঋণদান ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

### তপশীলী বা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ( Scheduled Bank ) :

ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) তপশীলী ব্যাঙ্ক (২) অ-তপশীলী ব্যাঙ্ক।

তপশীলী ব্যাঙ্কসমূহ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নানাপ্রকার সুবিধাভোগ করে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে তলবী ও মেয়াদী আমানতে নির্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

### অনু

1. What is a Bank ? What are the functions of a Commercial Bank ?

( ব্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায় ? একটি ব্যাঙ্কের কার্যাবলী কি ? )

2. What are the different type of Bank in India ?

( ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের পরিচয় দাও । )

3. Distinguish between :—

(a) Current Account and Deposit Account.

(b) Loan and overdraft.

[ (ক) চলতি হিসাব ও আমানতী হিসাব এবং (খ) সাধারণ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । ]

4. What do you understand by a Cheque ? What are the different kinds of cheque ?

( চেক বলিতে কি বুঝায় ? বিভিন্ন ধরনের চেক কি কি ? ) .

অর্থে যে আর্থিক লেনদেন হয় তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঐ সকল সদস্য ব্যাঙ্কের যে হিসাব থাকে তাহাতে জমা-খরচ লিখিয়া মিটান যায়। ইহার জন্ত নগদ অর্থের আদান-প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিকাশ ব্যবস্থা (Clearing System) করিয়া ‘নিকাশ ঘরের কার্য’ সম্পাদন করে।

### (৬) মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া নিজের দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে।

### (৭) অজ্ঞাত কার্য :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক সময় কৃষি ও শিল্পে বা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়া থাকে। আবার দেশের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ উপদেশ দিয়া সরকারকে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল তাহাতে ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) ও তপশীলী বা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Bank) এই কথা দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপে ইহাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

### ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate ) :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের হণ্ডি ভান্ডাইতে যে হারে সুদ আদায় করে তাহাকেই ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate ) বলা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে হণ্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ভান্ডাইয়া অর্থ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হণ্ডির নির্ধারিত অর্থের কিছু কম টাকা দিয়া থাকে এবং যে পরিমাণ টাকা কম দেওয়া হয় তাহাকে বাটা ( Discount ) বলা হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক হণ্ডি গ্রাহকের ( Drawee ) নিকট হইতে হণ্ডির পূর্ণ অর্থ আদায় করে। কিন্তু যদি এমন হয় যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরই অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলে ঐ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সেই হণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বার ভান্ডাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। তখন সম্প্রদত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাহার মজেলের নিকট হইতে যে হারে সুদ বা বাটা আদায় করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তদপেক্ষা কম হারে সুদ বা বাটা

দিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ বা বাট্টা আদায় করে তাহাই ব্যাঙ্কের হার ( Bank Rate )। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে উৎসাহী বা নিরুৎসাহী করিতে পারে এবং ইহার দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের হার ও ঋণগ্রহণ এবং ঋণদান ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

### তপশীলী বা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ( Scheduled Bank ) :

ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) তপশীলী ব্যাঙ্ক (২) অ-তপশীলী ব্যাঙ্ক।

তপশীলী ব্যাঙ্কসমূহ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নানাপ্রকার সুবিধাভোগ করে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে তলবী ও মেয়াদী আমানতে নির্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

1. What is a Bank ? What are the functions of a Commercial Bank ?

( ব্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায় ? একটি ব্যাঙ্কের কার্যাবলী কি ? )

2. What are the different type of Bank in India ?

( ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের পরিচয় দাও । )

3. Distinguish between :—

(a) Current Account and Deposit Account.

(b) Loan and overdraft.

[ (ক) চলতি হিসাব ও আমানতী হিসাব এবং (খ) সাধারণ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । ]

4. What do you understand by a Cheque ? What are the different kinds of cheque ?

( চেক বলিতে কি বুঝায় ? বিভিন্ন ধরণের চেক কি কি ? ) .

5. What is a Crossed Cheque ? What are the different method of Crossing a Cheque ?

(ক্রসড্ চেক কাহাকে বলে ? চেক ক্রস করিবার বিভিন্ন উপায় কি কি ?)

6. What do you understand by clearing system ? What is a clearing House ?

(নিকাশ ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় ? নিকাশ-ঘর কাহাকে বলে ?)

7. What is a Central Bank ? Describe its functions.

(কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।)

8. Write short notes on—(a) Bank Rate (b) Scheduled Bank.

(নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) ব্যাঙ্কের হার (খ) তপশীলী ব্যাঙ্ক।)

---

## দশম অধ্যায়

### বীমা ( Insurance )

#### বীমার সংজ্ঞা ও সৰ্ত :

বীমা (Insurance) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটা চুক্তি যাহার দ্বারা এক পক্ষ নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে অপরপক্ষকে চুক্তিনির্দিষ্ট কোন দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

বর্তমানে সমাজ জীবনের সর্ব স্তরের মানুষকে নানাপ্রকার ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই ঝুঁকির সম্ভাবনা অত্যধিক। ব্যক্তিগত জীবনেও ঝুঁকির অভাব নাই। সুতরাং ঝুঁকি সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত জীবনে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে মানুষ বীমার (Insurance) আশ্রয় লয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বীমার দ্বারা ঝুঁকির পরিমাণ কতকটা লাঘব করা যায় বলিয়া ব্যবসায়ী অনেকটা নিশ্চিত হইয়া ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করিতে পারে। এই কারণে ব্যবসায়ের অবস্থা বীমা-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বীমা নানাপ্রকার হইতে পারে। যেমন : (১) অগ্নি-বীমা (২) নৌ-বীমা (৩) অপহরণ-বীমা (৪) জীবন-বীমা ইত্যাদি।

#### বীমার সৰ্ত :

প্রত্যেক বীমা-চুক্তির কয়েকটি বিশেষ সৰ্ত ও বৈশিষ্ট্য আছে। যথা :—

(১) ইহা একটি ক্ষতি-পূরণের চুক্তি অথবা কোন ঘটনা ঘটিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। সুতরাং, চুক্তি নির্দিষ্ট দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতি না হইলে ঘটনা না ঘটিলে ক্ষতি বা প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রশ্ন আসে না। আবার চুক্তি নির্দিষ্ট অর্থের বেশীও দাবী করা যায় না।

(২) দ্বিতীয়ত বীমাচুক্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর অভাব বা হানি হইলে বীমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেই ঐ বিষয়বস্তুতে তাহার বীমাযোগ্য স্বার্থ ( Insurable interest ) আছে বলিয়া মনে করা হইবে।

যেমন, জীৱনীয় জীবনের উপর বীমাপত্র গ্রহণ কৰিতে পারে। কারণ, স্বামীৰ মৃত্যু ঘটিলে জীৱ আৰ্থিক ক্ষতিৰ সম্ভাবনা অধিক। এইৰূপ বীমা বোগ্য স্বার্থ না থাকিলে বীমা কৰা যায় না।

(৩) বীমা চুক্তি চূড়ান্ত সন্ধিস্থাসের (utmost good faith বা uberrimac fidei) উপর নির্ভর করে। বীমাগ্রহীতা বীমাচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বীমার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য কোনরূপ গোপন না রাখিয়া বীমাকারীর নিকট প্রকাশ করিবে। এইরূপ তথ্যপ্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। তথ্য গোপন করা হইলে বীমাকারীর পক্ষে যথাযথ ভাবে ঝুঁকি বহন করা অথবা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভবোক্তনক হয়। বীমাচুক্তি সম্পাদনের পরও যদি প্রকাশ পায় যে বীমাগ্রহীতা বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিয়াছিল তাহা হইলে ঐ চুক্তি বাতিল হইয়া যায়।

### বিভিন্ন প্রকার বীমা ( Different types of Insurance ) :

ঝুঁকির প্রকৃতি অনুসারে বীমা-ব্যবস্থাও বিভিন্নপ্রকার হইতে পারে। এই বিভিন্নশ্রেণীর বীমার কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :—

- (১) অগ্নি-বীমা ( Fire Insurance )
- (২) নৌ-বীমা ( Marine Insurance )
- (৩) জীবন-বীমা ( Life Assurance )
- (৪) অপহরণ-বীমা ( Burglary Insurance )
- (৫) দুর্ঘটনা-বীমা ( Accident Insurance )
- (৬) সমাজ-বীমা ( Social Insurance )

### অগ্নি-বীমা :

অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন বিষয় সম্পত্তির ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে অগ্নি-বীমা চুক্তি ( Fire Insurance Contract ) বলা হয়। বলা বাহুল্য বীমা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি অগ্নি-বীমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ অগ্নি-বীমা (১) ক্ষতিপূরণের চুক্তি (২) এই চুক্তি বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে পারস্পরিক চূড়ান্ত সন্ধিস্থাসের উপর নির্ভরশীল। (৩) এই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে চুক্তির বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অকপটে প্রকাশ করিতে হইবে। (৪) বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার স্বার্থ থাকিতে হইবে।

### অগ্নি-বীমার বিভিন্নপ্রকার পলিসি :

ঝুঁকির প্রকৃতি অনুসারে অগ্নি-বীমার চুক্তিপত্র বা বীমাপত্র ( Policy ) বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যেমন—

(১) **Special or Specific Policy :** এই ধরনের বীমাপত্র বা পলিসিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কথা লিখিত থাকে। যখন এই ধরনের পলিসি গ্রহণ করা হয় তখন বীমাকৃত সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য যাহাই হউক না কেন সেই সম্পত্তির অগ্নিকাণ্ডজনিত কোন ক্ষতি হইলে পলিসিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হয়।

(২) **Valued Policy :** এইরূপ বীমাপত্রে চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ঐ বিষয়বস্তুর ক্ষতি হইলে বীমাকারী ঐ নির্ধারিত মূল্য প্রদান করে। যে সকল বস্তুর ক্ষতি হইলে তাহার মূল্য নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য সাধারণত সেইরূপ বস্তুর ক্ষেত্রে এইরূপ বীমাপত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সাধারণত প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত দ্রুপাণ্য ও মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে এই জাতীয় বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়।

(৩) **Average Policy :** এই ধরনের বীমাপত্রে 'Average Clause' নামে একটি শর্ত থাকে। ইহার ফলে বীমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হইলে বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর নিকট হইতে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে না। বীমার বিষয়বস্তুর বীমাকৃত ও প্রকৃত মূল্যের অনুপাতে পূর্ণক্ষতির অংশ নির্ণয় করিয়া বীমাকারি তাহা পূরণ করে। নিম্নের উদাহরণ হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে।

যনে কর বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য	৮০,০০০ টাকা
এবং বীমার বিষয়বস্তুর বীমাকৃত মূল্য	১৬,০০০ টাকা
প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ	১০,০০০ টাকা

এই ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে—

$$\frac{১৬,০০০}{৮০,০০০} \times ১০,০০০$$

$$= ২০০০ \text{ টাকা।}$$

বীমাকারীর স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এইরূপ বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়।



(৪) **Floating Policy** : কারবারে পণ্য সামগ্রীর সর্বদাই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতেছে। আবার অনেক সময় কারবারের পণ্য বিভিন্ন স্থানে মজুত থাকে। এই জাতীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপর যে অগ্নি-বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে ‘Floating Policy’ বলা হয়।

(৫) **Re-instatement Policy** : এইরূপ বীমাচুক্তি সম্পাদিত হইলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে আধিক ক্ষতিপূরণ না দিয়া অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত দ্রব্যটি পুনঃস্থাপন করে।

### নৌ-বীমা ( Marine Insurance )

সমুদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হইলে নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্ভোগ বা অন্ত কারণে পরিবাহিত পণ্য অথবা জাহাজের নানাপ্রকার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে পরিবহনকারী ও ব্যবসায়ী উভয়কে ঝুঁকি বহন করিতে হয়। এইপ্রকার ঝুঁকির ভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে পরিবহনকারী ও ব্যবসায়ীরা বীমাসংস্থার সহিত ক্ষতিপূরণের চুক্তি সম্পাদিত করে। এইপ্রকার বীমাচুক্তিকেই নৌ-বীমা ( Marine Insurance ) বলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতা ( Insured ) বীমাকারীকে ( Insurer ) নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করে। চুক্তিতে উল্লিখিত ক্ষতি না হইলেও ঐ প্রিমিয়ামের টাকা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

তিন প্রকার বিষয়বস্তুর উপর নৌ-বীমা হইতে পারে :—

#### (১) জাহাজ সম্পর্কে নৌ-বীমা ( Hull Insurance ) .

যাতায়াতের সময় নানাপ্রকার সামুদ্রিক বিপদের ফলে ( Perils of the Sea ) জাহাজটির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য এই বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

#### (২) মাণ্ডল সম্পর্কে নৌ-বীমা ( Freight Insurance ) :

সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় জাহাজের পণ্যদ্রব্যসমূহের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি হইলে মাণ্ডল বাবদ আয় হ্রাস পায়। এইপ্রকার ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজের মালিক অথবা জাহাজের ভাড়াকারী এই জাতীয় ঝুঁকি বহন করিতে পারে।

### (৩) পণ্যভ্রব্য সম্পর্কে নৌ-বীমা ( Cargo Insurance ) :

যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনায় জাহাজের পণ্যভ্রব্য বিনষ্ট হইলে তাহার ক্ষতি-পূরণের উদ্দেশ্যে জাহাজের পণ্যভ্রব্যের উপর এই শ্রেণীর বীমা করা যাইতে পারে।

### নৌ-বীমার বিষয়সমূহ :

নিম্নলিখিতগুলি নৌ-বীমার অপরিহার্য বিষয় :

#### (১) বীমা যোগ্য স্বার্থ ( Insurable Interest ) :

বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকিলে অর্থাৎ দুর্ঘটনায় জাহাজ, পণ্য বা মাণ্ডলের ক্ষতি হইলে যদি বীমাগ্রহীতার আর্থিক লোকসান হয় তাহা হইলে বীমачুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে।

#### (২) চূড়ান্ত সন্ধিস্বাস ( Utmost good faith ) :

বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সন্ধিস্বাস থাকিতে হইবে। অর্থাৎ বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর নিকট বীমার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সকল তথ্য অকপটে প্রকাশ করিবে। যদি ইহা না করে তাহা হইলে বীমачুক্তি বাতিল হইয়া যাইতে পারে।

#### (৩) ক্ষতিপূরণের চুক্তি ( Contract of Indemnity ) :

নৌ-বীমা মূলত ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলিয়া প্রকৃত ক্ষতি না হইলে বীমা গ্রহীতা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

#### অপরিহার্য শর্ত ( Warranty ) :

বীমачুক্তি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকিলেও নিম্নলিখিত শর্তগুলি নৌ-বীমачুক্তির অপরিহার্য শর্ত বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুত চুক্তির প্রকৃতি অনুসারে এই সকল শর্তের অবস্থিতি অনুমান করা হয়। এইজন্য এই সকল শর্তকে 'Implied warranty' বা নিহিত শর্ত বলা হয় :—

#### (১) জাহাজের সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা ( Sea-worthiness of the Ship ) :

সমুদ্রযাত্রার পূর্বে জাহাজটি সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী হইতে হইবে। অর্থাৎ জাহাজে যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, লোকসম্বল ইত্যাদি থাকিবে।

ইহাতে ক্ষমতাতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করা হইবে না এই প্রকার আশ্বাস দিতে না পারিলে বীমাচুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না।

## (২) যাত্রার বৈধতা :

জাহাজটি বৈধ-ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিবে। কোন প্রকার নিষিদ্ধ বা বে-আইনী মাল পরিবহন করিবে না। শুষ্ক ফাঁকি দিবে না বা চোরাই মাল চালান দিবে না। আইনত যাত্রা যদি বৈধ না হয় তাহা হইলে বীমা চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না।

## (৩) গতিপথ হইতে ভ্রষ্ট না হওয়া :

জাহাজের নির্দিষ্ট গতিপথের উপর ভিত্তি করিয়া বীমাচুক্তি সম্পাদিত হইলে দেখিতে হইবে যেন সেই গতিপথ ভ্রষ্ট না হয়। তবে বিশেষক্ষেত্রে, যেমন প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা, জীবনরক্ষা, খালাসীদের বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণে গতিপথ পরিবর্তিত হইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বীমাচুক্তি বাতিল করা হয় না।

## মৌ-বীমার বিভিন্ন প্রকার পলিসি :

মৌ-বীমার বিভিন্ন প্রকারের পলিসির কয়েকটি নিয়ে উল্লেখ করা হইল :

(১) **Voyage Policy** : কোন একটি নির্দিষ্ট গমনপথে গমনকালে জাহাজ বা মালের ক্ষতিপূরণের জন্য এই প্রণীতির পলিসি গ্রহণ করা হয়। যেমন কলিকাতা হইতে লণ্ডন পর্যন্ত কোন জাহাজের যাত্রার জন্য বীমাচুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে।

(২) **Time Policy** : কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতিপূরণের জন্য এই জাতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। সাধারণত ৬ মাস হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত সময় স্থির করা হয়।

(৩) **Valued Policy** : বীমাপত্রে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্যের উল্লেখ থাকিলে তাহাকে Valued Policy বলা হয়।

(৪) **Open Policy** : এইরূপ Policy-তে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্যের উল্লেখ থাকে না।

(৫) **Floating policy** : বীমার বিষয়বস্তু যদি জাহাজ হয় সেক্ষেত্রে নীমাপত্রে যদি কোন নির্দিষ্ট জাহাজের নাম উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে 'Floating Policy' বলা হয়। একটি সমুদ্রযাত্রার নির্দিষ্ট গতিপথে

নিয়োজিত যে কোন জাহাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের বীমা-চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

### নৌ-বীমায় বিভিন্নপ্রকার ক্ষতি :

নৌ-বীমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি সাধারণত দুইপ্রকার হইতে পারে। যথা,—  
(১) সামগ্রিক ( Total ) ক্ষতি, (২) আংশিক ( Average ) ক্ষতি।  
আংশিক ক্ষতিকেও আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ আংশিক ক্ষতি ( General Average Loss ) এবং বিশেষ আংশিক ক্ষতি ( Particular Average Loss )।

(১) সামগ্রিক ক্ষতি—বীমার বিষয়বস্তুর অর্থাৎ জাহাজ বা পণ্যের যদি এমন ক্ষতি হয় যে তাহার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না তাহা হইলে তাহাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলা হইবে।

(২) সাধারণ আংশিক ক্ষতি—সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থাৎ পণ্য, মাণ্ডল ও জাহাজের মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি সাধন করা হয় তাহাকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। যেমন ঝড়ের মুখে জাহাজের নিরপত্তার জন্ত যদি কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে ইহা সাধারণ আংশিক ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে।

(৩) বিশেষ আংশিক ক্ষতি : আংশিক ক্ষতি সকল পক্ষের না হইয়া যদি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ বহন করে তাহা হইলে ইহাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। সাধারণ স্বার্থ রক্ষার পক্ষে এইরূপ ক্ষতি সাধন করা হয়।

### লয়েডসের দায় গ্রাহকগণ (Lloyd's Underwriters) :

নৌ-বীমার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর দায় গ্রাহক 'লয়েডসের দায়গ্রাহক বা 'লয়েডস্' (Lloyd's) এই নামে পরিচিত। ইহারা লয়েডস্ প্রতিষ্ঠানের অধীনে নৌ-বীমা সংক্রান্ত ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লয়েডস প্রতিষ্ঠানটি কোনরূপ নৌ-বীমার ঝুঁকি বহন করে না। ইহার অধীনে ঝুঁকি বাহকগণ বা দায়গ্রাহকগণ নৌ-বীমা সম্পর্কিত ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে।

লয়েডস প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে লণ্ডনের টাওয়ার স্ট্রীটে মিঃ লয়েড নামে এক ব্যক্তি একটা

কক্ষিধানার মালিক ছিলেন। এই কক্ষিধানায় বহু জাহাজের মালিক ও অন্যান্য বণিকগণ আসিত। যিঃ লয়েড তাঁহার খরিদারগণের সুবিধার জন্ত এবং কতকটা নিজের কৌতুহল মিটাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজের খবর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাহা খরিদারগণকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার কার্যক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং দেশে বিদেশে জাহাজের সংবাদ সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ সংবাদ সংগ্রহকারীরা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লয়েডসের কক্ষিধানায় প্রেরণ করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ঐ কক্ষিধানাই নৌ-বীমার দায়গ্রাহকগণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই সকল দায়গ্রাহক লয়েডসের দায়গ্রাহক (Lloyd's Underwriters) নামে পরিচিত হয়। বর্তমানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে নিযুক্ত লয়েডসের প্রতিনিধিগণ জাহাজ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা লন্ডনের কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিয়া থাকে।

### লয়েডসের রেজিস্টার (Lloyd's Register) :

নৌ-বীমার দায় গ্রাহকগণের সুবিধার জন্ত বিভিন্ন দেশের জাহাজ ও উহাদের অবস্থার সংবাদ সম্বলিত একটি বিবরণী দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহাকে 'লয়েডসের রেজিস্টার' বলা হয়। ৭২ জন সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকে—

- (১) জাহাজের নির্মানস্থান ও নির্মানের তারিখ,
- (২) জাহাজ নির্মানের উপাদান,
- (৩) জাহাজের আয়তন ও পণ্য-বহন ক্ষমতা,
- (৪) বর্তমান অবস্থা ও গুণাগুণ।

### লয়েডসের নৌ-বীমাপত্র গ্রহণের পদ্ধতি :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে 'লয়েডস' প্রতিষ্ঠানটি কোনরূপ নৌবীমার ঝুঁকি বহন করে না। ইহার অধীনস্থ দায়গ্রাহকগণই নৌ বীমার ঝুঁকি বহন করিয়া থাকে। দায়গ্রাহকগণের অধীনে আবার বহু সংখ্যক দালাল থাকে। বীমাগ্রহনেচ্ছু ব্যক্তির প্রথমত এই সকল দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া প্রিমিয়ামের হার উল্লেখ সমেত বীমার প্রস্তাব করে। দালাল ও এই সকল ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার লইয়া যথেষ্ট দর কষাকষি হয়। প্রামাণ্যমের হার সাব্যস্ত হইলে দালাল একটি কাগজে (Slip) পণ্যের বিবরণ, ওজন,

মূল্য, আহাজের নাম, কোন বন্দরে পণ্য প্রেরণ করা হইবে ইত্যাদি লিখিয়া প্রকৃত দায়গ্রাহকগণের নিকট ঐ কাগজ লইয়া উপস্থিত হয়।

দায়গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা ঐ বীমার দায়গ্রহণে সম্মত হয় তাহারা উক্ত :কাগজে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে ও নিজেরা প্রত্যেকে যে পরিমাণ টাকার দায় গ্রহণে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখ করে। এইরূপে বিভিন্ন দায়গ্রাহকগণ কর্তৃক বীমার মোট টাকার অঙ্ক পূরণ হইলে দালালগণ নৌ-বীমাপত্র রচনা করে। পূর্বোক্ত কাগজে (Slip) স্বাক্ষরকারীগণ পুনরায় ঐ বীমাপত্রে স্বাক্ষর করে এবং কত টাকার দায় গ্রহণ করিল তাহাও উল্লেখ করে। তাহার পর উপযুক্ত স্ট্যাম্প সহ বীমাপত্রটি বীমাকারীকে দেওয়া হইলে বীমাকারী প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করে।

সাধারণত বীমার বিষয় বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ১০ টাকা হারে বেশী মূল্য ধার্য করিয়া নৌ-বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভাড়া ও অগ্ন্যাগ্ন আত্মঘাতিক খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ অধিক মূল্য ধরা হয়। দালালগণ, প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ ভাগ দালালী পায়।

‘লয়েডস’ পদ্ধতি নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক দায়গ্রাহকগণের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করা হয়।

## জীবন বীমা (Life Assurance) :

### জীবন-বীমার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

**সংজ্ঞা :** নির্দিষ্ট সময় অন্তে বা তাহার পূর্বে মৃত্যু হইলে কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়ামের পরিবর্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিযুক্ত যে চুক্তি বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত হয় তাহাই জীবন বীমা চুক্তি।

### বৈশিষ্ট্য—

(১) নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন বীমা ক্ষতি-পূরণের চুক্তি (Contract of indemnity) শুধু বীমাচুক্তিতে উল্লিখিত ক্ষতি হইলেই ক্ষতি পূরণের প্রদান আসিবে। সুতরাং এই জাতীয় বীমার ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিততার ভাব আছে। কিন্তু জীবন বীমা ক্ষতি-পূরণের চুক্তি নহে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে বা পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে যথাক্রমে বীমাকারীকে বা তাহার উত্তরাধিকারীকে বীমার অর্থ দিতেই হইবে। সুতরাং ইহার মধ্যে একটি

নিশ্চয়তার ভাব আছে। এই জন্ত ইহাকে নিশ্চয়তার চুক্তি (Contract of Assurance) বলা যায়।

(২) জীবন-বীমার ক্ষেত্রেও বীমাযোগ্য স্বার্থের (Insurable Interest) অবস্থিতি প্রয়োজন। বাহার জীবনের উপর বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার মৃত্যু ঘটিলে বীমাকারীর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। নিজের জীবনের উপর প্রত্যেকেরই আর্থিক স্বার্থ আছে ইহা বলা বাহুল্য। ইহা ছাড়া স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর আর্থিক স্বার্থ আছে। কেননা স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। অল্পরূপ পিতা পুত্রের জীবনের উপরেও পারস্পরিক আর্থিক স্বার্থ জড়িত হুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে জীবন-বীমা গ্রহণ করা যায়।

(৩) জীবন-বীমার ক্ষেত্রেও বীমার বিষয় বস্তু অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে বাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য অকপটে প্রকাশ করিতে হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখিলে বীমাচুক্তি বাতিল হইয়া যায়।

**বিভিন্ন ধরনের জীবন বীমাপত্র (Different kinds of Life Policy) :**

জীবন-বীমা পত্র প্রধানত দুই প্রকার হইতে পারে। যথা—

**আজীবন জীবন-বীমাপত্র (Whole life Policy) :** এইরূপ বীমাপত্রে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম বীমা গ্রহণকারীকে আজীবন দিতে হয়। বীমা গ্রহণকারীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা বীমার অর্থ পায়। বিধবা পত্নী বা নাবালক শিশু পুত্রের জন্ত আর্থিক সংস্থান করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বীমাপত্র গ্রহণ কর হইয়া থাকে।

আজীবন জীবন-বীমা আরও এক ধরনের হইতে পারে। বীমাপত্র-গ্রহণকারী ইচ্ছা করিলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিয়া জীবন-বীমা করিতে পারে। ইহাকে বলা হয় 'Whole life limited payment policy'। অবশ্য এক্ষেত্রেও বীমাকারীর মৃত্যুর পরেই বীমার অর্থ পাওয়া যাইবে।

**মেয়াদী জীবন-বীমাপত্র :**

এই ক্ষেত্রে বীমাগ্রহণ-কারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়স্কালের জন্ত বীমাপত্র গ্রহণ করে। সেই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে বীমাগ্রহণকারী বীমার অর্থ পাইয়া থাকে। অবশ্য নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহার

মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারীরা বীমার অর্থ পায়। এইরূপ বীমার জন্ম নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হয়। সাধারণত ১০, ১৫ ২০, ২৫ প্রভৃতি বৎসরের জন্ম এইরূপ জীবন বীমা করা হইয়া থাকে।

আজীবন জীবন বীমা ও মেয়াদী জীবন বীমা আবার (১) মুনাফা সহ (with profit) এবং (২) মুনাফা-বিহীন (without profit) হইতে পারে।

মুনাফা সহ জীবন বীমা গ্রহণ করা হইলে বীমাগ্রহণকারী বীমা সংস্থার মুনাফার অংশ ও পায়। এইরূপ জীবন বীমার প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত অধিক।

মুনাফা বিহীন জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহণকারী বীমা সংস্থার মুনাফার কোন অংশ পায় না।

জীবন-বীমাকে আবার (১) একক জীবন-বীমা (Single Life policy) ও যৌথ জীবন বীমা (Joint Life Policy) এই দুই ভাবে ও বিভক্ত করা যায়।

একজন ব্যক্তির জীবনের উপর যে জীবন-বীমা তাহাই একক জীবন-বীমা।

আমার একাধিক ব্যক্তির জীবনের উপর ও যৌথ জীবন বীমা করা যায়। অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ উপার্জনকম স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি পরস্পরের জীবনের উপর যৌথ-জীবন-বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বীমার মেয়াদের মধ্যে একপক্ষের মৃত্যু ঘটিলে অপর পক্ষ বীমার টাকা পাইবে কিন্তু মেয়াদের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু না হয় তাহা হইলে মেয়াদ অন্তে বীমার টাকা প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

বর্তমানে আরও নানাধরণের জীবন-বীমা প্রচলিত হইয়াছে।

### জীবন বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ :

জীবন-বীমার প্রিমিয়ামের হার সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা হয়।—

(১) জীবন কালের সম্ভাব্যতা (Probable life time)

(২) চক্রবৃদ্ধি হার (Rate of compound Interest)

কোন ব্যক্তির জীবন কাল কি রকম হওয়া সম্ভব বা তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা কতটা ইহা বিশেষ গাণিতিক হিসাবে নির্ণয় করা হয়। এই হিসাব বিশেষজ্ঞ ‘একচুম্বারিগণ’ মৃত্যুহার তালিকা (Mortality Table) সাহায্যে



প্রদত্ত করে। এমন ভাবে প্রিমিয়ামের হার নির্ণয় করা হয় বাহাতে কোন কোন বীমা গ্রহণকারীর বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু হইলে বীমা কোম্পানীর সামগ্রিক ক্ষতি না হয়।

জীবন বীমার যে প্রিমিয়াম স্থির করা হয়, দেখিতে হইবে যেন তাহা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া মেয়াদ অন্তে বা তাহার পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে দেয় বীমার টাকার সম পরিমাণ হয়। সুতরাং স্বদের হার অত্যন্ত বড় পূর্বক নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ বীমা চুক্তির সময়েই এই স্বদের হার স্থির করা হয় এবং পরে ইহা পরির্তন যোগ্য নয়।

• জীবন-বীমা প্রিমিয়ামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) খাঁটি প্রিমিয়াম (pure premium)—উপযুক্ত উপায়ে এইরূপ প্রিমিয়ামের হার নির্ণয় করা হয়।

(২) মিশ্র বা ভারাক্রান্ত প্রিমিয়াম (Loaded premium) খাঁটি প্রিমিয়ামের অর্থের পরিমাণ ছাড়াও ইহাতে কোম্পানীর অফিস পরিচালন ব্যয়, এক্সেন্টদের কমিশন, ইত্যাদির অংশবিশেষ ও ইহাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

**জীবন-বীমা সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :**

**প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value) :**

বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বীমাগ্রহণকারী যদি নিয়মিত প্রিমিয়াম দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে কোম্পানীর নিকট বীমা পত্র প্রত্যর্পণ (Surrender) করিয়া সে কিছু অর্থ পাইতে পারে। প্রত্যর্পনের সময় পর্যন্ত বৃত্ত প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে কোম্পানীর খরচ বাবদ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট বীমাগ্রহণকারীকে দেওয়া হয়। ইহাকে বলে প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value) সাধারণত দুই বৎসর কাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম না দিলে এইরূপ প্রত্যর্পণ মূল্য দেওয়া হয় না।

**আদায়ীকৃত বীমা-পত্র (Paid-up Policy)**

কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিবার পর যদি কোন বীমা-গ্রহীতা কোম্পানীকে জানাইয়া দেয়—আর তাহার পক্ষে প্রিমিয়াম চালাইয়া রাখা সম্ভব নয় এবং যে পরিমাণ প্রিমিয়ামের অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহার সুযোগ হইতে সে যেন বঞ্চিত না হয় এইরূপ অনুরোধ যদি করা হয় তাহা

হইলে বীমা কোম্পানী ঐরূপ বীমাপত্রকে 'আদায়ীকৃত বীমাপত্র' বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অথবা তাহার পূর্বে বীমাগ্রহণকারীর মৃত্যু ঘটিলে ঐ অর্থ বীমা কোম্পানী প্রদান করিয়া থাকে। বীমাপত্রের 'আদায়ীকৃত বীমাপত্রে' পরিণত করিতে হইলে অন্ততপক্ষে দুই বৎসর কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়।

**অটম্যাটিক বিনষ্ট না হওয়ার ব্যবস্থা ( Automatic Non-forfeiture ) :**

প্রিমিয়ামের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে বীমাপত্র বিনষ্ট হয়। কিন্তু এইভাবে পলিসি বা বীমাপত্র যাহাতে সরাসরি বিনষ্ট না হয় তাহার জন্য বীমাপত্রে সাধারণত একটি সর্ত থাকে। এই সর্ত অনুসারে ঐ বীমাপত্র যদি প্রত্যর্পণ মূল ( Surrender value ) অর্জন করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রিমিয়ামের বাবদ দেয় টাকা ঐ প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে কাটিয়া রাখা হয়। প্রত্যর্পণ মূল্য নিশেষ হইয়া যাইবার পরও যদি প্রিমিয়ামের টাকা পাওয়া না যায় তাহা হইলে বীমাপত্র বিনষ্ট হয়।

**হস্তান্তর করণ ( Assignment ) :**

বীমাপত্র হস্তান্তর যোগ্য। দান হিসাবে অথবা কোন ঋণের জামানতরূপে ইহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

**বোনাস ( Bonus ) :**

বীমা কোম্পানী হিসাব করিয়া যদি দেখিতে পায় যে ইহার যথেষ্ট মুনাফা থাকিবে তাহা হইলে মুনাফার অংশ বিশেষ 'বোনাস' হিসাবে ঘোষণা করে। এই বোনাসের টাকা নগদ না দিয়া বীমার টাকার সহিত যুক্ত করা হয়।

**ভারতে জীবন-বীমার রাষ্ট্রীয়করণ ( Nationalisation of Insurance in India ) :**

ভারতে ১৯৫৬ সালে সমস্ত বীমা-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ কোটি টাকার মূলধন লইয়া একটি কর্পোরেশন বা সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর ও দিল্লীতে আঞ্চলিক অফিস আছে।

### অজ্ঞাত কয়েকপ্রকার বীমা :

(১) শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা (Workmen's Compensation Insurance) :

সাধারণত কারখানার মালিকগণ এইরূপ বীমা করে। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকগণের কার্যকালে কোন দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি হইলে আইনত মালিক ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। প্রথমত মালিক নিজেই এই ক্ষতিপূরণ করে। তবে এই ঝুঁকির হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য মালিক বীমা কোম্পানীর সঙ্গে এই ধরনের বীমা চুক্তি সম্পাদন করে।

(২) মোটর বীমা ( Motor Insurance ) :

যাতায়াতের সময় রাজপথে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে (ক) মোটরের ক্ষতি অথবা (খ) তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি এই দুই প্রকার ক্ষতি-পূরণের জন্য যে বীমা ব্যবস্থা তাহাকে মোটর বীমা বলা হয়। মোটরের ক্ষতি হইলে অথবা মোটরে চাপা পড়িয়া রাজপথে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মৃত্যু বা অঙ্গহানি জনিত ক্ষতিপূরণের জন্য এই ধরনের বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারতে বর্তমানে এই শ্রেণীর বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

(৩) অপহরণ বীমা ( Burglary Insurance ) :

এইরূপ বীমাচুক্তির দ্বারা চুরি, ডাকাতির জন্য বীমাগ্রহীতার যে ক্ষতি হয় বীমাকারী তাহা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাধারণ ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় বীমাচুক্তি সম্পাদন করে।

(৪) অর্থ-প্রেরণ বীমা ( Cash-in-transit Insurance ) :

যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে অর্থ প্রেরণ করা হয় তখন মধ্যপথে তাহা খোয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ইহার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য এই জাতীয় বীমাচুক্তি সম্পাদিত হয়।

(৫) কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমা ( Employee's State Insurance ) :

১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য এই শ্রেণীর বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত অর্থে একটি রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল গঠিত হইয়াছে। যে সকল কর্মচারীর মাসিক আয় ৪০০০ টাকার কম তাহারা এই বীমা ব্যবস্থার সুযোগ লইবার

অধিকারী। কর্মচারীরা তাহাদের আয়ের অস্থপাতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করে। এই উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রীয় বীমা সংস্থা ও গঠন করা হইয়াছে।

### অনুশীলনী

(1) What do you understand by Insurance ? Describe in short the different types of Insurance.

( বীমা বলিতে কি বুঝায় ? সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের বীমা-ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

(2) What is fire Insurance ? What are the different types of fire policy ?

( অগ্নি-বীমা কাকে বলে ? অগ্নি-বীমার বিভিন্ন প্রকারের বীমাপত্র কি কি ? )

(3) What is Marine Insurance ? What are the three kinds of Marine Insurance ?

( নৌ-বীমা কাকে বলে ? নৌ-বীমার বিষয়বস্তু কি কি হইতে পারে ? )

(4) What is warranty ? What are its essential Contents ?

( অপরিহার্য শর্ত কাকে বলে ? ইহার প্রধান বিষয় কি ? )

(5) What do you understand by Lloyd's under writers ? How do they effect transactions ?

( লয়েডসের দায় গ্রাহকগণ কারা ? ইহারা কি উপায়ে কার্য সম্পাদন করে। )

(6) Write Short notes on :—(a) General Average Loss (b) Particular Average Loss (c) Lloyd's Register.

( সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) সাধারণ আংশিক ক্ষতি (খ) বিশেষ আংশিক ক্ষতি (গ) লয়েডস রেজিষ্টার।

(7) What do you understand by Life Assurance ? What are its characteristic ?

( জীবন-বীমা কাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য কি ? )

(8) What are the different kinds of life policy ?

( বিভিন্ন ধরনের জীবন পত্র সম্বন্ধে বাহা জান লিখ )

(9) Write short notes on :—

(a) Surrender Value, (b) Paid-up Value, (c) Assignment of policy (d) Workmen's Compensation Insurance (e) Employee's state Insurance.

## একাদশ অধ্যায়

### যানবাহন ব্যবস্থা (Transport) :

বর্তমান জগতে কৃষিজ ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্যের বহুল উৎপাদন হইতেছে। ফলে, উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্ত এবং উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষীকরণ ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে কোন দেশেই এখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় অপরিহার্য। সুতরাং যানবাহন ব্যবস্থা আছে বলিয়াই এইরূপ পণ্য বিনিময় সম্ভব হইতেছে।

আবার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ও উত্তম যানবাহন ব্যবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কোন কোন দেশে বিশেষ কৃষিজ ফসল রপ্তানির উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করা হয়। কিন্তু উত্তম যানবাহন ব্যবস্থা থাকার জন্তই এই ধরনের ফসলের বহুল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যেই বহুল পরিমাণ গম উৎপাদন করে। যানবাহনের উত্তম ব্যবস্থার ফলে রপ্তানির সুযোগ আছে বলিয়াই এই সকল দেশে গমের এই বিপুল উৎপাদন করা হয়। শিল্পক্ষেত্রেও কাঁচামালের যোগান ও শ্রমিক সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিক্রয়ক্ষেত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া যানবাহন ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ভারতবর্ষের চা ও পাটদ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগই রপ্তানি করা হয়। কিন্তু সুতরাং যানবাহন ব্যবস্থা না থাকিলে এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানি সম্ভব হইত না। সুতরাং ভারতীয় চা ও পাট শিল্পের যে উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি তাহা বিশেষভাবে এই যানবাহন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক এই সকল শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের জীবন ধারণের উপযোগী আর্থিক সংস্থান করিতেছে। সুতরাং যানবাহন ব্যবস্থা যে শুধু কৃষি বা শিল্পের উন্নতির সহায়ক তাহা নয়, ইহা বাহ্যিক আর্থিক জীবনের উন্নতির সহায়ক।

### পরিবহনের বিভিন্ন প্রকার (Different kinds of Transport) :

পরিবহনের প্রধানত তিনটি ব্যবস্থা আছে। যথা :—

(১) স্থলপথ, (২) জলপথ, (৩) আকাশ পথ। এই তিন ব্যবস্থায় বিভিন্ন রকমের যান ব্যবহৃত হয়। যেমন স্থলপথে মানুষ, পশু, মোটর, রেল, প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ জলপথে নৌকা ও জাহাজ এবং আকাশ পথে বিমানের দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়।

### স্থলপথে পরিবহন (Land Transport) :

স্থলপথকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—

(১) সড়ক (Road) (২) রেলপথ (Railway).

#### সড়ক (Road) :

সড়কপথে পরিবহনের ব্যবস্থা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান জগতে আরও নানাদিকারের উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও সড়ক পথে পরিবহনের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সড়কে যে সকল যান সাধারণত চলে তাহার মধ্যে মোটরই সর্বপ্রধান। রাস্তা পাকা (metalled) ও সমতল হইলে মোটর যানে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের বিশেষ সুবিধা হয়।

### সড়কের সুবিধা-অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

#### সুবিধা—

(১) দূর গ্রামাঞ্চলে বা অন্তর্ভুক্ত যেমন বহুব্যয়ে রেলপথ নির্মাণ করা সুবিধাজনক বা লাভজনক নয় সেখানে সড়ক নির্মাণ করিয়া পরিবহনের ব্যবস্থা করা যায়।

(২) রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বিপুল ব্যয় হয় সেই তুলনায় সড়কের জন্য ব্যয় অনেক কম।

(৩) স্বল্প দূরবর্তী স্থানে দ্রুত পণ্য প্রেরণের জন্য সড়ক উপযোগী। বিশেষত যে সকল দ্রব্য সহজে পচনশীল, যেমন ফলফুল, মংস্ত, মাংস ইত্যাদি। ইহাদের স্থানান্তরে প্রেরণের পক্ষে সড়কই উপযুক্ত পথ।

(৪) রেলপথের একটি অসুবিধা এই যে দেশের সর্বত্র রেললাইন নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে রেললাইন নির্মাণ করা যায় না সেখানেও

অনেক ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং ইহার দ্বারা এই সব স্থানেও পণ্য লেনদেন করা যায়।

### অসুবিধা :

(১) বেশি দূরবর্তী স্থানে এই পথে পণ্য প্রেরণ করা অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় সাধ্য।

(২) পথিমধ্যে মোটর যান বিকল হইয়া গেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও নিয়মিতভাবে পণ্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে ও মোটরযানে অধিক দূরবর্তী স্থানে পণ্য প্রেরণ অসুবিধা জনক।

(৩) বেশি ওজনের দ্রব্য মোটর যানে প্রেরণ করা যায় না।

(৪) কাঁচা রাস্তায় মোটর যান চলাচলে অসুবিধা হয়।

### ভারতের সড়ক-পরিবহন ব্যবস্থা :

ভারতে এখনও রেলপথের সম্প্রসারণ আশাহ্বরূপ হয় নাই বলিয়া সড়ক পরিবহনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এখনও সড়কই দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম।

ভারতে সড়ক পরিবহনের জন্ত বন্দ, মহিষ ইত্যাদি পশু চালিত গাড়ী ও যেমন ব্যবহৃত হয়, আবার মোটর যানের প্রচলনও আছে। অবশ্য আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মোটর যানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

স্বাধীনতার পর ভারতে সড়ক নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ফলে কয়েকটি জাতীয় সড়ক (National Highways) নির্মিত হইয়াছে। যেমন, কলিকাতা-মাত্রাজ রাজপথ, কলিকাতা-দিল্লী রাজপথ, কলিকাতা-বোম্বাই রাজপথ ইত্যাদি। এই সকল জাতীয় সড়ক নির্মাণ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ রাজ্যে সড়ক পরিবহনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিবহন সংস্থা গড়িয়া তুলিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন সংস্থার উল্লেখ করা যায়।

ভারতের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গুলিতে ও হুতন হুতন সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

**রেলপথ :** রেলপথ আভ্যন্তরীণ পরিবহনের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বস্তুতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতির উপর রেলপথের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। রেলপথের কয়েকটি সুবিধা অসুবিধার উল্লেখ করা হইল।

### সুবিধা :

(১) ইহা অধিক দূরবর্তী স্থানে ভারী পণ্য প্রেরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(২) ইহার মাধ্যমে অধিক দূরবর্তী-স্থানের। পণ্যের আদান প্রদান বা যাত্রীর গমনাগমন অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাধ্য।

(৩) নিয়মিত ও সময় মত এবং দ্রুত পণ্য প্রেরণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(৪) রেলের ভাড়া কম বলিয়া ইহাতে পণ্য প্রেরণের ব্যয় ও কম হয়।

(৫) ইহাতে দ্রুত পণ্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা যায় বলিয়া উদ্ধৃত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে দ্রুত পণ্য সরবরাহ করিয়া পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এবং ইহার দ্বারা পণ্যমূল্যের দ্রুত পরিবর্তন রোধ করা যায়।

### অসুবিধা :

(১) স্বল্প দূরবর্তী স্থানে অথবা অধিক দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থা সুবিধাজনক নয় অথবা সম্ভব নয়।

(২) ভূপ্রকৃতি ও অস্বাভাবিক ভৌগোলিক পরিবেশের উপর রেললাইন নির্মাণ নির্ভর করে। সেই জন্য যে সকল স্থানে উপযুক্ত পরিবেশ নাই সেইখানে রেলপথে পরিবহনের ব্যবস্থা করা যায় না।

(৩) রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

(৪) রেলপথে গাড়ী নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে চলাচল করে। কলে এই পথের স্বতন্ত্র এবং যে কোন সময়ে গাড়ীতে পণ্য তোলা বা গাড়ী হইতে পণ্য খালাস করা অথবা যাত্রীদের গাড়ীতে উঠানামা করা সম্ভব নয়। সুতরাং রেল পথে সরাসরি যাতায়াত ও যেমন সম্ভব নয়—যাতায়াতে সময় ও বেশি লাগে।

(৫) অনেক সময় বিশেষ মালের উপর অধ্যক্ষিক মাসুল আদায় করা হয়।

(৬) রেলে পণ্য প্রেরণ করিতে ও রেল হইতে পণ্য খালাস করিতে নানারূপ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া ইহাতে সময় বেশি লাগে।



### রেলপথে পণ্য প্রেরণের পদ্ধতি :

রেলপথে পণ্য প্রেরণের পূর্বে তাহা উত্তমরূপে মোড়াই (Packing) করিতে হয়। মোড়কের উপর প্রেরকের ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পণ্যের ওজন, পণ্যের প্রকৃতি, যে স্টেশনে পণ্য খালাস করা হইবে তাহার নাম, এবং তাহা কোন রেলঅঞ্চলে (Railway Zone) অবস্থিত এই সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর উহা মাল অফিসে (Goods Office) লইয়া যাইতে হয় এবং সেইখানে প্রথমত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া একটি পণ্য প্রেরণ লিপি (Consignment Note) পূরণ করিতে হয়।

- (১) পণ্যের প্রকৃতি, মূল্য ওজন ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ ;
- (২) প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;
- (৩) যে স্টেশন হইতে পণ্য প্রেরণ করা হইতেছেও যে স্টেশনে ইহা খালাস করা হইবে তাহার নাম ;
- (৪) মাণ্ডল পণ্য প্রেরণের সময় দেওয়া হইবে না, পণ্য খালাস করিবার সময় দেওয়া হইবে ;
- (৫) পণ্য রেলওয়ের দায়িত্বে অথবা মালিকের দায়িত্বে প্রেরণ করা হইতেছে কিনা।

যখন পণ্য রেলওয়ের দায়িত্বে (Railway's Risk) প্রেরণ করা হয়, চলাচলের সময় সেই পণ্যের কোন ক্ষতি হইলে তাহা রেলওয়ে পূরণ করিবার দায়িত্ব বহন করে। আর, পণ্য যদি মালিকের দায়িত্বে (Owners Risk) প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে চলাচল কালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহার ক্ষতি রেলপথ দায়ী হয় না। মালিকের দায়িত্বে পণ্য প্রেরণ করা হইলে মাণ্ডল কম হয়। কিন্তু রেলওয়ের দায়িত্বে প্রেরণ করা হইলে মাণ্ডল অপেক্ষাকৃত বেশি পড়ে।

উপর্যুক্ত প্রেরণ লিপি (Consignment Note) মাল অফিসে জমা দিলে আনুপ্রাপ্ত কর্মচারী পণ্যের মোড়কটি যথাবিহিত পরীক্ষা করিয়া একটি প্রাপ্তি রসিদ (Railway Receipt) প্রেরকের হাতে দেয়। পণ্য মালিকের দায়িত্বে প্রেরণ করা হইলে "Owner's Risk" বা সংক্ষেপে "O.R" এবং রেলওয়ের দায়িত্বে প্রেরণ করা হইলে "Railway's Risk" বা সংক্ষেপে "R. R" এই দুইটি কথা রসিদে লেখা হয়। তাহা ছাড়া পণ্যের মাণ্ডল যদি প্রাপক কর্তৃক

দেওয়া হয় তাহা হইলে 'Freight to pay' এই কথা কয়টি ও রসিদে লেখা হইয়া থাকে। ঐ রসিদ প্রেরক প্রাপকের নিকট পাঠাইয়া দেয়।

গন্তব্যস্থলে পণ্য পৌছিলে- রেলবিভাগ হইতে প্রাপকের নিকট একটি নির্দেশপত্র (Advice Note) প্রেরণ করা হয়। ঐ নির্দেশপত্র পাওয়ার পর প্রাপক উপযুক্ত রেল রসিদ অফিসে জমা দিয়া পণ্য খালাস করে। নির্দেশ-পত্রে কতদিনের মধ্যে পণ্য খালাস করিতে হইবে তাহার নির্দেশ থাকে। ঐ সময়কে বলা হয় স্থিতিকাল বা 'Lay Days'। উক্ত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস করা না হইলে খেসারত (Demurrage) দিতে হয়। যেখানে মাণ্ডল দিয়া পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করা হয় সেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস করা না হইলে রেল কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়া ঐ পণ্য প্রকাশ্য নিলাম করিতে পারে। আবার প্রাপকের ও যদি রেলবিভাগের নিকট কোন ক্ষতিপূরণের দাবী থাকে তাহা হইলে পণ্য খালাসের পূর্বে তাহা রেলকর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে এবং ছয় মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্ত দাবী করিতে হইবে। উক্ত সময়ের পরে রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষতি পূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

### ভারতবর্ষে রেলপথ (Indian Railways) :

ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় রেলপথের বিস্তার আশাহরূপ হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত এই রেলপথের সম্প্রসারণ নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারতসরকার রেলপথের উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। ভারতে রেলওয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ভারতে রেল চলাচলের শুরু হয় ১৮৫৩ সালে। তাহার পর হইতে ইহার সম্প্রসারণ হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে এশিয়ার মধ্যে রেলপথের বিস্তারের দিক হইতে ভারতবর্ষই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ৩১ হাজার মাইল রেলপথ আছে।

বর্তমানে ভারতীয় রেলপথকে পূর্ণবিজ্ঞাস করিয়া মোট আটটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

- (১) পূর্বাঞ্চল ( Eastern Zone )
- (২) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ( South-Eastern Zone )
- (৩) উত্তর-পূর্বাঞ্চল ( North-Eastern Zone )
- (৪) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ( North-Eastern Frontier Zone )
- (৫) মধ্য

অঞ্চল (Central Zone) (৬) দক্ষিণাঞ্চল (Southern Zone) (৭) পশ্চিমাঞ্চল (Western Zone) (৮) উত্তরাঞ্চল (Northern Zone)।  
প্রত্যেক অঞ্চলের রেলওয়ের সীমা নির্দিষ্ট করা আছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে রেলপথের উন্নতি ও সম্প্রসারণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

### জলপথ (Waterways) :

জলপথের পরিবহনকে সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—  
(১) আভ্যন্তরীণ জলপথ, যেমন, নদনদী, খাল ইত্যাদি (২) উপকূলীয় সমুদ্রপথ অর্থাৎ উপকূলে এক বন্দর হইতে অত্র বন্দরে সমুদ্রপথে পণ্য স্থানান্তর করার ব্যবস্থা (৩) সমুদ্র পথ—সাধারণতঃ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত।

### জলপথের সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধা :—(১) অত্রাণ পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় জলপথের সামগ্রিক ব্যয় অনেক কম। নদী, সমুদ্র ইত্যাদি প্রকৃতির দান। সুতরাং ইহা নির্মাণের কোন ব্যয় নাই।

(২) ভ্রূব ভ্রব্যাদি জলপথে প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।

(৩) ভারী পণ্য অল্প মাত্রে জলপথে প্রেরণ করা যায়।

(৪) সমুদ্রপথে বিস্তৃত এলাকায় পণ্য আদান-প্রদান করা যায়।

### অসুবিধা :

(১) রেল ও মোটর পরিবহনের তুলনায় ইহা মন্থগতি।

(২) নদী পথে বহু দূরবর্তী স্থানে পণ্য প্রেরণ করা যায় না। আবার নদী পথে বড় বড় জাহাজ চলাচলেরও অসুবিধা।

(৩) বৎসরের সব সময় জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নাও হইতে পারে। যে সকল নদীতে গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যায় অথবা যে সকল নদী শীতকালে বরফাবৃত হয়, সেই সকল নদীপথে ঐ সময়ে কোন পণ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় না। আবার ঝড় ঝঞ্ঝাতেও জলপথ অসুপযোগী হইয়া উঠিতে পারে।

### সমুদ্রপথে পরিবহন (Ocean Transport) :

জলপথের মধ্যে সমুদ্র পথের গুরুত্ব সর্বাধিক। বস্তুতঃ বহির্বাণিজ্য অধিকাংশ সমুদ্রপথেই সংগঠিত হয়।

সমুদ্রগামী জাহাজকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :—  
 (১) লাইনার (Liner) এবং (২) ট্রাম্প (Tramp)। যে জাহাজ দুইটি নির্দিষ্ট বন্দরের মধ্যে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলাচল করে তাহাকে ‘লাইনার’ বা নির্দিষ্ট পথে চলাচলকারী জাহাজ বলা যায়। এইরূপ জাহাজ নির্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্যপথে যাতায়াত করিতে পারে না এবং যে সময়ে বন্দর ছাড়িবার কথা তাহা মানিয়া চলিতে হয়। যেমন—এইরূপ জাহাজ যদি কলিকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে স্নয়েজ খালপথে যাতায়াত করে তাহা হইলে ইহাকে স্নয়েজ পথেই যাতায়াত করিতে হইবে। কোন কারণে উত্তমাশা অন্তরীপ পথে যাওয়া চলিবে না। আবার কলিকাতা ও লণ্ডন বন্দর হইতে যে সময়ে ঐ জাহাজ ছাড়িবার কথা ঐ নির্দিষ্ট সময়েই তাহা ছাড়িতে হইবে, কোনরূপ বিলম্ব করা চলিবে না বা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও ছাড়া চলিবে না। এইরূপ জাহাজ পণ্য এবং যাত্রী বহন করে।

‘ট্রাম্প’ বা অনির্দিষ্ট পথে চলাচলকারী জাহাজের গতিপথ নির্দিষ্ট নয় এবং ইহাদের যাতায়াতের সময়ও নির্দিষ্ট নয়। ইহারা যে কোন বন্দরের মধ্যে এবং যে কোন সময়ে যাতায়াত করিতে পারে। এইরূপ জাহাজ সাধারণত পণ্য বহন করে, যাত্রী বহন করে না।

### জাহাজের মাণ্ডল :

ট্রাম্পের মাণ্ডল লাইনারের মাণ্ডল হইতে অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে লাইনার ট্রাম্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। লাইনারের মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে একটি সভা বা কনফারেন্স করিয়া নিজেরা একটি মাণ্ডলের ব্যবস্থা করে। এই ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হয় যে প্রত্যেক লাইনার নির্দিষ্ট পথে চলাচলের সময় সমান হারে মাণ্ডল আদায় করিবে। এই ব্যবস্থাই ‘কনফারেন্স প্রথা’ নামে পরিচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় ‘Deferred Rebate System’ নামে আর একটি ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ইহাতে স্থির হয় যে কোন বণিক যদি কোন নির্দিষ্ট পথে কোন নির্দিষ্ট জাহাজে পণ্য বহন করে তাহা হইলে তাহাকে মাণ্ডলের উপর কিছু বাট্টা দেওয়া হইবে। কোন কোন দেশে এই প্রথাকে আইনত অসিদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে চুক্তি প্রথা বা Agreement System নামে আর একটি ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে জাহাজী কোম্পানী ও জাহাজে পণ্য প্রেরকের মধ্যে একটি

চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে পণ্য প্রেরক তাহার সমস্ত পণ্য কোন জাহাজী কোম্পানী মারফৎ প্রেরণে স্বীকৃত হয় এবং তাহার পরিবর্তে জাহাজী কোম্পানী নির্দিষ্ট মাণ্ডল গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইহা ছাড়া জাহাজে স্থান সঙ্কলনের প্রতিশ্রুতি এবং নিয়মিত পণ্য পরিবহনের প্রতিশ্রুতি ও দেওয়া হইয়া থাকে।

### চার্টার পার্টি ( Charter Party ) :

কোন জাহাজের মালিক যদি কোন পণ্য প্রেরককে নির্দিষ্ট মাণ্ডলের পরিবর্তে সম্পূর্ণ জাহাজ বা তাহার অংশবিশেষ পণ্য প্রেরণের জন্ত ব্যবহার করিতে দেয় তাহা হইলে যে চুক্তি অনুসারে উভয়ের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা সেই চুক্তিকে **চার্টার পার্টি** বলা হয়। এই চুক্তি পত্রে বিভিন্ন ধারা থাকে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের নাম।
- (২) জাহাজের দাতায়াতের শর্ত।
- (৩) জাহাজটি সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত কিনা।
- (৪) যে বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িবে তাহার নাম।
- (৫) জাহাজ ছাড়িবার সময়।
- (৬) পণ্য ও মাণ্ডলের বিবরণ।
- (৭) সামুদ্রিক বিপদের বিবরণ।
- (৮) স্থিতিকাল অর্থাৎ কি সময়ের মধ্যে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করিতে হইবে।

(৯) থেসারত অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস না করিলে জাহাজী কোম্পানীকে কি পরিমাণ অর্থ থেসারত দিতে হইবে।

(১০) জাহাজের অধাক্ষের কর্তব্য।

(১১) জাহাজ ভাড়াকারীর কর্তব্য।

উপরোক্ত ধারাগুলি ছাড়া প্রয়োজন হইলে ও অন্তর্ধারাও সংযোজন করা যায়।

‘চার্টার পার্টি’ চুক্তি দুই ধরণের হইতে পারে—

(১) ‘টাইম চার্টার’ যদি চুক্তি অনুসারে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত জাহাজ লওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে ‘টাইম চার্টার’ বলা হয়।

(২) ‘ভয়েজ চার্টার’—যদি কোন একটি নির্দিষ্ট যাত্রার জন্ত জাহাজ

ভাড়া লওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে 'ভয়েজ চার্টার' বলা হয় । এ নাদষ্ট যাত্রা যতদিন সংগঠিত না হইতেছে ততদিন চুক্তি বলবৎ থাকিবে ।

### বটম্রি ( Bottomry ) :

জাহাজ চলাচলের সময় পথিমধ্যে জাহাজ মেরামতের জন্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ ও জাহাজের মাল একসঙ্গে বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে । এইরূপ ঋণকে বলা হয় বটম্রি ( Bottomry ) এবং যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া এই ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাহাকে বলা হয় Bottomry Bond. নির্দিষ্ট বন্দরে জাহাজ পৌছবার পর এই ঋণ পরিশোধ করা হয় ।

### রেসপণ্ডেন্সিয়া ( Respondentia ) :

ইহাও এক ধবণের ঋণ এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কেবলমাত্র জাহাজের পণ্য বন্ধক রাখিয়া এইরূপ ঋণ সংগ্রহ করে ।

জাহাজ যদি নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছিতে না পারে তাহা হইলে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের ঋণই ঋণদাতা আদায় করিতে পারে না ।

### স্থিতিকাল ( Lay Days ) :

গন্তব্যস্থলে পৌছবার পর যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস করিতে হয় অথবা জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করিতে হয় তাহাকে স্থিতি কাল বা Lay Days বলা হয় ।

### থেসারত ( Demurrage ) :

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস করা না হইলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করান না হইলে অতিরিক্ত সময়ের জন্ত যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহাকে থেসারত বা Demurrage বলা হয় ।

### জেটিসন্ ( Jettison ) :

সমুদ্রে ঝড়ের মুখে জাহাজকে নিরাপদ করিবার জন্ত প্রয়োজন হইলে জাহাজের অধ্যক্ষকে অনেক সময় জাহাজের কিছু পণ্য সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া ভার লাঘব করিতে হয় । বিপদকালে এইরূপ পণ্য নিক্ষেপ করাকে বলে 'জেটিসন্' এবং জাহাজের অধ্যক্ষের এইভাবে পণ্য সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিবার অধিকার থাকে ।

### জাহাজের রিপোর্ট ( Ship's Report ) :

গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট জাহাজের পণ্য সংক্রান্ত যে বিবরণ দাখিল করিতে হয় তাহাকে 'জাহাজের রিপোর্ট' ( Ship's Report ) বলা হয়। এইরূপ রিপোর্ট দাখিল করা হইলেই জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা যায়।

### আকাশ পথে পরিবহন ( Air Transport ) :

অধুনা আকাশ পথে পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত দ্রুত পণ্য ও যাত্রীবহনের সুবিধা। অবশ্য যাত্রীবহনের জন্তই এই পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আকাশপথে পরিবহন ব্যয় বহুল বলিয়া পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার এখনও সীমাবদ্ধ।

### আকাশপথের সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধা :—(১) এই পথে অত্যন্ত দ্রুত গমনাগমন করা যায়।

(২) যে সকল স্থানের সঙ্গে অগ্রাগ্রহ পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা যায় না সেই সব স্থানে ও আকাশপথে সংযোগ স্থাপন ও রক্ষা করা যায়।

(৩) আকাশ পথ নির্মাণের কোন ব্যয় নাই।

(৪) আকাশপথে গমনাগমন বিশেষ আরামদায়ক।

### অসুবিধা :

(১) আকাশ পথ নির্মাণের কোন ব্যয় না থাকিলেও বিমান পথ নির্মাণ ও তাহার সংরক্ষণের ব্যয় অত্যধিক।

(২) বিমানপথে যাতায়াতের ভাড়া অত্যধিক বলিয়া ভারী পণ্য প্রেরণ লাভজনক নয়। ইহাতে কেবল মূল্যবান ও হালকা দ্রব্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।

(৩) আবহাওয়া প্রতিকূল হইলে আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

(৪) স্বল্প দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের পক্ষে ইহা উপযোগী নয়।

(৫) ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলিয়া কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ পরিবহন ব্যবস্থা চালনা করিবার জন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থান করা কষ্ট সাধ্য। এই কারণে বহু দেশে এই পরিবহন ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক

পরিচালিত হয়। ভারতবর্ষে ও ১৯৫০ সালের আইন অনুসারে বিমান-পরিবহন রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে।

### অনুশীলনী

(1) Explain with illustrations how Transport helps the development of Trade and Industry.

(পরিবহন ব্যবস্থা কিভাবে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির সহায়ক হয় তাহা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।)

(2) What do you understand by Rail-Transport? What are its advantages and dis-advantages?

(রেল পরিবহন বলিতে কি বুঝ? এই পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা কি কি?)

(3) Give an account of the procedure adopted for despatching goods by Rail.

(রেলপথে পণ্য প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।)

(4) What are the advantages and disadvantages of water Transport?

(জলপথের সুবিধা অসুবিধাগুলি কি কি?)

(5) What is a Charter Party? What are its important Clauses?

(‘চার্টার পার্টি’ কাকে বলে? ইহার প্রধান ধারাগুলি কি কি?)

(6) Write short notes on :—

- (a) Liner (b) Tramp, (c) Conference System  
(d) Lay days, (e) Demurrage, (f) Bottomry (g) Respondentia  
(h) Jettison.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

- (ক) লাইনার, (খ) ট্রাম্প, (গ) কন্ফারেন্স প্রথা, (ঘ) স্থিতিকাল  
(ঙ) খেসারত, (চ) বটম্মরি, (ছ) রেসপন্ডেন্সিয়া, জেটিসন।

(7) What do you understand by air Transport? What are its advantages and disadvantages?

(আকাশ পরিবহন বলিতে কি বুঝ? ইহার সুবিধা অসুবিধা কি কি?)





## দ্বিতীয় খণ্ড

### প্রথম অধ্যায়

#### বৈদেশিক বাণিজ্য—উহার প্রকৃতি ও কারণ

বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিতে আন্তর্জাতিক দ্রব্য বিনিময় বুঝায়। বর্তমান যুগে কোন দেশই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত করিতে পারে না এবং পারিলেও উহা স্বন্দর রূপে প্রস্তুত হয় না। তাই কিছু কিছু দ্রব্যের জন্য এক দেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরতাই আন্তর্জাতিক দ্রব্য বিনিময় বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক দেশ অন্য আর একটি দেশকে তাহার দ্রব্য দিল এবং বিনিময়ে ঐ দেশ হইতে পাইল সেবামূলক সহযোগিতা। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির বিনিময়কেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি অনেকটা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মতন :

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে উহা অনেকটা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতির মতন। আমাদের দেশে আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ গো-পালন করিয়া দুধ উৎপাদন করে, কেহ কৃষি করিয়া ধান উৎপাদন করে, কেহ ডাক্তার হইয়া সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে আবার কেহ গায়ক হইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করে। গয়লা, কৃষক, ডাক্তার ও গায়কের প্রত্যেকেই যদি গো-পালন, কৃষি, ডাক্তারি ও সঙ্গীত পরিবেশনে সমান দক্ষতা অর্জন করে এবং প্রত্যেকেই যদি ঐ সবগুলি কার্য সম্পাদন করে, তবে, ডাক্তার গয়লার নিকট হইতে দুধ কিনিবে না, গয়লা পয়সা দিয়া ডাক্তার ডাকিবে না, গায়ক কৃষকের নিকট হইতে কৃষি-জাত দ্রব্য কিনিবে না এবং কৃষক ও পয়সার বিনিময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শ্রবণইচ্ছিয়া সার্থক করিবার প্রয়াস পাইবে না। কিন্তু, উহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চারটি কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলেও ঐ গুলি সমান দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে না। তাই, যে কার্যে তাহার দক্ষতা সর্বাধিক কেবল সেই কার্যেই সে আত্মনিয়োগ করে এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করে।

এই রূপ অবস্থা দেশের সর্বত্র বিরাজমান বলিয়া ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় বা বাণিজ্য হয়। আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা যেমন পাট উৎপাদনে সক্ষম, বোম্বাইয়ের কৃষকরা সেইরূপ তুলা উৎপাদন করিতে সক্ষম। বোম্বাইর কৃষক পাট উৎপাদনে পশ্চিম বঙ্গের কৃষকের সমকক্ষ হইতে পারে না, এবং অল্পরূপ ভাবে পশ্চিম বঙ্গের কৃষক তুলা উৎপাদনে বোম্বাইর কৃষকের সমকক্ষ হইতে পারে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাইর মধ্যে পাট ও তুলা বিনিময় হওয়ার যুক্তি আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকরা বিভিন্ন বৃত্তিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, একই বৃত্তি বহুকাল ধরিয়া অধলম্বন করিয়া আসিতেছে বলিয়া এবং ঐ বিশেষ বৃত্তির অল্পতুল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঐ অঞ্চলে আছে বলিয়া। শ্রমের এই আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়াকে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা ভৌগলিক শ্রমবিভাগ (Territorial Division of Labour) বলে। বিনিময়ের অঞ্চল গুলি দেশের সীমার গণ্ডির বাহিরে ছড়াইয়া পড়িলেই ঐ বিনিময় বৈদেশিক বিনিময়ে নামান্তরিত হয়। কারণ কিন্তু ঐ একই রহিয়া গেল (ভৌগলিক শ্রম বিভাগ)। মিশরের কৃষকরা তুলা উৎপাদন করিতে বৃটেনের শ্রমিকের অপেক্ষা দক্ষ। আবার, বৃটেনের শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে মিশরের কৃষক হইতে দক্ষ। তাই, বৃটেন ও মিশরের মধ্যে যন্ত্র ও তুলার বিনিময় হয়। র্ত্তমান যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে, কোন দ্রব্য এখন অনেকগুলি রাষ্ট্রের সহযোগিতায়ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন, সুইডেনের নরম কাঠ হইতে আমেরিকায় মণ্ড তৈয়ারী হইল; ঐ মণ্ডের সহিত বাকী রাসায়নিক সহযোগে উহা গোয়ালয়রে রেন্নন হইল; ঐ রেন্নন সূতা হইতে বোম্বাইএ কাপড় তৈয়ারী হইয়া উহা পশ্চিম বঙ্গে আসিল এবং এখানে উহা হইতে রোডমেড পোষাক তৈয়ারী হইয়া পূর্ব পাকিস্থানে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইল।

উপরের আলোচনায় আমরা বলিয়াছি যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি অনেকটা একরূপ; কিন্তু কতকটা একরূপ বলিয়া সম্পূর্ণ একরূপ নহে। তাই উহাদের প্রকৃতির পার্থক্যও আমাদের আলোচনা করা কর্তব্য।

**আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতিগত বৈষম্য :**

প্রথমত, দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যেমন শ্রম এবং মূলধন স্রোতায়িত করে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে সেইরূপ ভাবে যাতায়াত করে

না। বাংলাদেশের বহু ময়ড়াকে দিল্লীতে রসগোল্লা তৈয়ারী করিতে দেখা যায় কিন্তু নিউইয়র্কে উহাদের তো তেমন দেখা যায় না। তেমনি ভাবে, মারোয়ারের মারোয়ারী কলিকাতায় মূলধন নিয়োগ করে কিন্তু তাহাদের লওনে তো দেখাই যায় না। এই প্রথম বৈষম্যকে আমরা শ্রম এবং মূলধনের গতির বৈষম্য ( Difference in mobility of labour and capital ) বলিতে পারি। এই গতির পার্থক্যের কারণ—ভাষাগত পার্থক্য, সমাজ রীতি, দেশপ্রীতি, সরকারী বাধা নিষেধ...ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক অপেক্ষা মূলধন বেশী গতিশীল।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। যেমন, একদেশের জলবায়ু, ভূমির প্রকৃতি এবং খনিজ অল্প দেশের জলবায়ু ভূ-প্রকৃতি এবং খনিজের অল্পরূপ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। তাই, নিউইয়র্ক যদি পাট চাষ করিতে চায় তবে বাংলাদেশ দেশ হইতে শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হইলেও বাংলা দেশের জমি ও জলবায়ু নিউইয়র্কে লওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, একই দেশের এক অঞ্চল হইতে অল্প অঞ্চলে মাল আদান প্রদানে, সাধারণত, সরকার কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এক দেশ হইতে অল্প দেশে মাল আদান-প্রদানে উভয় দেশই কিছু না কিছু বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশের মূল্য বিভিন্ন বস্তুকে বলিয়া উহাদের বিনিময়ে সমস্তা দেখা যায়। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বিক্রীত পণ্যের মূল্য টাকায় পরিশোধ হয়; কিন্তু কলিকাতা ও লওনের মধ্যে কেনা-বেচা হইলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্য হয় টাকাকে পাউণ্ডে নতুবা পাউণ্ডকে টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। এইরূপ রূপান্তরে বিনিময় হার ( Rate of Exchange ), বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ( Exchange control ) প্রভৃতি কতগুলি সমস্তা দেখা দেয়।

### আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি :

আমরা উপরে আলোচনা করিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ। ইহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, এক দেশ যখন কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না তখন সে অল্প দেশ হইতে সেই দ্রব্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে এক দেশ কোন এক দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইলেও ঐ দ্রব্য অল্প দেশ

হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সমস্তার সমাধান পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির ( Principle of comparative advantage or cost ) মধ্যে। এই নীতির মূল বক্তব্য এই যে, যে দেশের যে দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা সবচেয়ে বেশী সেই দেশ সেই দ্রব্য রপ্তানী করিলে এবং যে দেশের সেই দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা সবচেয়ে কম সেই দেশ সেই দ্রব্য আমদানী করিলে সকল দেশই লাভবান হইবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই যুক্তির তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক :

মনেকরি অস্ট্রেলিয়ায় দুই একক (unit) উৎপাদন-উপাদান ( factors of Production a, e, land, labour, capital ) আছে এবং ভারতেও দুই একক (unit) উৎপাদন-উপাদান আছে। ভারত প্রতি এককে ২০০ মণ পাট অথবা ২০০ মণ উল উৎপন্ন করিতে পারে এবং অস্ট্রেলিয়া প্রতি এককে ১০০ মণ পাট এবং ২০০ মণ উল উৎপন্ন করিতে পারে। যদি উভয় দেশই এক এককে পাট এবং অল্প এককে উল উৎপন্ন করে তবে নিম্নরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে :

(১)	পাট	উল
ভারত	২০০ মণ	২০০ মণ
অস্ট্রেলিয়া	১০০ মণ	২০০ মণ

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মোট = ৩০০ মণ ৪০০ মণ।

কিন্তু উল উৎপাদনে উভয় দেশ সমান দক্ষ হইলেও পাট উৎপাদনে ভারতের দক্ষতা বেশী। তাই ভারত যদি শুধু পাট এবং অস্ট্রেলিয়া যদি শুধু উল উৎপন্ন করে তবে নিম্নরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে :

(২)	পাট	উল
ভারত	৪০০ মণ	X
অস্ট্রেলিয়া	X	৪০০ মণ

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মোট = ৪০০ মণ ৪০০ মণ

সুতরাং প্রথম অবস্থায় উভয়দেশ মোট ৩০০ মণ পাট এবং ৪০০ মণ উল উৎপন্ন করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তাহারা মোট ৪০০ মণ পাট এবং ৪০০ মণ উল উৎপন্ন করে। অতএব দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উভয় দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বেশী হয়। ইহাতে সামগ্রিক ভাবে উভয় দেশই যেমন লাভ, পৃথক ভাবে ও উহারা লাভবান হয়। ইহা বুঝিতে পারি এই ভাবে যে,

ভারত যদি পাট এবং উল দুইই উৎপাদন করে তবে ১ মণ পাটের বিনিময়ে ১ মণ উল পাওয়া যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে। আবার, অস্ট্রেলিয়াও যদি পাট ও উল দুইই উৎপন্ন করে তবে উহার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ১ মণ পাটের পরিবর্তে ২ মণ উল পাওয়া যাইবে। এখন, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যদি পাট এবং উলের বিনিময় হয় তবে, ভারত ১ মণ পাট দিয়া ১ মণের অধিক উল চাহিবে ( কারণ নিজ দেশে সে ১ মণ পাটের পরিবর্তে ১ মণ উল পায় ) এবং অস্ট্রেলিয়া ১ মণ পাট দিয়া ২ মণ পর্যন্ত উল দিতে পারে ( কারণ, তাহার দেশে ১ মণ পাটের বিনিময়ে ২ মণ উল পাওয়া যায় ) সুতরাং ১ মণ পাটের বিনিময়ে ১ মণ হইতে ২ মণ পর্যন্ত উল পাওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক এই বিনিময় হার কত হইবে তাহা নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে উভয় শ্রবোয় চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। মনে করা যাউক যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বিনিময় হার দাড়াইল ১ মণ পাট = ১½ মণ উল। এখন যদি ভারত ৩০০ মণ উল অস্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করে এবং ২০০ মণ পাট অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী করে তবে নিম্নরূপ অবস্থা দাড়াইবে :

(৩)	পাট	উল
ভারত	মণ ২০০ (৪০০ - ২০০)	মণ ৩০০ (০ + ৩০০)
অস্ট্রেলিয়া	মণ ২০০ (০ + ২০০)	মণ ১০০ (৪০০ - ৩০০)
মোট	৪০০ মণ	৪০০ মণ।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারত যদি পাট এবং উল দুইই উৎপাদন করিত তবে সে ২০০ মণ পাট এবং ২০০ মণ উল ভোগ করিত (১নং টেবিল)। কিন্তু সে খালি পাট উৎপাদন করিলে ৪০০ মণ পাট উৎপাদন করে (২নং টেবিল) এবং পাটের সহিত উলের বিনিময় করিলে (৩নং টেবিল) সে ২০০ মণ পাট এবং ৩০০ মণ উল ভোগ করিতে পারে।

অস্ট্রেলিয়াও অল্পরূপ ভাবে দুই শ্রবাই প্রস্তুত করিলে ১০০ মণ পাট এবং ২০০ মণ উল (১নং টেবিল) ভোগ করে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন ২০০ মণ পাটের (নতুবা সে উহা ২০০ মণ কিনিবে কেন?) এই ২০০ মণ পাট দেশে উৎপাদন করিতে হইলে তাহার সমস্ত উৎপাদন-উপাদান-ই ব্যবহৃত হইয়া যাইত। উল উৎপাদনের জন্ত কিছুই থাকিত না; কারণ, তাহার দুই একক উৎপাদন-উপাদান আছে এবং প্রতি এককে মাত্র ১০০ মণ পাট উৎপাদন হয়।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

কিন্তু সে শুধু উল উৎপাদন করিলে ৪০০ মণ উল হয় মোট উৎপাদন-উপাদানে (২নং টেবিল) এবং উহা হইতে ৩০০ মণ উল দিয়া ২০০ মণ পাট লইলে (৩নং টেবিল) সে ভোগ করিতে পারে ২০০ মণ পাট এবং ১০০ মণ উল। সুতরাং ইহাতে তাহারও লাভ।

অতএব, বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণ—প্রথমত, ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ (Territorial division of Labour) এবং দ্বিতীয়ত, আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়-নীতি (Principle of comparative advantage or cost) অল্পসারে বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত বিভিন্ন বাষ্ট্রের-পারস্পরিক লাভ। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক নির্ভরতার (Economic Dependence) জন্ত অনেক ক্ষেত্রে পণ্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, কিন্তু তাহাকে বিনিময় না বলিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International co-operation) বলিলেই বোধহয় স্পষ্ট হয়।

### উপরোক্ত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

- ১। দুই দেশের মধ্যে দ্রব্য অথবা সেবামূলক কার্যের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।
- ২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি অনেকাংশে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতির অনুরূপ। এক্ষেত্রে শুধু বিনিময়কারী দেশগুলি বিভিন্ন শাসনভুক্ত।
- ৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি—  
(ক) শ্রমিক ও মূলধনের গতি (খ) দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও খনিজ ইত্যাদির গতিহীনতা (গ) সরকারের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন ও (ঘ) মুদ্রাবিনিময়ের সমস্যা..... প্রভৃতি কতগুলি বিষয়ে বৈষম্যমূলক।
- ৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ—(ক) ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ (ইহার কারণ, শ্রমিক ও মূলধনের গতির হ্রাসতা এবং বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও খনিজ বিষয়ে আত্মবিশিষ্ট্য) ও (খ) আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়নীতি (Principle of comparative advantage or cost.)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of International Trade.): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করিলে আমরা নিম্ন লিখিত বিষয় বস্তু অবগত হইতে পারি :—

### আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

#### সুবিধা

১। কোন দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে না পারিলেও উহা আমদানী করিয়া ভোগ করিতে পারে।

২। (পূর্বের আলোচনার ২ নং টেবিলে দেখিয়াছি যে) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সকল দেশেই উৎপাদন বেশী হয়।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলেই সম্ভব। এবং এই ব্যবহার অধিকতম সং ব্যবহার; কারণ, যে রাজ্য যে দ্রব্য সর্বনিম্ন মূল্যে উৎপাদন করিবে সেই রাষ্ট্র শুধু সেই দ্রব্যই সকল রাষ্ট্রের জন্য উৎপাদন করিবে— ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল সূত্র।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক দ্রব্য (সে নিজে উৎপাদন না করিলেও) সর্বনিম্ন মূল্যে ভোগ করিতে পারে।

#### অসুবিধা

১। বৈদেশিক বাণিজ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা থাকায় ভবিষ্যত স্বার্থের হানি সম্ভব। যুদ্ধের সময় আমদানী বন্ধ হইলে অসুবিধায় পড়িতে হয়।

২। প্রকৃত উৎপাদন মূল্য হইতে কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া (dumping) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এক দেশ অপর দেশের শিল্পে তালা লাগাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে পারে। অবাধ বাণিজ্যে এই ভয় রহিয়াছে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পর-নির্ভরতা রহিয়াছে এবং তাই নির্ভরতার গুরুত্ব বুঝিয়া নির্ভরশীল রাষ্ট্রের উপর সুবিধা গ্রহণ করিয়া বিনিময় হার বাড়াইয়া দেওয়া খুবই সম্ভব।

৪। বিদেশে রপ্তানী করিয়া অধিক মূল্য লাভ করা এবং উহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য আমদানী করার ফলে দেশের অধিকাংশ উৎপাদন-ই রপ্তানীতে ব্যয় হইয়া যায়। দেশের লোক কম দ্রব্য অধিকমূল্যে ভোগ করে।



## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

### সুবিধা

৫। যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন দেশের উৎপাদন-ক্ষম হইলে অপর দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সকল আমদানী করিয়া অভাব মিটান সম্ভব।

৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় এবং নৈতিক প্রসার লাভ করে।

### অসুবিধা

৫। মাদক দ্রব্য ইত্যাদি অবাধে আমদানী হইলে দেশের লোকের নৈতিক অবনতি হওয়া স্বাভাবিক।

৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরস্পরের মধ্যে রেবারেষি দেখা দেয় এবং ফলে ঐ দেশগুলির মধ্যে অর্থ-নৈতিক যুদ্ধ (Economic war) বা প্রকৃত যুদ্ধ দেখা দেয়। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে বাণিজ্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি দেশ পরাধীন হয়। আমাদের ভারত-বর্ষ তাহাদের অন্ততম।

## ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

০ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই প্রাচীন। খৃষ্ট পূর্ব ৩০০০-বৎসর পূর্বেও মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের নজির পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের স্তম্ভ বস্ত্র, মসলা, গজদন্ত, স্বর্ণাদি দ্রব্য এবং রং-এর পরিবর্তে তখনকার যুগে ভারত আমদানী করিত আরবী ঘোড়া, স্ত্রীপেয় মদ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অগ্ন্যস্ত্র খনিজ সম্পদ।

ভাস্কোডাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ পথ আবিষ্কার করিলে ইউরোপীয় ... নিকগণ ভারতের সহিত বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ভারতের স্তম্ভ-বস্ত্র ইউরোপের বাজার গ্রাস করে এবং ফলে ভারতের বস্ত্রের উপর শুষ্ক বসাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য হ্রাস করে। ইন্টাইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসন ক্ষমতা পাইবার পর, ভারতীয় তাঁতীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া তাহাদের স্তম্ভ বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা খর্ব করার ইতিহাস বিশ্বের কে না অবগত আছে! ক্ষমতা প্রাপ্ত ইংরেজ তখন ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া পরিবর্তে শিল্পদ্রব্য দিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল এবং শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা হ্রাস পাইতে লাগিল। ইংলও তখন শিল্প-

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

বিপ্লবোত্তর ঐশ্বৰ্যে মত্ত। এই সময়ের বাণিজ্যকে আমরা বৈদেশিক লুণ্ঠন আখ্যা দিতে পারি।

১৯১৪—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ প্রথম মহাযুদ্ধ ইংরেজকে এই শিক্ষা দিল যে, ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে কিছু কিছু শিল্প ভারতবর্ষে স্থাপন করা কর্তব্য। প্রথম যুদ্ধের পরেই ( ১৯২০-২২ ) জাপানের তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে ভারত প্রথম বাণিজ্যিক ঘাটতির সম্মুখীন হয়। অবশ্য ইহা ১৯২৮-২৯ এর মধ্যেই পুনরায় দূরীভূত হয়।

১৯২৯ সালে সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Depression) দেখা দিতে আরম্ভ করে। সমস্ত দ্রব্যের মূল্য তখন কমিতে থাকে। কিন্তু শিল্পদ্রব্যের তুলনায় কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য অধিক কমিয়া যায়। ফলে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হয়, এই ঘাটতি মিটাইতে এবং ব্রিটন সরকারের নানারূপ দাবী মিটাইতে ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইতে লাগিল। কিন্তু চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আবার বাণিজ্যের উন্নতি দেখা দেয়। এই সময়েও বিশ্বব্যাপী মন্দার জের ছিল তবু ভারতের রপ্তানী সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালের পূর্বের ইতিহাস আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করিমাছি। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনাকাল হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ( বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন, দিক, মূল্য ও প্রকৃতি ) পরিবর্তিত হইতে থাকে।

আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যকে চারিটি স্তরে আলোচনা করিব :—

(১) দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে (২) দ্বিতীয়যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তরকালে (৩) ভারত বিভক্ত হইবার পরে (৪) ভারতের পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাকালীন।

(১) দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বের বৈশিষ্ট্য : (ক) কাঁচামাল ও কৃষিদ্রব্য রপ্তানীর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ দখল করিত, শিল্পদ্রব্য ছিল মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ।

(খ) আমদানীর প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ ছিল শিল্পদ্রব্য। মোটর গাড়ী, বস্ত্র, সাইকেল, সেলাই কল ইত্যাদি ছিল আমদানীর অগ্রতম।

(গ) বাণিজ্যের উন্নতি ( favourable balance of trade ) ছিল ভারতের এই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) বাণিজ্যের দিক অর্থাৎ রপ্তানী ও আমদানীর গতি ছিল শাসক রাষ্ট্রের দিকে। এই সময়ে ভারতের আমদানীর প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ ইংলণ্ড হইতে আসিত এবং রপ্তানীর শতকরা ৪৪ ভাগ ইংলণ্ডেই যাইত।

## (২) দ্বিতীয় যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বৈশিষ্ট্য :

(ক) এই সময়ে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ইহার প্রথম কারণ শিল্প-প্রসার যাহা প্রথম যুদ্ধের পরে শুরু হয়; এবং দ্বিতীয় কারণ, যুদ্ধে নিযুক্ত রাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস।

(খ) রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কাঁচামালের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ, দেশের শিল্পে ঐ কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে।

(গ) ভারতের বাণিজ্য এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.), মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও বিভিন্ন বান্ধব-রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

(ঘ) এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বাড়িতে থাকে। এবং “ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড” ভারতের ষ্টার্লিং জমার পরিমাণ ক্রমে বাড়িতে থাকে।

এই সময়ের বাণিজ্যের প্রসার কিন্তু স্থায়ী হইবার নহে। কারণ, যখন অগ্র দেশগুলি যুদ্ধে লিপ্ত বলিয়া বাণিজ্যে অধিক নিযুক্ত নহে এবং উপরন্তু, যখন যুদ্ধে নিযুক্ত দেশগুলির চাহিদা বাড়িয়া যায়, তখন ভারত স্বযোগ গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়, এই প্রসারতা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই, তাই, সঙ্কুচিত হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় লোকের নিকট প্রচুর অর্থ আসায় যুদ্ধোত্তর কালে তাহা ভোগ করিতে লাগিল। তাই দ্রব্য-চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং আমদানিও প্রসার লাভ করে। ফলে পরবর্তী কালে আমদানি রপ্তানীকে ছাড়াইয়া গেল।

## ১। ভারত বিস্তৃত হইবার পরের বৈশিষ্ট্য :

(ক) স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ সহজাত। তাই পাকিস্তান পররাষ্ট্র হইয়া গেল। পাকিস্তান অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য এখন বৈদেশিক-বাণিজ্য হইল।

দেশ বিভাগের ফলে খাতের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় খাদ্য আমদানী হইতে লাগিল।

আমদানি-ও রপ্তানীর মূল্য প্রচুর বাড়িতে লাগিল।

(খ) খাদ্য, পাট ও তুলা যাহা আমরা পূর্বে রপ্তানী করিতাম এখন তাহাই আমাদের পাকিস্তান ও অগ্রাগ্র দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

(গ) এই সময়ে আমাদের রপ্তানীতে কাঁচামালের শতকরা পরিমাণ কমিয়া শিল্প দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িল এবং আমদানিতে শিল্পদ্রব্যের শতকরা পরিমাণ কমিয়া কাঁচামালের পরিমাণ বাড়িয়া গেল।

(ঘ) পাটজাত দ্রব্য, চা ও বস্ত্র এই তিনটি দ্রব্যের রপ্তানীর উপর আমাদের বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব অধিকতর ভাবে নির্ভর করিতে লাগিল। ইহাৱাই রপ্তানীর শতকরা ৬০ ভাগ দখল করে।

(ঙ) দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল উদ্ভূত (Negative balance of Trade) দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের (devaluation) সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল উদ্ভূতের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

(চ) ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, চীন, সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিও কানাডা প্রভৃতির সহিত ভারতের বাণিজ্য বাড়িতে থাকে।

### ৪। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালীন বৈশিষ্ট্য :

(ক) ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনা বর্তমানে চলিতেছে। প্রথম পরিকল্পনা-কাল হইতেই ভারতের আমদানি অধিক পরিমাণে বাড়িতেছে। শিল্পপ্রসারের জন্য মূলধনীদ্রব্য, কাঁচামাল, ও আবহুযুক্তিক দ্রব্যাদির আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনাকালীন খাণ্ডের ঘাটতি ও আমদানি-দ্বারা মিটাইতে হইয়াছে।

(খ) আমদানি নিয়ন্ত্রণের অধিকতর কার্যকারিতা এই সময়ের বৈদেশিক-বাণিজ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(গ) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে রপ্তানীর পরিমাণ বা মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই।

(ঘ) চা, তুলা, বস্ত্র, চামড়া, পাটজাত দ্রব্যাদি, মশলা, তামাক ইত্যাদির রপ্তানী কিছু কমিয়া, সাইকেল, সেলাইকল, আকরিক লৌহ ইত্যাদির রপ্তানী বাড়িয়াছে।

(ঙ) রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল (Export promotion Council) গঠন এবং রপ্তানী ঝুঁকিবীমা (Export credit insurance) চালুকরা এই সময়ের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

(চ) বহির্বাণিজ্যের অধিকতর ঘাটতি এই সময়ের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়।

(ছ) পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, সুদূর ও মধ্যপ্রাচ্য,

অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য অধিকতর ছড়াইয়া পড়ে।

### আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যের পদ্ধতি :

#### আমদানি বাণিজ্য

বর্তমানযুগে আমদানি বা রপ্তানী বাণিজ্য করিতে হইলে কতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। এই পদ্ধতিগুলি কিছু আইনগত এবং কিছু সাধারণ নিয়মগত। সুতরাং আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষীকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দেশেই আমদানি ও রপ্তানীর বিশেষ সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের মাধ্যমে ব্যবসা চলিয়া থাকে। তবে সরাসরি ব্যবসাও যে নাই তাহা বলা চলে না। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে সে দ্রব্য ও, জি, এল (open general licence, অর্থাৎ যে দ্রব্য লাইসেন্স ছাড়া আমদানি করা চলে) তালিকাভুক্ত কিনা। যদি উহা ও, জি, এল, তালিকার বহির্ভূত হয় তবে উহার জন্ত আমদানি কমিশনারের নিকট হইতে প্রথমে লাইসেন্স লইতে হইবে। রিজার্ভব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং পরে ঠিক করিতে হইবে কাহার নিকট হইতে মাল আমদানি করা হইবে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত যে কোন একটি পস্থা অবলম্বন করা যায়—

১। ঐ দ্রব্যের উৎপাদকের নিকট সরাসরি অর্ডার দিয়া আমদানির ব্যবস্থা কথা যায়।

২। ঐ দেশের কোন রপ্তানী-বণিক অথবা সংস্থার নিকট অর্ডার দিয়া মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। রপ্তানী-বণিক নিজ নামে মালের সরবরাহ করিয়া থাকে। নিজের দ্রব্য না থাকিলে অপরের নিকট হইতে কিনিয়া উহা সরবরাহ করে।

৩। ঐ দেশের কোন দালালের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের তালিকা দিয়া ক্রয়ের আদেশ (Indent) দিলে সে এমন ব্যবস্থা করিবে যে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদক অথবা রপ্তানী-এজেন্ট মাল সরাসরি পাঠাইয়া দিবে। এই দালালকে কমিশন দেওয়ায় বাহা ব্যয় হইবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের কার্যাবলী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান।

উপরের যে কোন একটি উপায়ে আমদানির ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্য প্রেরক মূল্য বাবদ কিছু অগ্রিম চাহিয়া বসে। পুরাতন

সম্পর্ক থাকিলে এই রূপ অগ্রিমের প্রয়োজন হয় না। মালের অর্ডার দেওয়ার সময়, মালের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য পাঠাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার লেখা থাকা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে আমদানির দ্রব্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সাংকোতক ভাষায় (code) নির্দেশ দেওয়া হয়।

অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমদানিকারক রপ্তানিকারককে দ্রব্যের মূল্য-প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত করিবার জন্ত ঋণের নিদর্শন পত্রের (letter of Credit) ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই নিদর্শন পত্রের জন্তই রপ্তানীকারক এই বিশ্বাস অর্জন করে যে আমদানিকারক রপ্তানী দ্রব্যের জন্ত প্রেরিত হাণ্ডে স্বীকৃতি দিয়া চালান ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ করিবে এবং এই নিদর্শন পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই রপ্তানিকারক ছাড়ি ভান্ডাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। ঋণের নিদর্শনপত্র সাধারণত ব্যাংক মারফত রপ্তানিকারকের নামে পাঠান হইয়া থাকে।

আমদানির অর্ডার দেওয়ার সময়ে সাধারণতঃ উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময় হার সম্পর্কেও একটি চুক্তি হইয়া থাকে। ইহার প্রয়োজনীয়তা এই যে, উভয়দেশের মধ্যে প্রচলিত বিনিময়-হার যদি মূল্য প্রদান কালে কোন কারণে পরিবর্তিত হয় তাহাতে যেন কোন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় (অর্থাৎ তাহা হইলেও যেন চুক্তি সম্পাদন কালের হার ঐ সময়েও উভয় পক্ষের মধ্যে বলবত রাখা হয়)।

মাল পৌছাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমদানিকারক রপ্তানিকারকের এদেশীয় এজেন্ট-ব্যাংকের নিকট হইতে তাহার প্রেরিত কতগুলি অত্যাৱশ্যক দলিলপত্র পাইয়া থাকে। এই দলিলগুলির মধ্যে চালানী রসিদ (Bill of Lading), বাণিজ্য ছাড়ি (Bill of exchange); জায় (Invoice) এবং বীমাপত্র (Insurance Policy) প্রধান (এইগুলি পরে আলোচিত হইবে)। সাধারণত, আমদানিকারক কর্তৃক বাণিজ্য ছাড়িতে স্বীকৃতি দেওয়া না হইলে অথবা বাণিজ্য-ছাড়ি মিটান না হইলে এজেন্ট-ব্যাংক দলিলগুলি আমদানিকারককে দিবে না। এবং ঐ দলিল গুলি না পাইলেও আমদানিকারক মাল খালাস করিয়া আনিতে পারে না। যদি কোন কারণে বিল অর্থ প্রদানে অস্বীকার হয় (যখন বিল দিবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ প্রদানের চুক্তি থাকে) তবে আমদানিকারক ঐ এজেন্ট ব্যাংকের নামে একটি বন্ধকীপত্র (Letter of Hypothecation) দিয়া ব্যাংকের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র গ্রহণ

করিয়া মাল খালাস করিতে পারে। পরে অর্থ প্রদান করিয়া বন্ধকীপত্র ফেরত লইতে পারে।

উপরিউক্ত দলিল পাইবার পর আমদানিকারক মাল খালাস করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রত্যেক আমদানীকৃত মালই শুদ্ধবিভাগ তদন্ত করিয়া থাকে। এই তদন্ত হইবার পরে যদি ঐ আমদানীকৃত মালের উপর শুদ্ধার্থ না থাকে, তবে চালানী রসিদ ( Bill of Lading ) দেখাইয়াই মাল খালাস করিতে পারে। কিন্তু ঐ মালের উপর শুদ্ধার্থ হইলে ঐ শুদ্ধার্থ প্রথমে শুদ্ধ বিভাগে জমা দিয়া পরে চালানী রসিদ দেখাইয়া মাল খালাস করিতে হইবে। শুদ্ধের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে শুদ্ধবিভাগের গুদামে অথবা বন্ধকী গুদামে ( Bonded Warehouse ) কিছুদিনের জন্ত মাল রাখা হয়। পরে কোন ব্যাকের-মাধ্যমে বন্ধকীপত্র দাখিল করিয়া ঐ মাল খালাস করা হইতে পারে।

মাল খালাস করার পরে ঐ মাল নির্দেশ মত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। যদি মালের গুণ, ওজন বা পরিমাণ, সংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয় নির্দেশ মত হইয়া থাকে তবে এখানেই লেন-দেন শেষ হয় এবং বিল মিটাইয়া দেওয়া হয় (যদি বিলের অর্থ পূর্বেই প্রদান না হইয়া থাকে)। কিন্তু কোন বিষয়ে মাল নির্দেশ অসুযায়ী না হইলে এবিষয়ে আবার উভয় পক্ষের মধ্যে যতদিন না এবিষয়ে নিষ্পত্তি হয় ততদিন চিঠি-পত্র বা তার বিনিময় হইতে থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমদানি এবং রপ্তানী বাণিজ্যে কতগুলি জটিল নিয়ম আছে। তাই, অনেক ক্ষেত্রে কতগুলি সংগঠন এই বিষয়ে বিশেষীকরণ করে। ছোট ছোট কারবারের প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্য কোন এক আমদানি কারবারীর মাধ্যমে আমদানি করা হয়। এই আমদানি কারবারিকে বলা হয় Indent business। কারবারী কতগুলি ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্য তালিকা অনুযায়ী আমদানি করিয়া দেয়। আমদানিকারক নির্দিষ্ট করমে দ্রব্যের বিবরণ, পরিমাণ বা পরিমাপ, মূল্য, আমদানির আনুমানিক সময় এবং বিভিন্ন সর্ত লিখিয়া সহি করে এবং উহা আমদানি কারবারীর নিকট দেয়। আমদানি কারবারী অল্পকাল আরও কয়েকটি অর্ডার সংগ্রহ করিয়া বিদেশ হইতে মাল আমদানি করেন। ইংরেজ আমদানি কারবারীর দায়িত্ব খুবই কম, কারণ সে আমদানিকারক ও রপ্তানী-কারকের মধ্যে শুধু যোগসূত্র স্থাপন করে এবং পরিবর্তে কিছু দালালি পায়। রপ্তানীকারকের সহিত গোপন ব্যবসায় কিছু মুনাফাও অনেক ক্ষেত্রে

আমদানি কারবারী লাভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও আমদানি কারবারীর কাঁধ বিশেষ প্রয়োজন। ছোট ছোট কারবারীরা যখন বিভিন্ন দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করে তখন তাহাদের আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার জ্ঞাত অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। আমদানি-কারবারীরা ইহাদের এই অসুবিধা হইতে মুক্তি দেয়। ভারতবর্ষে আমদানি কারবার বিশেষ ভাবে প্রচলিত। ইহাৰ সুবিধা এই যে, বিনা অসুবিধায় মাল আমদানি হয়; অনেকের মাল একসঙ্গে আসে বলিয়া আমদানি খরচা গড়ে কম পড়ে এবং আমদানি কারবারীর আমদানি ব্যবসায়ে দক্ষতার জ্ঞাত মাল খুব তাড়াতাড়ি আসিয়া পৌছায়।

### রপ্তানি বাণিজ্য

পূর্বেই বলিয়াছি যে বর্তমান যুগে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কতগুলি জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। তাই রপ্তানি বাণিজ্যে ও আমদানি বাণিজ্যে কতগুলি সংস্থা বিশেষিকরণে রত হয়। ভারতবর্ষেও এইরূপ আমদানি ও রপ্তানি সংস্থার সংখ্যা প্রচুর।

কোন দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে ঐ দ্রব্য বিদেশের বিভিন্ন সম্ভোগকারীর নিকট পরিচিত হইতে হইবে। এইজন্ত দ্রব্য-উৎপাদক নিজে অথবা দেশীয় ও বিদেশীয় দালালের মাধ্যমে পরিচয় পত্র বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া দেয়। প্রায় প্রত্যেক দেশের সরকারই বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনাগার খুলিয়া নিজ দেশীয় বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শন করে। আবার আন্তর্জাতিক মেলা (fair) মাধ্যমেও বিদেশের লোক বিভিন্ন দ্রব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়।

দ্রব্যের পরিচয় পাইলে রপ্তানীকারকের নিকট আমদানীকারক নিজ প্রয়োজন মত অর্ডার পেশ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমদানীকারকের সহিত যোগাযোগ করিয়া অর্ডার গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রথমত, আমদানীকারক দ্রব্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য এবং প্রেরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়া মাল পাঠাইবার জন্ত আমদানী-কারকের নিকট নির্দেশপত্র পাঠাইয়া দেয়। রপ্তানীকারক ঐ সর্তে রাজী হইলে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং সর্ত অনুযায়ী মাল প্রেরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সর্তে রাজী না হইলে রপ্তানীকারক ঐ নির্দেশ ফেরৎ দেয় নতুবা আমদানি কারকের সহিত চিঠি বা তারের মাধ্যমে আলোচনা চালাইয়া সর্তের পরিবর্তন করিয়া অর্ডার গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই রপ্তানী কারক আমদানি কারকের নিকট হইতে মোট মূল্যের কিছু শতাংশ অগ্রিম



চাহে, কারণ অর্ডার সম্পাদনের খুঁকির কিছু অংশ ইহাতে উন্মুক্ত হয়। মাল পাঠাইবার পরে আমদানি কারক যদি ঐ মাল গ্রহণ না করে তবে উহা রপ্তানী কারকের নিকট ফেরৎ আসে। তাহাতে রপ্তানীকারকের কিছু ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পূরণের জন্তই আমদানি কারকের (বিশেষ করিয়া নূতন আমদানি কারকের) নিকট হইতে এই অগ্রিম লইবার ব্যবস্থা।

রপ্তানীকারক আমদানিকারকের সহিত রপ্তানি চুক্তি সম্পাদন কালে মুদ্রাবিনিময় হার সম্পর্কে সর্ত করিয়া লয়। এই সর্তের বিষয়-বস্তু এই যে, পরবর্তীকালে যখন রপ্তানীমূল্য পরিশোধ হইবে তখন যদি কোন কারণে চুক্তি সম্পাদন কালের বিনিময় হার পরিবর্তিত হয় তাহা হইলেও উভয়পক্ষ, ঐ সময়েও, চুক্তি সম্পাদনকালের বিনিময় হার মানিয়া লইবে।

রপ্তানীকারক রপ্তানি মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত আমদানিকারকের “অণের নিদর্শন পত্র” পাঠাইতে অস্বরোধ করে। এই নিদর্শন পত্রের ভিত্তিতেই রপ্তানীকারক বাণিজ্য হণ্ডি (Bill of Exchange) ভাঙ্গাইতে পারে।

রপ্তানীকারক ইহার পর একাদিকে দ্রব্যের যোগানের চেষ্টা করে এবং অপর দিকে দ্রব্য পাঠাইবার জন্ত জাহাজ বা রেল কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করে। রপ্তানীকারক যদি রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদক বা বণ্টক (distributor) না হয় তবে তাহাকে বাজার হইতে ঐ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। উৎপাদন বা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আমদানিকারকের নির্দেশ অস্বাভাবিক দ্রব্য হয়। বাটানগরে বাটা কোম্পানীতে গেলে দেখিতে পাইবে যে, উৎপাদনের কোন কোন সেক্সনে “For Export, work with care” (অর্থাৎ, রপ্তানীর মাল, সাবধানে কাজ কর) — এইরূপ সতর্কবাণী লাগান আছে। ইহার কারণ এই যে আমদানিকারকের নির্দেশমত দ্রব্য উৎপাদন না হইলে রপ্তানীকারকের নানারূপ ক্ষতির সম্মুখে পড়িতে হয়। আবার মাল প্রেরণের সময় যাহাতে উহা নির্দিষ্ট সময়ে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব হইতেই জাহাজ বা রেল কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়, যাহাতে জাহাজে বা রেলে পূর্ব হইতেই জায়গার বন্দোবস্ত থাকে।

সমস্ত রপ্তানীকারকই তাহার মাল যাহাতে নির্বিঘ্নে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার নিমিত্ত মাল প্রেরণের সময় ঐ মালের বীমা করিয়া লয়। জাহাজে মাল পাঠাইলে নৌ-বীমা কোম্পানীর

নিকট বীমা করিতে হয়। বীমার জন্ত রপ্তানীকারককে মালের প্রকৃতি, মূল্য-ইত্যাদি, অমুখ্যায়ী প্রিমিয়াম দিতে হয়। কিন্তু এই প্রিমিয়াম অধিক নহে বলিয়া এবং এই প্রিমিয়ামের বদলে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বীমা কোম্পানী দেয় বলিয়া বীমা গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্রব্য জাহাজ, গ্লেন বা রেলের উঠাইবার আগে পোর্টে দ্রব্যের তালিকা তৈয়ারী হয়। যে দ্রব্য পাঠান হইল তাহার উপর যদি শুদ্ধ ধার্য থাকে তবে ঐ তালিকা অমুসারে শুদ্ধ দিয়া এবং জেটি ইত্যাদির ভাড়া দিয়া মাল জাহাজ, রেল ইত্যাদির ভিতরে তোলা হয়। কলিকাতা পোর্টে গেলে দেখিতে পাইবে যে জেটি সরকার মালের তালিকা মিলাইয়া বইতে লেখেন এবং ইহার ভিত্তিতে শুদ্ধীয় দ্রব্যের শুদ্ধ আদায় হয়। শুদ্ধ এবং জাহাজ জেটির ভাড়া মিটাইবার পরই মাল জাহাজে তুলিবার অমুমতি দেওয়া হয়।

মাল জাহাজে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে (অথবা জেটিতে বসিয়া) জাহাজ-কোম্পানী মালের ওজন, পরিমাপ ইত্যাদি রপ্তানী-চালানের সহিত মিলাইয়া লয় এবং উহার পরে একটি রসিদ দেয়। এই রসিদকে Mates Receipt বা জাহাজের মালিকের রসিদ বলা হয়। এই রসিদ জাহাজ কোম্পানীর অফিসে দিলে সেখান হইতে চালানী রসিদ দেওয়া হয়। এই চালানী রসিদ বা Bill of Lading এর তিনটি কপি দেওয়া হয়।

মাল জাহাজে তুলিয়াই রপ্তানীকারক রপ্তানি সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈয়ারী করে। প্রথমত, মালের বিবরণ ইত্যাদি দিয়া রপ্তানী-চালান (Invoice) তৈয়ারী করা হয়। দ্বিতীয়ত, মালের প্রভব-লেখ বা Certificate of Origin তৈয়ার করা হয়। ইহার প্রয়োজন শুধু আমদানীকারককে মালের উৎপাদন স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করা। যেমন, ইংলণ্ডের K. Rainey যদি কলিকাতার B. K. Saha-র নিকট ভারতীয় চায়ের অর্ডার দেন তবে B. K. Saha তাহার প্রেরিত চা যে ভারতে উৎপাদিত সে সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট পেশ করিবেন। প্রভব-লেখের আর একটি উদ্দেশ্য শুদ্ধের তার-তম্যের সুবিধা লাভ করা। তৃতীয়ত, বাণিজ্যছত্তি প্রস্তুত করা হয়। এই বাণিজ্যছত্তি রপ্তানীকারকের দেশের মূদ্রায় তৈয়ারী করা হয় এবং ইহার তিনটি কপি করা হয়। অনেক সময় রপ্তানীকারকের দেশে কার্যে রত আমদানীকারকের দেশের বাণিজ্যদূতের (যেমন ভারতে আমেরিকার বাণিজ্যদূত) নিকট হইতে একটি চালান লওয়া প্রয়োজন। ইহাকে বলে

Consular Invoice। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে :এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানি করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন হয়। রপ্তানিকারক বাণিজ্য-দূতের অফিসে গিয়া দ্রব্যের তালিকা এবং দ্রব্যের মধ্যে যথার্থ মিল আছে এই অঙ্গীকার করিয়া বাণিজ্যদূতের সামনে একটি ফরমে সহি করে। বাণিজ্যদূতও ইহাতে সহি করেন এবং ইহার তিনটি করিয়া কপি করা হয়। ইহাকেই বাণিজ্যদূতের চালান বা Consular invoice বলা হয়।

এই পর্ষায়ের পরে রপ্তানিকারক রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করে। রপ্তানিকারক আমদানিকারককে চালানী রসিদ ও প্রয়োজনবোধে বাণিজ্য দূতের চালান সরাসরি পাঠাইয়া দিলে উহার ভিত্তিতে আমদানিকারক মাল ছাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু রপ্তানিকারক ইহাতে মূল্য আদায়ের ব্যাপারে সমস্তার নশ্বুখীন হইতে পারে। এই জন্ত রপ্তানিকারক প্রথমেই ঐ দলিলগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আগে বাণিজ্যছত্তি ভান্সাইয়া লয়। ব্যাঙ্ক আমদানিকারকের ঋণের নিদর্শন পত্র ( Letter of Credit ) এবং বন্ধকীপত্রের ( Letter of Hypothecation ) ভিত্তিতেই বিল ভান্সায়। ব্যাঙ্ক ইহার পরে দলিল পত্রাদি আমদানিকারকের দেশে তাহার প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করে এবং তাহাতে নির্দেশ দেওয়া থাকে যে ছত্তির টাকা পরিশোধ না করিলে যেন আমদানিকারককে চালানী রসিদ দেওয়া না হয়। আমদানি কারক চালানী রসিদ না পাইলে মাল ছাড়াইতে পারিবে না তাই বিলের টাকা মিটাইয়া চালানী রসিদ সংগ্রহ করিবে। রপ্তানিকারকের এ বিষয়ে আর কিছু করিবার নাই।

**বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজপত্র এবং সঙ্গ-প্রকরণ ( Documents and terms used in Foreign Trade ) :**

১। **রপ্তানি চালান ( Invoice ) :**—রপ্তানিকারক দ্রব্য জাহাজে চাপাইবার বন্দোবস্ত করিয়াই রপ্তানি চালান বা Invoice তৈয়ারী করেন। এই চালানে মালের বিবরণ, ওজন, পরিমাপ, ইত্যাদি, দর, মোটমূল্য, ভাড়া, প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ লিখিয়া মোট দেয় মূল্য দেখান হয়। রপ্তানিকারক কোন জাহাজে মাল প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া ইহাতে সহি করেন।

ইহার সহিত একটি চিঠিও দেওয়া হয়। এই চিঠিতে আমদানি কারকের অর্ডারের উল্লেখ করিয়া তাহার নির্দেশ মত যে মাল প্রেরণ করা হইল তাহা লেখা হয়। এবং ইহাও লেখা হয় যে মোট দেয় মূল্যের জন্ত আমদানি

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

কারকের উপর দর্শনী হণ্ডি ( Bill at Sight ) লেখা হইয়াছে। ভবিষ্যতে অল্পরূপ অর্ডারের আশা প্রকাশ করিয়া সাধারণত এই চিঠি শেষ করা হয়।

২। **প্রভব-লেখ ( Certificate of Original )** :—রপ্তানীকারক তাহার সাধারণ চালানের পিছনে অথবা শুদ্ধ অফিসের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফরমে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন স্থান সম্পর্কে একটি নিদর্শন পত্র দেন। এই নিদর্শন পত্রের স্থবিধা প্রধানত দ্বিবিধ। প্রথমতঃ শুদ্ধের তারতম্যের স্থবিধা লাভ। যেমন, ভারতের চা ইংলণ্ডে গেলে শতকরা ১০ টাকা শুদ্ধ কিন্তু চীনের চা ইংলণ্ডে গেলে শতকরা ২৫ টাকা শুদ্ধ দিতে হয়—এই যদি ধরিয়া লই তবে রপ্তানির সময় রপ্তানীকৃত চা ভারতে তৈয়ারী কিম্বা চীনে তৈয়ারী তাহা বলা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন স্থান উল্লিখিত নিদর্শন পত্র মারফত আমদানীকারক দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে। দার্জিলিং চা এবং নীলগিরির চা তো এক হইতে পারে না। দার্জিলিং চা বলিলেই বুঝিতে হইবে, খুব ভাল চা।

## ৩। বাণিজ্য দূত প্রদত্ত চালান ( Consular Invoice ) :—

কোন কোন দেশ—যেমন, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকা রিপাবলিক তাহাদের দেশে কোন মাল আমদানিকালে এই চালান দাবী করে। এই চালানে রপ্তানি কারকের দেশে আমদানিকারকদের দেশের বাণিজ্য দূত সার্টিফিকেট দেন। ইংলণ্ড যদি আমেরিকায় মাল রপ্তানী করে তবে ইংলণ্ডে আমেরিকার বাণিজ্যদূত এই চালানে সার্টিফিকেট দেবেন। এই চালানে মালের বিবরণ, পরিমাপ এবং গুণাগুণ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ থাকে। এই চালান থাকিলে শুদ্ধ বিভাগকে শুদ্ধ সম্পর্কে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। বাণিজ্যদূত এই চালানে সার্টিফিকেট দিয়া উহার এক এক কপি জাহাজের কর্তৃপক্ষকেও আমদানিকারকের দেশের বন্দর শুদ্ধ অফিসে পাঠাইয়া দেন, এবং নিজের কাছে এক কপি রাখিয়া দেন। বাণিজ্যদূত সার্টিফিকেট দিবার সময় বিভিন্ন হারে চার্জ কাটিয়া রাখেন।

## ৪। চালানী রসিদ ( Bill of Lading ) :

এই রসিদ জাহাজ কোম্পানী প্রস্তুত করে এবং ইহাতে জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা তাহার এজেন্ট সহি করে। রপ্তানিকারক জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় যে চালান কোম্পানীকে প্রদান করে ঐ চালানে উল্লিখিত মালের বিবরণ, পরিমাণ, প্রাপকের নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে ( বিশেষ

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

করিয়া মালের বিবরণ ও ওজন সম্পর্কে) পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইবার পরে মাণ্ডল ধার্য্য করে। এই মাণ্ডল রপ্তানিকারক দিয়া দেয় এবং তাহার বদলে একটি চালানী রসিদ পাইয়া থাকে। চালানী রসিদ সাধারণত তিন (অথবা অবস্থা বিশেষে তিনের অধিক) কপি করিয়া লেখা হয়। চালানী রসিদে নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুগুলি থাকে—

(ক) যে ব্যক্তি বা কোম্পানী জাহাজে করিয়া মাল চালান দেয় তাহার নাম (খ) জাহাজের নাম (গ) যে বন্দর হইতে মাল বোঝাই হইল তাহার নাম (ঘ) যে বন্দরে মাল পৌঁছাইবে তাহার নাম (ঙ) মালের বিবরণ (চ) মাল পৌঁছাইয়া দিবার স্থান (ছ) যে ব্যক্তির নিকট মাল পৌঁছাইয়া দিতে হইবে তাহার নাম (জ) মালের ওজন (যাহার উপর মাণ্ডল ধার্য্য হইয়াছে) এবং (ঝ) তারিখ।

রপ্তানিকারক চালানী রসিদে প্রাপকের নাম উল্লেখ না করিতে চাহিলে এমনভাবে ঐ রসিদ তৈয়ারী করা হয় যাহাতে রপ্তানিকারকের আদিষ্ট যে কোন ব্যক্তিই ঐ মাল লইতে পারে ( “to order” )। এক্ষেত্রে মাল আমদানি বন্দরে পৌঁছবার আগেই রপ্তানিকারক কোন ব্যক্তিকে ঐ রসিদ স্বহস্তের ( indorse ) করে যাহাতে সেই ব্যক্তি মাল ছাড়াইয়া লইতে পারে।

চালানী রসিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রপ্তানিকারক আমদানি কারককে চালানী রসিদ না পাঠাইলে সে ঐ মাল জাহাজের নিকট হইতে নিতে পারিবে না। রপ্তানিকারক সাধারণত বাণিজ্যছত্তি এবং চালানী রসিদ আমদানি-কারকের দেশে তাহার (রপ্তানি কারকের) এজেন্ট ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দেয় এবং এই নির্দেশ দেয় যেন আমদানিকারক বিলের টাকা মিটাইবার পূর্বে চালানী রসিদ না পায়।

৫। জাহাজের মালিকের রসিদ ( জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ ) বা  
**Mates Receipt :—**

জাহাজ মাল পৌঁছাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা তাহার এজেন্ট মাল প্রাপ্তির একটি কাঁচা রসিদ দেয়। এই কাঁচা রাসদকে জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ বা Mates Receipt বলে। পরে চালানী রসিদ (পাকা রসিদ) পাইলে যদিও ইহার প্রয়োজন বিশেষ থাকে না তথাপি চালানী রসিদ পাইবার পূর্বে ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই কাঁচা রসিদে শুধু

জাহাজের নাম, এবং মালের পরিমাণ ও প্রাপ্তির তারিখ ছাড়া বিশেষ কিছুই থাকে না।

৬। **বাণিজ্য হুণ্ডি ( Bill of Exchange )** :—মাল পাঠাইয়া দিবার পরে রপ্তানিকারক আমদানি কারকের উপর একটি বিল তৈয়ারী করে। এই বিলে মালের নির্ধারিত মূল্য এবং খরচ ইত্যাদি মিলাইয়া যে অঙ্ক দাড়ায় তাহাই দিবার জন্ত আদেশ দেওয়া হয়। এই বিল সাধারণত দর্শনী বিল ( Bill at sight ) অর্থাৎ বিলের গ্রাহক ( Drawee ) বিল পাওয়া মাত্র মূল্য মিটাইতে বাধ্য থাকে। রপ্তানিক্ষেত্রে সাধারণত রপ্তানিকারক ( যে বিলপ্রেরক ) এই বিলের কয়েকটি কপি তৈয়ারী করে। এবং আমদানি-কারকের দেশে নিজ এজেন্টের নিকট বিভিন্ন উপায়ে এই বিলের কপি পাঠায়। এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় কারণ, যদি এক কপি হারাইয়া যায় তবে অত্র কপি নিশ্চয়ই পৌছাইবে। অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি কারক আমদানিকারক দত্ত ঋণের নিদর্শন পত্রের ভিত্তিতে এই বিল ডাঙ্কাইয়া ( discounting ) লয়।

বাণিজ্যহুণ্ডিতে হুণ্ডির প্রেরক ( drawer ) হুণ্ডি গ্রাহককে ( drawee ) লিখিতভাবে এবং সহি দিয়া কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, নিজেই অথবা আদিষ্ট অত্র কোন ব্যক্তিকে অথবা যে হুণ্ডি বহন করিয়া নিবে তাহাকে, তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ দিবসে, দিবার জন্ত সর্ব নিরপেক্ষভাবে আদেশ করিয়া থাকে।

৭। **ঋণের নিদর্শন পত্র ( Letter of Credit )** :—অনেকক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া নতুন বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের কালে আমদানীকারক রপ্তানি-কারককে মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত্ত করিবার জন্ত কোন ব্যাঙ্ক মারফত এই পত্র প্রেরণ করে। এই পত্রে দেয় অর্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ উল্লেখ থাকে। ঋণের নিদর্শন পত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ; যথা—

(ক) বিদেশে নিজ এজেন্টকে অর্থ যোগাইবার জন্ত। এজেন্টকে এই পত্র দিলে যে কোন দেশে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এজেন্ট এই পত্রের বিনিময়ে অর্থ পাইতে পারে। ইহাতে এজেন্টের নমুনা সহি ( specimen signature ) এবং সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ দেওয়া থাকে।

(খ) বিলের স্বীকৃতি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও অনেক ক্ষেত্রে এই পত্র রচনা করা হয়। ইহাতে যদি কোনরূপ সর্ব আরোপ না করিয়া বিলে

স্বীকৃতি দিবার বা বিল মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে ইহাকে খোলা ঋণের নিদর্শন পত্র (Open letter of Credit) বলে। কিন্তু অনেক সময় কতগুলি সর্ত্ত আরোপ করিয়া এই পত্রে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তখন ইহাকে দলিল ঘটিত ঋণপত্রের নিদর্শন পত্র (Documentary letter of credit) বলা হয়।

বহির্বাণজ্যে সাধারণত ইহার দ্বিতীয় ব্যবহারই হইয়া থাকে। এই পত্রের ভিত্তিতে রপ্তানিকারক নিজ দেশে আমদানিকারকের অনুমোদিত ব্যাংকের নিকট হইতে বিল ভান্সাইতে পারে।

৮। বন্ধকীপত্র (Letter of Hypothecation) :—অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমদানিকারক আমদানিকৃত মাল ছাড়াইবার মত অর্থের সংস্থান করিতে পারে না। তখন সে ব্যাংকের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া গুদামজাত কবে এবং বিনিময়ে ব্যাংককে একটি বন্ধকী রসিদ দেয়। ব্যাংক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ ফেরৎ না পায় তবে এই বন্ধকী রসিদের ভিত্তিতে বন্ধকী মাল বিক্রয় করিতে পারে, অথবা ঐ মাল সম্পর্কে অগ্ররূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া টাকা উত্তল করিয়া লইতে পারে।

বিলে স্বীকৃতি-অধীন দলিল পত্র এবং বিল পরিশোধ অধীন দলিল পত্র (D/A and D/P) :—

আমরা জানি যে রপ্তানিকারক আমদানি কারককে চালানীরসিদ, বাণিজ্যদূত প্রদত্ত চালান ইত্যাদি কতকগুলি দলিল না দিলে সে ঐ মাল ছাড়াইয়া লইতে পারে না। সাধারণত রপ্তানিকারক তাহার বিল সমেত ঐ দলিলগুলি আমদানিকারকের দেশে তাহার নিজ এজেন্ট-ব্যাংককে পাঠায়। ঐ এজেন্ট-ব্যাংকের উপর যদি এই রূপ নির্দেশ থাকে যে বিলে স্বীকৃতি না দিলে দলিল হস্তান্তর করিবে না তবে ঐ দলিলকে D/A বা Documents on acceptance বলে। আবার এজেন্ট-ব্যাংককে যদি এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে বিলের অর্থ পরিশোধ না করিলে দলিল হস্তান্তর করিবে না তবে ঐ দলিলকে D/P বা Documents on Payment বলে।

রপ্তানি বাণিজ্যে মালের মূল্য অনেক সময় প্রকৃত মূল্যের সহিত খরচ পত্রাদি যোগ করিয়া ধার্য করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন খরচ যোগ করিয়া

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

এক একটি মূল্য দাঁড়ায় এবং উহাদেরকে কয়েকটি সূচক দ্বারা জানান হয়। নিম্নলিখিত সূচকগুলিও উহাদের তাৎপর্য লক্ষ্য কর :—

- (ক) LOCO=LOCO এ সূচক দিয়া দর উল্লেখ করিলে বুঝিতে হইবে যে ইহাতে শুধু উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা ধরা হইয়াছে।
- (খ) F.O.W. =এই কথাটির সম্পূর্ণ বাক্য হইল Free on wagon. ইহাতে উৎপাদন ব্যয়, মুনাফা এবং গাড়ীতে অথবা জাহাজে মাল বোঝাই করা পর্যন্ত সমস্ত খরচা ধরা হয়।
- (গ) F.A.S. =ইহাতে উৎপাদন ব্যয়, মুনাফা, গাড়ীতে বা জাহাজে মাল বোঝাইয়ের যাবতীয় খরচা এবং ডকের যাবতীয় মাশুল ধরা হয়। ইহার পূর্ণ কথাটি হইল Free Alongside Ship.
- (ঘ) F.O.B. =ইহার পূর্ণ বাক্য Free On Board। ইহাতে উৎপাদন ব্যয়, মুনাফা, মাল বোঝাইয়ের খরচা, ডকের মাশুল এবং রপ্তানী শুল্ক ধরা হয়। এক্ষেত্রে মাল ডেলিভারি পর্যন্ত দায়িত্ব রপ্তানিকারকের।
- (ঙ) C.F. =ইহার পূর্ণ কথাটি Cost and Freight। ইহাতে উৎপাদন ব্যয়, মুনাফা ইহাতে আরম্ভ করিয়া জাহাজ বা গাড়ী গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পর্যন্ত যাবতীয় খরচ ধরা হয়; কিন্তু বীমা ব্যয় ইহাতে ধরা হয় না।
- (চ) C.I.F. =C.I.F. বলিতে Cost, Insurance and Freight বুঝায়। ইহাতে উৎপাদন ব্যয় এবং মুনাফা ইহাতে আরম্ভ করিয়া জাহাজ বা গাড়ী গন্তব্য স্থলে পৌঁছান পর্যন্ত যাবতীয় খরচ ধরা হয়। বীমা খরচ ও ইহাতে বাদ পড়ে না।
- (ছ) Franco=Franco বলিতে যে মূল্য বুঝায় তাহাতে উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা ইহাতে আরম্ভ করিয়া আমদানিকারকের ঠিকানা মাল পৌঁছান পর্যন্ত যাবতীয় খরচ ধরা হয়। এক্ষেত্রে মাল আমদানিকারকের ঘরে পৌঁছান পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব রপ্তানিকারকের।



## বাণিজ্যিক তথ্য

নিম্নের টেবিলটিতে উপরের আলোচনা ছকে আঁকা হইল :

উৎপাদন শুল্ক ও ফ্রি-ডাউন	বিক্রয় বা স্থানান্তর শুল্ক	উৎসের চ্যাপ্টা	বণ্টনী শুল্ক	সামগ্রী জাড়া	বীমা ব্যয়	আমদানীকরনীয় দ্রব্যের মান নষ্ট হইলে প্রদত্ত	স্থানীয় মাল	পরিচালনা
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Loco + ...	F.O.W. .... +	F.A.S. .... +	F.O.B. .... +	C.F. ....	C.F. ....			

## বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক

### (Customs & Excise)

কোন রাষ্ট্রেব যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্ত নাগরিকদের নিকট হইতে যে বিভিন্ন শুল্ক এবং কর আদায় করা হয় তাহাদের অগ্রতম এই **বাণিজ্যশুল্ক** এবং **উৎপাদন শুল্ক**। বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত দ্রব্যের উপর এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানীদ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় করা হয় তাহাকে **বাণিজ্যশুল্ক** বা Customs বলা হয়। এবং দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের উপর যে শুল্ক আদায় করা হয় তাহাকে বলা হয় **উৎপাদন শুল্ক** বা Excise। আমরা এই অংশে বাণিজ্য শুল্ক এবং উৎপাদন শুল্ক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিব।

## বাণিজ্য শুল্ক

পূর্বেই বলিয়াছি যে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত আমদানিদ্রব্য এবং বিভিন্ন দেশে প্রেরিত রপ্তানি দ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহাকে বাণিজ্যশুল্ক বা Customs বলে। সরলতার জন্ত আমরা বলিতে পারি যে বাণিজ্যশুল্ক দুইপ্রকারের—(১) **আমদানি শুল্ক** (Import duty) এবং (২) **রপ্তানি শুল্ক** (Export duty)।

রাষ্ট্রের বাণিজ্যশুল্ক বিভাগ (Customs Department) এই শুল্ক আদায় করে। এই বিভাগের কার্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করিবার জন্ত বিভাগীয় কার্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) জাহাজ যোগে অগ্র দেশের কোন দ্রব্য বিনা অস্থমতিতে অথবা বিনাশুল্কে দেশে প্রবেশ করিতে না পারে এবং দেশের কোন পণ্য বিনা অস্থমতিতে বা বিনা শুল্কে অগ্র দেশে রপ্তানি হইতে না পারে তাহা দেখা।

২। যে সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে অথবা আমদানি হইয়া শুকু বিভাগের গুদামে অথবা বন্ধকী গুদামে (bonded warehouse) গুদামজাত হইয়াছে তাহা জাহাজের অধ্যক্ষের রিপোর্টের সহিত মিলাইয়া উহার উপর শুকু আদায় করা এবং সমস্ত পণ্য বন্ধকী গুদামে ভর্তি কালে এবং উহা বিলির (delivery) সময় যথাযথ দৃষ্টি এবং সতর্কতা অবলম্বন করা; রপ্তানির পণ্য সম্পর্কেও রপ্তানিকারকের নিকট প্রাপ্ত বিবরণীর সহিত পণ্যের মিল করা এবং উহার ভিত্তিতে শুকু আদায় করা।

৩। শুকু বাবদ আদায়ী অর্থের হিসাব রাখা এবং বিদেশ হইতে আগত জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে পণ্যের রিপোর্ট গ্রহণ করা ও বিদেশগামী জাহাজের অধ্যক্ষকে ছাড়পত্র (Clearance Certificate) দেওয়া....

....বাণিজ্য শুকু বিভাগ এই তিন প্রকারের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। এই বিভাগের (বিশেষ করিয়া ইহার প্রথম শাখার) কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদিত না হইলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে শুকুবিভাগের কার্যের বিবরণী দেওয়া প্রয়োজন।

জাহাজ বন্দরে আসিলেই জাহাজের অধ্যক্ষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি রিপোর্ট শুকুবিভাগে দাখিল করিবে। এই রিপোর্টকে ইংরাজীতে (Ships Report) বলে। নির্দিষ্ট ফরমে লিখিত এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকিবে :—

(ক) জাহাজের নাম, কোন দেশের জাহাজ, কোন বন্দর হইতে ছাড়িল, জাহাজের অধ্যক্ষের নাম, খালাসীর সংখ্যা এবং যাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি।

(খ) জাহাজের সমস্ত পণ্যের বিশদ বিবরণী।

(গ) জাহাজের অধ্যক্ষের অথবা খালাসীদের নিজস্ব কোন শুক্কীয় দ্রব্য থাকিলে এই রিপোর্টে তাহার বিবরণীও দিতে হইবে; নতুবা ঐ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইতে পারে অথবা ঐ দ্রব্য সম্পর্কে কোনরূপ জালিয়াতি প্রমাণ হইলে জাহাজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনের পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে।

আমদানিকারকে আমদানীকৃত দ্রব্যের একটি বিবরণী শুকুবিভাগে দাখিল করিতে হইবে। বিবরণীতে কি তথ্য থাকিবে তাহা শুকুবিভাগ

বিবেচনা করিবে। সাধারণত নির্দিষ্ট ফরমে এই বিবরণী পেশ করিতে হয়। এই বিবরণীর সহিত শুদ্ধবিভাগ জাহাজের অধ্যক্ষের রিপোর্ট মিলাইবে এবং বিবরণী পাশ করিবে। এই বিবরণী পাশ হইবার পরেই মাল জাহাজ হইতে নামান যায়। এই বিবরণীকে ইংরাজীতে Entry বলে।

যে সমস্ত মালের আমাদানি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ তাহা ছাড়া সকল দ্রব্যই উপরোক্ত ব্যবস্থার পরে জাহাজ হইতে নামান যাইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ বিভাগকর্তৃক পণ্য পরিদর্শন এবং Entry পাশ হইবার পূর্বে পণ্য কোনরূপে নড়ান যায় না।

শুদ্ধবিভাগ পণ্য পরিদর্শন কালে দুই রকমের পণ্যের সম্মুখীন হয়—  
(১) শুদ্ধীয় পণ্য (dutiable goods) এবং (২) বিনা শুদ্ধ পণ্য (free goods)।

শুদ্ধীয় পণ্য আমদানির আমদানিকারক অবিলম্বে শুদ্ধ দিয়া মাল খালাস করিতে পারে অথবা মাল গুদামজাত করিতে পারে। অবিলম্বে শুদ্ধ দেওয়ার ক্ষেত্রে, শুদ্ধবিভাগ আমদানিকারকের বিবরণীতে (Entry) মালের বিবরণী, ওজন, মূল্য এবং শুদ্ধের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া Entry পাশ করে এবং শুদ্ধ আদায় করে। ইহার পরে এই বিবরণী ডকএ (dock) পাঠান হয়। সেখানে মালের ওজন ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ওজন বেশী কম হইলে অতিরিক্ত শুদ্ধ আদায় বা ফেরতের ব্যবস্থা আছে। ওজন ইত্যাদি যাচাই হইবার পরে মাল খালাসের অনুমতি দেওয়া হয়।

কিন্তু আমদানিকারক যদি আমদানীকৃত পণ্য গুদামজাত করিতে চায় তবে আমদানিকারকের বিবরণীতে (Entry) পণ্য গুদামজাত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। শুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা হয় না। এই আদেশের এককপি গুদামের অধ্যক্ষের নিকট এবং এক কপি ডকএ পাঠান হয়। ডক হইতে শুদ্ধবিভাগের তত্ত্বাবধানে পণ্য গুদামে যায় এবং গুদামের অধ্যক্ষ পণ্য পরিদর্শন করিয়া হিসাব লেখে। গুদাম হইতে মাল বিলির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি মাল দেশের ব্যবহারের জন্য বিলি নেওয়া হয় তবে একটি আত্মপত্র (warrant) তৈরী করিতে হইবে। ইহাতে তিনটি অংশ থাকে—

- ১। মালের বিবরণী সম্বলিত প্রথম অংশ। শুদ্ধবিভাগ ইহাকে মালের সহিত মিলাইবে।
- ২। নির্ধারিত এবং আদায়কৃত শুদ্ধ দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত হয়।
- ৩। তৃতীয় অংশে মাল খালাসের আদেশ গুদামের অধ্যক্ষের উপর

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

দেওয়া হয়। শুক আদায়ের পরেই মাল খালাসের আদেশ প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু পণ্য যদি দেশের ব্যবহারের জন্ত বিলি না লইয়া বিদেশে রপ্তানির জন্ত বিলি লইতে হয় তবে ব্যবসায়ীকে একটি আজ্ঞাপত্র (warrant) এবং একটি জাহাজ বিল (shipping bill) তৈয়ার করিতে হইবে। এই আজ্ঞাপত্রে দুইটি অংশ থাকে (এক্ষেত্রে শুক আদায় হয় না)। মাল খালাসের আদেশ গুদামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জাহাজবিলখানা ডকএ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সকল প্রকার শুকীয় রপ্তানিদ্রব্যের জন্তই ব্যবসায়ীকে একটি বণ্ড দিতে হয়। ডক-এর অফিসার যখন জাহাজী বিলএ রপ্তানীর আদেশ দেন তখন ঐ বণ্ডখানি নাকচ করিয়া দেওয়া হয়।

### বাণিজ্য শুক ধার্য করার কারণ :

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্যের উপর কেন শুক ধার্য করা হয়? ইহার বহুবিধ কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, দেশের শিল্পপ্রসারের জন্ত অথবা শিশু শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত; দ্বিতীয়ত, শুল্কের মাধ্যমে দুইটি দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত এবং তৃতীয়ত, সরকারী আয় বৃদ্ধি করিবার জন্ত সাধারণত শুক ধার্য করা হয়। আমদানির উপর শুক ধার্য হইলে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন, ঐ একই দ্রব্য, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হইবে এবং দেশীয় শিল্প অতিরিক্ত চাহিদার জন্ত প্রসার লাভ করিবে। এই যুক্তির নাম শিশু শিল্প সংরক্ষণ নীতি (Infant Industry argument)। দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (balance of trade) কোন দেশের পক্ষে প্রতিকূল (unfavourable) হইলে ঐ দেশ আমদানির উপর শুক বসাইলে আমদানি কমিবে এবং রপ্তানির উপর শুকহার কমাইলে রপ্তানি বাড়িবে। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অল্পকুল হইবে অথবা প্রতিকূল অবস্থা তিরোহিত হইবে। শুকধার্য করিয়া দেশের আয় ও বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রপ্তানি দ্রব্য যদি পৃথিবীর বাজারে এক চেটিয়া ভাবে বিক্রয় হয় তবে এই যুক্তিতে শুক ধার্য করিলে লাভবান হইবে। আবার ইহাও বিচাৰ্য্য যে যদি অতিরিক্ত হারে শুক ধার্য করা হয় তবে ঐ দ্রব্যের বিকল্প কোন দ্রব্য অথবা দেশ ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং রপ্তানির পরিমাণ কোনরূপে কমাইয়া যদি শুকধার্য

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

করা যায় তবে দেশের লাভ হইবে। অনেকক্ষেত্রে, দেশের যে সমস্ত দ্রব্য অতিরিক্ত হারে রপ্তানি হইলে দেশের পক্ষে ক্ষতি সেই দ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়াইলে রপ্তানিমূল্য বাড়িবে এবং আমদানিকারকরা আমদানি কমাইবে। তবে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রনের জন্ত ‘কোটা’ প্রথাই (Quota system) বেশী কার্যকরী হয়।

## উৎপাদনশুল্ক (Excise duty)

পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশে উৎপন্ন কতকগুলি দ্রব্যের উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাই উৎপাদন শুল্ক। যেমন—কাপড়, সাবান, তেল, দিয়াশলাই, বিড়ি, সিগারেট, ইত্যাদির উৎপাদনের উপর শুল্ক বসান হয়। এই শুল্কের হার প্রতি বৎসর পরিবর্তনও করা যাইতে পারে। দেশের সরকারের আয়ের ইহা একটি প্রধান উৎস। আবার, কতকগুলি দ্রব্য যাহার বহুল পরিমাণে ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে তাহার উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে আবগারী শুল্ক বলে। যেমন, গাজা, সিদ্ধি, মগ, আফিম, ইত্যাদি যাবতীয় মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়। আবগারী দ্রব্য সাধারণত সরকার নিয়ন্ত্রন করে এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীই শুধু এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। অত্যাগ্র দ্রব্যের উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদন শুল্কবিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে এবং প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আদায় করিয়া উহাতে ছাপ দেওয়ার পরেই ঐ সকল দ্রব্য বাজারে বাহির করা যায়। দিয়াশলাইরবাক্সের উপর যে কাগজের ফিতাটি জড়ান থাকে উহাই উৎপাদনশুল্ক প্রদানের নিদর্শন।\* মিলের কাপড়ে তোমরা নিশ্চয়ই উৎপাদনশুল্কের পরিমাণ ছাপান দেখিয়াছ।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

### বাণিজ্যশুল্ক ও উৎপাদন শুল্কের তুলনা :

বাণিজ্য শুল্ক	উৎপাদন শুল্ক
১। এই শুল্ক বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্ভারের উপর ধার্য হয়।	১। ইহা দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয়।
২। এই শুল্ক ধার্য করিয়া শিল্প শিল্প সংরক্ষণ সম্ভব।	২। ইহা দ্বারা শিল্প সংরক্ষণ সম্ভব নহে।
৩। ইহা দ্বারা আমদানি ও রপ্তানি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যদিও 'কোটা' নীতি বেশী কার্যকরী।	৩। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। তবে রপ্তানির জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের উপরেও যদি শুল্ক চাপান হয় তবে রপ্তানি কমে এবং উহার উপর হইতে শুল্ক বাদ দিলে রপ্তানি বাড়িতে পারে।
৪। ইহা রাজস্ব আয়ের একটি উৎস।	৪। ইহা হইতেও বহু রাজস্ব আদায় হয়।
৫। অব্যাহিত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপাইলে উহার আমদানি কম হইবে; কিন্তু মাদক দ্রব্যের চাহিদার রূপই এই যে অধিক মূল্য হইলেও মাদকদ্রব্য বর্জন খুব কমই দেখা যায়। •	৫। অব্যাহিত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক চাপাইলেও উহার উৎপাদন ও ব্যবহার কমে। কিন্তু মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দ্বারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।
৬। এই শুল্ক আদায়ের ভার বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের (Customs department) উপর।	৬। এই শুল্ক আদায়ের ভার উৎপাদন শুল্ক বিভাগের (Excise department) উপর।

### শুল্ক নির্ধারণের পদ্ধতি ও ভিত্তি

বাণিজ্যশুল্ক সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়।

১। বাণিজ্যের পণ্যের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে যে শুল্ক আদায় করা হয় তাহাকে মূল্যানুযায়ী শুল্ক বা Advalorem duty বলা হয়।

২। বাণিজ্যের পণ্যের মূল্য না ধরিয়া উহার ওজন, পরিমাণ, পরিমাপ

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

অথবা আয়তনের উপর নির্দিষ্ট হারে যে শুল্ক আদায় করা হয় তাহাকে নির্দিষ্ট হার শুল্ক বা Specific duty বলে।

শুল্কবিভাগ কোন পণ্যের উপর উপরিউক্ত যে কোন একটি পদ্ধতিতে শুল্ক আদায় করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে একই পণ্যের উপর উভয় পদ্ধতিতেও দুই প্রকার শুল্ক আদায় করা যাইতে পারে।

কিন্তু যে কোন পদ্ধতিতেই শুল্ক আদায় হউক না কেন উহা নির্ধারিত একটি ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। আমদানিদ্রব্যের উপর শুল্ক বাণিজ্যদূতের চালানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। রপ্তানিকারক দেশ তাহার দেশে আমাদের দেশের যে বাণিজ্য দূত আছে তাহার নিকট হইতে এই চালান সংগ্রহ করে। পণ্যের বিবরণ ও মূল্য সম্পর্কে যাচাই করিয়া বাণিজ্যদূত এই চালান দিয়া থাকেন। ইহা তোমরা আগেই জানিয়াছ। এই চালানে পণ্য জাহাজে তোলা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় এবং জাহাজের ভাড়া ইত্যাদি উল্লিখিত থাকে। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের নিকট হইতে এই চালান ডাকযোগে অথবা এজেন্টের মাধ্যমে পায় এবং মাল খালস করিবার পূর্বে ইহা শুল্কবিভাগে পেশ করে। এই চালানে বর্ণিত মূল্যের উপর অথবা ওজন, পরিমাণ বা আয়তনের ভিত্তিতে শুল্ক ধার্য হয়।

রপ্তানিদ্রব্যের উপর শুল্ক, শুল্কবিভাগীয় চালানের (Customs Invoice) ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এই চালান জেটিসরকার পূরণ করে এবং চালানে বর্ণিত পণ্য মূল্য বা উহার ওজন, পরিমাণ, আয়তনের ভিত্তিতে শুল্ক নির্ধারণ করা হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, কি কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শুল্ক নির্ধারিত হয়। সাধারণত একই দ্রব্যের উপর একাধিক শুল্ক ধার্য হয় না। কোন দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইবার সময় যদি উৎপাদন শুল্ক দেওয়া হয় তবে ঐ দ্রব্য রপ্তানি হইবার সময় রপ্তানিশুল্ক আদায় করিয়া পূর্বে গৃহীত উৎপাদন শুল্ক ফিরাইয়া দেওয়া হয়। আবার, কোন দ্রব্য আমদানির সময় শুল্ক দেওয়া হইলে উহা পুনরায় রপ্তানি করিলে রপ্তানিশুল্ক ধার্য করিয়া পূর্বে গৃহীত আমদানী শুল্ক সরকার প্রত্যর্পণ করেন। এই ব্যবস্থাকে প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা বা Draw back বলে।

অল্পমত দেশগুলি অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন দেশগুলি তাহাদের নিজ নিজ শিল্পকে বাচাইবার জন্ত অথবা রপ্তানির পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

এই সাহায্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমত, সরকার প্রতিটি উৎপাদনের অথবা রপ্তানির একক প্রতি (Per unit) কোন নির্দিষ্ট সাহায্য দিয়া থাকে, (অথবা) দ্বিতীয়ত, সরকার উৎপাদন বা রপ্তানির পরিমাণ বা একক বিচার না করিয়া শিল্পকে মোটা অর্থ মঞ্জু করেন আর্থিক সাহায্য হিসাবে।

এই প্রথম ব্যবস্থাকে 'বাউন্টি' (Bounties) এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাকে সাবসিডি (Subsidies) বলে। এইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু ঊনবিংশতি শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়ে। ১৯৩১ সন হইতে এই ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আবার খুব চালু হইয়া ওঠে। উৎকর্ষতার দিক হইতে বিচার করিলে 'সাবসিডি' ব্যবস্থা 'বাউন্টি' ব্যবস্থা হইতে কম কার্যকরী। সাবসিডি প্রদত্ত অর্থ অবধা ব্যয় হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাউন্টি যেহেতু উৎপাদন অথবা রপ্তানি একক প্রতি দেওয়া হয় সেই হেতু ইহার সহিত উৎপাদন ও রপ্তানির সরাসরি যোগ আছে।

### বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদান ব্যবস্থা :

আমরা পূর্বের আলোচনায় বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য প্রদান ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করিয়াছি। এইস্থলে উহার বিশদ আলোচনা করিব।

বর্তমান যুগে এক দেশ হইতে অন্তর্দেশে অর্থপ্রেরণ উভয় দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আমি ইচ্ছা করিলেই লগনে টাকা পাঠাইতে পারি না। প্রথমত আমার সরকারের নিকট (Exchange Control department) অনুমতি লইতে হইবে এবং পরে ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডীয় পাউণ্ডে রূপান্তর করিয়া আমার অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে। যেহেতু একদেশের মুদ্রা অন্তর্দেশে অচল, সেই জন্য যে দেশের অর্থ পাঠাইতে হইবে সেই দেশের মুদ্রায় নিজ দেশীয় মুদ্রাকে রূপান্তরিত করিয়া অর্থপ্রেরণ সম্ভব। অথবা এমন কোন দ্রব্য নিজ দেশীয় মুদ্রাকে রূপান্তরিত করিতে হইবে যে দ্রব্য যে কোন দেশ গ্রহণ করিবে। এই দ্রব্য স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বর্ণ সকল দেশই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উভয় দেশের মধ্যে দেনা পাওনা স্বর্ণদ্বারা মিটান সম্ভব। কিন্তু কোন দেশের স্বর্ণের পরিমাণের উপর উহার অর্থনৈতিক স্থিতি (Economic stability) অনেকটা নির্ভর করে বলিয়া বর্তমানে স্বর্ণের আদান-প্রদান এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। সুতরাং



## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

দ্বিতীয় ব্যবস্থা কি তাহাই আমাদের বিচার্য। দেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে অর্থ প্রেরণ করিতে হইলে আমরা মণিঅর্ডার, ইন্সিওর, চেক অথবা বিল দ্বারা প্রেরণ করিতে পারি। কিন্তু বিদেশে ইহা চলিবে না। বৈদেশিক দেনা বৈদেশিক বিলের মাধ্যমেই মিটান সম্ভব। কিভাবে বিলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দেনা মিটান হয় তাহা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাউক :

মনে করি, কলিকাতা এবং নিউইয়র্কের সহিত বাণিজ্য চলিতেছে। কলিকাতায় প্রচুর ব্যবসায়ী আছে যাহারা নিউইয়র্ক হইতে মাল আমদানি করে :এবং নিউইয়র্কে মাল রপ্তানি করে। আবার, নিউইয়র্কেও অনেক ব্যবসায়ী আছে যাহারা কলিকাতার সহিত আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। কলিকাতার ক খ গ আমদানি করে এবং শ ব স রপ্তানি করে এবং নিউইয়র্কের A B C আমদানী করে এবং X Y Z, রপ্তানী করে। স্তব্ধ কলিকাতার শ ব স নিউইয়র্কের A B C-র উপর ছণ্ডি (Bill) কাটিবে এবং ঐ ছণ্ডি স্বীকৃতির পর কলিকাতার বিনিময় ব্যাঙ্কে (Exchange Bank) ভান্সাইয়া টাকা পাইবে। আবার নিউইয়র্কের X Y Z কলিকাতার ক খ গ-র উপর ছণ্ডি কাটিয়া উহা স্বীকৃতির পর নিউইয়র্কের কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে ঐ ছণ্ডি ভান্সাইয়া টাকা পাইবে। পরে উভয় বিনিময় ব্যাঙ্কের মধ্যে লেন দেন হইবে। আবার, কলিকাতার কোন আমদানিকারক যদি লণ্ডনে দেয় (payable in London) কোন ছণ্ডি কলিকাতার বিনিময় ব্যাঙ্ক হইতে ক্রয় করিয়া লণ্ডনে তাহার পাওনাদারের নামে স্বস্বাক্ষর (Indorse) করিয়া পাঠাইয়া দেয় তাহা হইলেও তাহার দেনা পরিশোধ হয়। অল্পরূপ ভাবে নিউইয়র্কের আমদানিকারকও কলিকাতায় তাহার দেনা পরিশোধ করিতে পারে। সরকারের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের (Exchange Control!) অহুমতি লইয়া বিদেশে তারযোগে (by telegraphic transfer) পোষ্টাল অর্ডারের মাধ্যমে (by Postal Order) অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট মারফত ( by Bank Draft ) অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু ব্যাপক বাণিজ্যে এই ব্যবস্থার কার্যকারীতা খুবই কম।

বর্তমানে সকল দেশই বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্তব্ধ উভয় দেশের মধ্যে সকল দেনা পাওনা সর্বশেষ সরকারী পর্যায় মিটান হয়। কোন একটি দেশের ( অপর আর একটি দেশের নিকট ) দেনা যদি উহার পাওনার অতিরিক্ত হয় তবে সেই দেশকে স্বর্ণ দ্বারা উহা পরিশোধ করিতে

হয়। কিন্তু বর্তমানে নানারূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বর্ণ আদান প্রদান স্থগিত রাখা সম্ভব। দেনাদার দেশটি যদি আন্তর্জাতিক দনভাণ্ডারের ( International Monetary Fund or I. M. F ) সদস্য হয় তবে এই দনভাণ্ডার তাহাকে তাহার পাওনাদার দেশের মূদ্রা সাময়িক ভাবে ধার দিয়া অথবা তাহার নিজ মূদ্রার বিনিময়ে পাওনাদার দেশের মূদ্রা বিনিময় করিয়া ঋণ-মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। অথবা দেনাদার-দেশ পাওনাদার-দেশের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ লইয়া স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ রাখিতে পারে।

### বাণিজ্যহুত্তি ( Bill of Exchange )

উপরের আলোচনায় আমরা হুত্তি সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছি কিন্তু হুত্তি কি তাহা বলার সুযোগ হয় নাই। এক্ষণে আমরা হুত্তি কি? উহার বৈশিষ্ট্য কি? উহার কার্যকারিতা কি? ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা করিব।

বাণিজ্যহুত্তি ‘লিখিত এবং স্বাক্ষর সম্বলিত এমন একটি সর্ব নিরপেক্ষ নির্দেশ পত্র যাহাতে নির্দেশ দাতা তাহার আদিষ্ট কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র তাহাকে ( আদেশ দাতাকে ) অথবা উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে অথবা হুত্তির বাহককে দিবার জন্ত আদেশ দেয়’। “A Bill of Exchange is an unconditional order made in writing and signed by the maker directing a certain person to pay, on demand or at a calculable future date, a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument.”

উপরিউক্ত সংজ্ঞা হইতে আমরা বাণিজ্য হুত্তির কতগুলি বৈশিষ্ট্য জানিতে পারি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

- ১। হুত্তি লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।
- ২। ইহাতে অর্থপ্রদানের আদেশ থাকিবে।
- ৩। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশটি দেওয়া থাকিবে।
- ৪। অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিবে।
- ৫। আদেশের মধ্যে কোন সর্তের উল্লেখ থাকিবে না।
- ৬। হুত্তির অর্থ চাহিবামাত্র অথবা হিনাব করিয়া বাহির করা যায় এমন একটা ভবিষ্যৎ দিবসে দেয় হইবে।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

৭। ছড়ির অর্থ আদেশ কর্তাকে, তাহার উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে অথবা ছড়ির বাহককে ( অর্থাৎ যেমন নির্দেশ থাকে ) দেয় হইবে।

বাণিজ্যছড়ি, চেক ও অঙ্গীকার পত্র ( বা প্রত্যর্থ পত্র Promissory Note ) এই তিনটি আইন দ্বারা সম্প্রদেয় পত্র ( Negotiable Instrument ) হিসাবে স্বীকৃত। সম্প্রদেয় পত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা স্বতন্ত্রকালে ইহার উপর দাতার মালিকানা সত্ত্বের ফ্রটি থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে ঐ ফ্রটি গ্রহীতার মালিকানা সত্ত্বের উপর বর্তায় না। রামের ছড়ি শ্রাম চুরি করিয়া রহিমকে হস্তান্তর করিলে আমরা বলিতে পারি যে শ্রামের মালিকানা সত্ত্ব ফ্রটি আছে। কিন্তু রহিম যদি মূল্যের বিনিময়ে ফ্রটি সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করিয়া উহা গ্রহণ করিয়া থাকে তবে রহিম উহা মালিক হইবে। ( অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনের অন্তর্গত হয়। ) আবার, অল্পরূপ ক্ষেত্রে ছড়ি না হইয়া যদি ইহা একটা ঘড়ি হইত তবে রহিম কোনকালেই উহার মালিক হইতে পারিত না, কারণ, ঘড়ি সম্প্রদেয় পত্র নহে।

### বাণিজ্য ছড়ির মাধ্যমে মূল্য প্রদান :

কিভাবে বাণিজ্য ছড়ির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদান করা হয় তাহা আমাদের বিবেচ্য। একটা উদাহরণের মাধ্যমে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

মনে করি কলিকাতার স্বপন বহু নিউইউর্কের জোসেফের নিকট হইতে ১০০ ডলার মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছে। পূর্বের আলোচিত নিয়মালুসারে রপ্তানীকারক মাল রপ্তানি করিয়াই রপ্তানির যাবতীয় দলিল পত্র ( চালানী রসিদ ইত্যাদি ) সমেত স্বপন বহুর উপর একটা বিল কাটিয়া উহার প্রতিলিপি ( copy ) তাহার এজেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কলিকাতায় স্বপন বহুর নিকট পাঠাইবে। এজেন্ট ব্যাঙ্কের উপর এমন নির্দেশ থাকে যাহাতে স্বপন বহু বিলের অর্থ না দেওয়া পর্যন্ত অথবা বিলে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত যেন চালানী রসিদ হস্তগত করিতে না পারে। সুতরাং স্বপন বহু ঐ বিলের অর্থ দিয়া চালানী রসিদ পাইবে এবং মাল খালাস করিবে অথবা সে ঐ বিলে নির্দিষ্ট দিবসে অর্থ প্রদানের স্বীকৃতি দিয়া চালানী রসিদ হস্তগত করিয়া মাল খালাস করিবে। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থায় রপ্তানীকারককে বিলের মেয়াদী দিবস ( Maturity date ) পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

অবশ্য আমদানী-কারকের ঋণের নিদর্শন পত্রের (Letter of credit) ভিত্তিতে সে আমেরিকায় ঐ বিল ভান্সাইয়া মেঘাদী দিবসের পূর্বেই অর্থ পাইতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে বাট্টা বাবদ (Discount) তাহার কিছু খরচ হয়, তথাপি এই ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়।

আবার মনে করা যাউক স্বপন বহু একাধারে নিউইয়র্কের জোসেফের নিকট হইতে ১০০ ডলার মূল্যের মাল আমদানি করে এবং নিউইয়র্কের জনসনের নিকট ১০০ ডলার মূল্যের মাল রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে স্বপন বহুর নিকট একটি প্রাপ্য বিল (Bill Receivable, জনসনেরটা) ও একটি দেয় বিল (Bill Payable, জোসেফেরটা) থাকিবে। যেহেতু জনসন ও জোসেফ একই রাজ্যের লোক সেই জন্ত জনসনের প্রাপ্য বিলটি জোসেফের নিকট স্বত্বান্তর করিয়া দিলে উভয় ক্ষেত্রে দেনা পাওনা মিটিয়া যাইবে। শুধু জনসন তাহার বিলের মেঘাদী দিবসে জোসেফকে ১০০ ডলার দিবে। বিনিময় ব্যাঙ্ক হইতে ডলারের বিল ক্রয় করিয়া উহা পাওনাদারকে স্বত্বান্তর করিয়া দিয়াও দেনা মিটান যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাণিজ্য ছত্তির মাধ্যমে মূল্য প্রদানে অনেক সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ :—

### বাণিজ্য ছত্তির সুবিধা বা কার্যকারিতা :

১। ছত্তিটি চাহিবামাত্র দেয় না হইয়া যদি নির্দিষ্ট সময় অন্তে (ছইমাস, তিনমাস...ছয়মাস) দেয় হয় তবে আমদানী-কারক কিছুদিনের জন্ত বাকীর সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

২। আবার, রপ্তানী-কারককেও বিলের মেঘাদী দিবস পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে হয় না। বিল ভান্সাইয়া সে যে কোন সময় অর্থের সংস্থান করিতে পারে।

৩। এই ছত্তি স্বত্বান্তর (বা হস্তান্তর) করা যায় বলিয়া নগদ টাকা বা স্বর্ণের আদান প্রদান না করিয়া শুধু ইহার মাধ্যমেই ব্যবসায়ের আদান প্রদান সম্ভব।

উপর্যুক্ত সুবিধাগুলির জন্ত বাণিজ্য ছত্তি বর্তমান যুগে অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিল ব্যবহৃত হয়; আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে বিলের ব্যবহার হয় উহাকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছত্তি (Inland Bill)

## বাণিজ্যিক তথ্য

বলে। এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে যে বাণিজ্যহুণ্ডি ব্যবহৃত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য হুণ্ডি ( Foreign Bill ) বলে।

এ দুই প্রকার বিল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

**আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যহুণ্ডি :** এই বিলের প্রেরক ( drawer ) এবং গ্রাহক ( Drawee ) একই দেশের লোক। যেমন কলিকাতার অশোক দত্ত যদি বোম্বাইয়েব সুনীল দত্তের উপর হুণ্ডি কাটে তবে ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হুণ্ডি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ হুণ্ডির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে হুণ্ডির অর্থ হুণ্ডি প্রেরকের ( Drawer ) দেশে দেয় হইবে। সুতরাং কলিকাতার অশোক দত্ত যদি লণ্ডনের স্টিফেনের উপর এই সর্তে হুণ্ডি কাটে যে হুণ্ডির অর্থ ভারতের যে কোন জায়গায় দেয় হয় তবে এই হুণ্ডিও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যহুণ্ডি।

**বৈদেশিক বাণিজ্য হুণ্ডি :** বাণিজ্যহুণ্ডিতে যদি প্রেরক ( Drawer ) একদেশের এবং গ্রাহক ( Drawee ) অন্য দেশের হয় এবং যদি বিলের অর্থ গ্রাহকের দেশে দেয় হয় তবে ইহা একটি বৈদেশিক বাণিজ্য হুণ্ডি। এই হুণ্ডির সাধারণতঃ তিনটি প্রতিলপি ( copy ) প্রস্তুত হয়। ইহার ভাষা বিল প্রেরকের দেশের কিন্তু মুদ্রার অঙ্ক বিল গ্রাহকের দেশের নিয়মানুসারে হয়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যহুণ্ডি ও বৈদেশিক বাণিজ্যহুণ্ডির তুলনা করিলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিব।

### আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যহুণ্ডি

- ১। ইহার ভাষা ও মুদ্রা প্রেরকের নিজ দেশীয়।
- ২। ইহার একটা কপি তৈয়ারী হয়।
- ৩। ইহাতে একবার স্ট্যাম্প শুদ্ধ দিতে হয়।
- ৪। ইহার নমুনা নিম্নরূপ :

### বৈদেশিক বাণিজ্যহুণ্ডি

- ১। ইহার ভাষা প্রেরকের দেশের কিন্তু মুদ্রা গ্রাহকের দেশের।
- ২। ইহার তিনটা কপি তৈয়ারী হয়।
- ৩। ইহাতে প্রেরকের দেশে একবার এবং গ্রাহকের দেশে একবার স্ট্যাম্প শুদ্ধ দিতে হয়।
- ৪। ইহার নমুনা নিম্নরূপ :

Stamp	126, Harison Road Calcutra 19th Oct. 1962
Sixtydays after date pay to us or our order the sum of Rupees one Thousand for value received. <b>Rs. 1000/-</b>	
To Baij Nath Chowbe Bombay-1	SD/- Brith for Estern Traders

Stamp	123, Canning St. Calcutta
Ninety days after sight of this first of Exchange ( second or third of the same tenor and date un- paid) pay to James Masou or order, the sum of one Thousand pounds, for Value Received. £1000/-	
To M/s Turner Morris LONDON, U.K.	SD/- S. Sath Estern Tou Syndicate, Ltd.

( বিঃ দ্রঃ—ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, যথা—বাংলা, হিন্দী, তামিল ইত্যাদি। যে কোন ভাষায়ই আভ্যন্তরীণ বিল লেখা যাইতে পারে। তবে সব প্রদেশের লোকই বাহাতে ইহার ভাষা বুঝিতে পারে সেইজন্য সাধারণত হুণ্ডি ইংরেজী ভাষায়ই লেখা হয়। উপরের নমুনা ও তাই ইংরেজীতে দেওয়া হইল। )

আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের মূল্য অনেক ক্ষেত্রে চেকের ( Cheque ) মাধ্যমেও দেওয়া হয়। এই চেকও একপ্রকারের হুণ্ডি।

চেক ব্যাঙ্কের উপরে রচিত একটি দর্শনী হুণ্ডি “A cheque is a bill of Exchange drawn on a bank and payable on demand.” কিন্তু চেক ও হুণ্ডির মধ্যে অনেক বৈষম্যও আছে।

এই প্রসঙ্গে চেকের সহিত হুণ্ডির পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন :

হাও	চেক
১। হুণ্ডি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর রচিত হয়।	১। চেক শুধু ব্যাঙ্কেব উপরই কাটা যায়।
২। রপ্তানি বা বিক্রয়ের পরিবর্তে হুণ্ডি রচিত হয় ( উপযোজক হুণ্ডি ছাড়া )।	২। ব্যাঙ্কে জমা অর্থের উপর চেক কাটা হয়।
৩। হুণ্ডি যে কোন কাগজেই লেখা যায়।	৩। চেক শুধু ছাপান এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত চেক বইতেই লেখা যায়।
৪। হুণ্ডি দর্শনী অথবা মেয়াদী হইতে পারে।	৪। চেক সব সময়ই দর্শনী।
৫। মেয়াদী হুণ্ডিতে স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে।	৫। মেয়াদী চেক হইতেই পারে না।
৬। হুণ্ডি পাওনাদার রচনা করে।	৬। চেক ও জামানতকারী কাটে।
৭। বৈদেশিক হুণ্ডি তিন কপি হয়।	৭। কোন চেকই একখানার বেশী কপি হয় না।
৮। হুণ্ডিতে স্ট্যাম্পের প্রয়োজন আছে।	৮। ভারতে চেকে স্ট্যাম্প শুধু লাগে না।
৯। হুণ্ডিতে প্রেরক, গ্রাহক ও প্রাপক এই তিন পক্ষ।	৯। চেকে প্রেরক, ব্যাঙ্ক ও প্রাপক এই তিন পক্ষ থাকে।

## মুদ্রার বিনিময় হার (Rate of Exchange)

কি করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন বাণিজ্য ছত্তির মাধ্যমে হইয়া থাকে তাহা আমবা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাণিজ্য ছত্তি কত অঙ্কের হইবে তাহা ঠিক করিতে হইলে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কি করিয়া মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

যে হারে কোন মুদ্রা বৈদেশিক কোন মুদ্রার সহিত বিনিময় করা হয় তাহাকে মুদ্রা বিনিময় হার বলে। যেমন ১ টাকার পরিবর্তে ১০ পাউণ্ড, ডলার বা ফ্রাঙ্ক পাওয়া যায় তাহাকেই বিনিময় হার বলে। ভারতে বিনিময় হার যদি ১ শি ৪ পে লেখে তবে বুঝিতে হইবে যে ১ টাকার পরিবর্তে ১ শি ৪ পে পাওয়া যাইবে। প্রতি দেশেই বিনিময় হার লেখার পদ্ধতি এই যে ইহাতে ঐ দেশের একক মুদ্রার (১ টাকা, ১ পাউণ্ড, ১ ডলার....ইত্যাদি, বিনিময়ে যে পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় তাহাই শুধু লেখা থাকে। লগুনে যদি লেখে বিনিময় হার ২'৮০ ডলার তবে বুঝিতে হইবে ১ পাউণ্ড = ২'৮০ ডলার।

### বিনিময় হার নির্ধারণ :

#### (Determination of foreign Exchange rate)

কিভাবে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইবে তাহা নির্ভর করে উভয় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার উপর। আমরা জানি যে মুদ্রা স্বর্ণ মানের ভিত্তিতে তৈয়ারী হইতে পারে (Gold Standard) অথবা উহা অপরিবর্তনীয় কাগজীমুদ্রার ভিত্তিতে তৈয়ারী হইতে পারে। সুতরাং বিনিময় হার নির্ভর করিবে; কিসের ভিত্তিতে মুদ্রা রচিত, তাহাব উপরে। প্রথমে আমরা স্বর্ণমানের ভিত্তিতে রচিত মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইব।

#### স্বর্ণমানের অধীনে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ :—

তাইটা দেশের মুদ্রা যদি স্বর্ণমানের ভিত্তিতে রচিত হয় তবে দেখিতে হইবে যে, একটি দেশের আদর্শ মুদ্রায় (Standard Coin) যত পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই পরিমান স্বর্ণ অপর দেশের কতকগুলি আদর্শ মুদ্রায় আছে। তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় দেশের মুদ্রা সংখ্যাই প্রথম দেশের একক (unit) মুদ্রার পরিবর্তে পাওয়া যাইবে। এবং উহাই উহাদের বিনিময় হার। মনে

করা যাউক, ইংলণ্ডীয় ১ পাউণ্ডে ১১৩ গ্রেন স্বর্ণ ( বর্তমানো কিস্ত হহা নাহ ) ;  
আমেরিকার ১ ডলারে ২৩.২২ গ্রেন স্বর্ণ ; এবং ভারতের ১ টাকায় ৭ গ্রেন  
স্বর্ণ আছে। এক্ষেত্রে ভারতের টাকার সঙ্গে পাউণ্ড এবং ডলারের বিনিময়  
হার নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে।

$$১ টাকা = ৭ গ্রেন স্বর্ণ$$

$$\therefore \text{কিন্তু, } ১ পাউণ্ড = ১১৩ গ্রেন স্বর্ণ$$

$$\therefore ১ গ্রেন স্বর্ণ = \frac{১}{১১৩} পাউণ্ড$$

$$\text{অতএব } ৭ \text{ " " } = \frac{১}{১১৩} \times ৭ পাউণ্ড বা ১ শি ২.৮৭ গ্রে প্রায়।$$

$$\text{আবার, } ১ টাকা = ৭ গ্রেন স্বর্ণ$$

$$\text{কিন্তু } ১ ডলার = ২৩.২২ গ্রেন স্বর্ণ$$

$$\therefore ১ গ্রেন স্বর্ণ = \frac{১}{২৩.২২} ডলার$$

$$৭ \text{ " " } = \frac{১}{২৩.২২} \times ৭ ডলার বা ৩০.২০ সেন্ট (প্রায়)$$

$$\therefore ( ১ ডলার = ১০০ সেন্ট )$$

স্বর্ণমানের অধীনে মুদ্রা বিনিময় হার খুব বেশী ওঠা নামা করিতে পারে  
না। কারণ, অবশ্যে স্বর্ণ আমদানি রপ্তানি থাকায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র  
স্বর্ণের মূল্য স্থির (Stabilised) থাকে। বিলের মাধ্যমে যখন উভয় দেশের  
মধ্যে ব্যবসায়িক লেন দেন সংঘটিত হয় তখন যদি কোন দেশে আমদানির  
পরিমাণ রপ্তানি পরিমাণের অধিক হয় তবে সেই বৈদেশিক বিলের চাহিদা  
উহার যোগানের অধিক হইবে। এবং বিনিময় হার ও ব্যবসায়ীরা সুযোগ  
বুঝিয়া বাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু বাড়াইবার ও একটি সীমা আছে। ইহা  
নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানি রপ্তানির মাস্তুলের উপর।  
ভারত ও নিউইয়র্কের মধ্যে ১ টাকার স্বর্ণ ( অর্থাৎ উপরিউক্ত উদাহরণে অল্পমাত্রায়  
৭ গ্রেন ) আমদানি বা রপ্তানির মাস্তুল যদি ১০ নঃ পঃ হয় তবে বিনিময় হার  
 $১.১০ টা = ৩০.২০ সেন্ট$  এবং  $১০ টা = ৩০.২০ সেন্টের$  মধ্যে ওঠা নামা  
করিবে। ইহার কারণ এই যে, যখন ভারতে নিউইয়র্কের বিলের চাহিদা  
বেশী তখন বিলে বিনিময় হার যদি বাড়াইয়া দেওয়া হয় তবে কেহ বিল  
না কিনিয়া সরাসরি স্বর্ণ ক্রয় করিয়া নিউইয়র্কে পাঠাইবে। ইহাতে ১ টাকার  
স্বর্ণ পাঠাইতে মোট খরচা  $১.১০ নঃ পঃ$  এবং এই বায়ে পরিশোধ হইবে  
 $৩০.২০ সেন্টের$  দেনা। আবার, ভারতে যদি নিউইয়র্কের বিলের চাহিদা  
অপেক্ষা যোগান বেশী হয় তবে বিনিময় হার কমিবে, কিন্তু  $১০ নঃ পঃ =$



## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

৩০<sup>১</sup>/<sub>১০</sub> সেন্টের কম হইবে না; কারণ তাহা হইলে আমেরিকা হইতে স্বর্ণ আমদানি হইবে। ইহাতে ১ টাকার পরিবর্তে ৭ গ্রেন স্বর্ণ পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে ১০ ন: প: মাসুল বাদ দিয়া ২০ ন: পয়সার স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রতিকূল বা অনুকূল ব্যবসা উদ্ভূত হইলেও স্বর্ণমানের অধীনে মুদ্রার বিনিময় হার কখন সীমা রেখার বাহিরে যাইতে পারে না। এই সীমারেখাকে (উপরের সীমা এবং নীচের সীমা সামগ্রীক ভাবে) ধাতু বিন্দু বা স্বর্ণবিন্দু (Specie point বা Gold point) বলে। এবং মুদ্রায় স্বর্ণের বা ধাতুর পরিমাণ অনুযায়ী যে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে ধাতুসম বিনিময়-হার Mint Par of Exchange বলে। স্বর্ণ বিন্দু এই হারের কতটা নীচে এবং কতটা উপরে তাহা নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানি বা রপ্তানির মাসুলের উপর।

[ বি: দ্র: '৩০ ডলার বলিলে ৩০ সেন্ট বুঝায় : সুতরাং ৩০<sup>১</sup>/<sub>১০</sub> সেন্ট কিন্তু ৩০ ডলার ১৫ সেন্ট নহে। ইহা ৩০<sup>১</sup>/<sub>১০০</sub> সেন্ট ]

**অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অধীনে মুদ্রারবিনিময় হার নির্দ্ধারণ :**

এই মুদ্রাব্যবস্থায় মুদ্রার সহিত উহার ধাতুর পরিমাণের কোন যোগ থাকে না। সুতরাং বিনিময় হার অবাধে উঠানামা করিতে পারে। তবে বর্তমানযুগে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিনিময় হার রক্ষা করা হয়। এ-তো হল রক্ষার কথা। কি ভাবে বিনিময় হার নির্দ্ধারন করা হয় তাহাই আমাদের বিচার্য্য। অপরিবর্তনীয় কাগজীমুদ্রার বেলায় দুইটি তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইতে পারে—(১) ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity) এবং (২) চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব—(Demand & supply)।

(১) ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব:—এই তত্ত্ব সুইডেনের স্বনামধন্য অর্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক গুস্তভ ক্যাসেল প্রচার করেন। ইহার বিষয়বস্তু এই যে দুইটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপরই উহাদের বিনিময় হার নির্ভর করে। ১ টাকায় ভারতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী কেনা যায় ১ ডলারে আমেরিকায় যদি তাহার সাড়ে তিনগুণ কেনা যায় তবে ১ ডলার সাড়েতিন টাকার সমান। বিনিময় হার তাই নিম্নলিখিত সমীকরণটি দ্বারা প্রকাশ করা যায়:—

$$\frac{১ \text{ ডলার}}{১ \text{ টাকা}} = \frac{১ \text{ ডলারের ক্রয় ক্ষমতা}}{১ \text{ টাকার ক্রয় ক্ষমতা}}$$

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপর যেহেতু বিনিময় হার নির্ভর করে সেই হেতু দেখা যাইবে যে কোন দেশে দ্রব্য মূল্য কমিলে বা বাড়িলে বিনিময় হারও পরিবর্তিত হইবে। মনে করি বর্তমানে ৪ টাকা = ১ ডলার। দ্রব্যমূল্য পরিবর্তিত হইয়া বিনিময় হার দাঁড়াইল ৫ টাকা = ১ ডলার। এখন আমেরিকার ব্যবসায়ীরা দেখিবে যে ১ ডলারের পরিবর্তে তাহারা ১ টাকা বেশী পাইতেছে। তাই তাহারা ১ ডলার বদলাইয়া প্রথমে ৫ টাকা নিবে এবং উহা হইতে ৪ টাকার দ্রব্য ভারত হইতে কিনিয়া আমেরিকায় পাঠাইবে। অর্থাৎ আগে যাহা ৫ ডলারে কিনিত এখন তাহা ৪ ডলারে পাইবে। তাই ভারত হইতে আমেরিকায় বেশী রপ্তানী হইবে। ফলে ভারতে দ্রব্যের দাম আবার বাড়িবে এবং পুনরায় ৪ টাকা = ১ ডলার এই বিনিময় হার ফিরিয়া আসিবে। অনুরূপ ভাবে, যদি ৩ টাকা = ১ ডলার এই বিনিময় হার হয় তবে আমেরিকা হইতে ভারতে বেশী আমদানি হইবে। এবং একই প্রক্রিয়ায় আমেরিকায় দ্রব্য মূল্য বাড়িতে থাকিবে এবং পুনরায় ৪ টাকা = ১ ডলার এই বিনিময় হার ফিরিয়া আসিবে।

এই তত্ত্ব বিনিময় হার আপনা হইতেই ফিরিয়া আসে। ইহাই অব্যাপক ক্যাসেল বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই তত্ত্বের অস্ববিধা এই যে,—

- (ক) ইহাতে বিনিময় হার উঠা নামার কোন সীমা থাকে না।
- (খ) ইহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে অস্ববিধা।
- (গ) ইহা এই সত্য স্বীকার করে না যে মূল্যস্তর পরিবর্তন ছাড়াও বিনিময় হার পরিবর্তন হইতে পারে।
- (ঘ) মূল্যস্তর ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও প্রত্যক্ষ নয়।

এই অস্ববিধার জগুই লর্ড কীন্স (Lord Keynes) প্রমুখ আধুনিক অর্থ বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। তাহাদের মতে আন্তর্জাতিক সূচক সংখ্যা (International Price Index number) নিরূপণ করা হইলে তাহার ভিত্তিতে এই তত্ত্ব অল্পসারে বিনিময় হার নির্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু উহা করা হয় না বলিয়া এই তত্ত্বের প্রয়োগ সূকঠিন এবং অবাস্তব।

(২) চাহিদা ও যোগান তত্ত্বঃ এই তত্ত্বের মূল সূত্র এই যে, কোন মুদ্রার মূল্য (অপর দেশের কত মুদ্রা ইহার এককের পরিবর্তে পাওয়া

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

যায়) নির্ভর করে অপর দেশে উহার চাহিদা ও যোগানের উপর। যেমন, ১ টাকা কত শিলিং এর সমান হইবে তাহা ইংলণ্ডে টাকার চাহিদা ও যোগানের উপর অথবা ভারতে ষ্টার্লিং এর চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। ভারত যদি ইংলণ্ডে মাল রপ্তানি করে তবে ইংলণ্ডে ভারতীয় টাকার চাহিদা হইবে। ভারত হইতে আমদানি ছাড়াও, ইংলণ্ড যদি ভারতে যে কোন কারণে অর্থ প্রেরণ করে তবে ভারতীয় টাকার চাহিদা বাড়িবে। ভুলত যদি ইংলণ্ড হইতে মাল আমদানি করে অথবা অগ্র খাতে যদি ইংলণ্ডে টাকা প্রেরণ করে তবে ভারতে ষ্টার্লিং এর চাহিদা বাড়িবে। ব্যবসায়ের উদ্ভূত যদি ভারতের অল্পকুলে হয় তবে ভারতের টাকার চাহিদা বাড়ে। আবার, যদি উহা প্রতিকূলে যায় তবে উহার (টাকার) চাহিদা কমে। এই রূপ ঘাত প্রতিঘাতে যে স্তরে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অবস্থা দাড়ায় সেখানেই বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

### বিনিময় হার পরিবর্তনে বাণিজ্যের পরিমাণ ও দিক পরিবর্তন :

দুইটি দেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার উভয় দেশের আমদানি রপ্তানির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করিলে কিভাবে আমদানি রপ্তানি পরিবর্তিত হয় তাহা একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

মনে করি বর্তমানে ভারতের ১ টাকা = ২৫ সেন্ট (আমেরিকার)। এখন যদি ভারত মুদ্রামূল্য হ্রাস করে (devaluation) এবং ভারতের ১ টাকা ২০ সেন্টের সমান করিয়া দেওয়া হয় তবে ভারতীয় আমদানীকারকরা দেখিবে যে পূর্বে তাহারা ১ টাকার পরিবর্তে আমেরিকা হইতে ২৫ সেন্টের পণ্য আমদানি করিতে পারিত কিন্তু এখন তাহারা ১ টাকার পরিবর্তে পাইতেছে মাত্র ২০ সেন্টের মাল। স্বতরাং ভারতের আমদানি মূল্য বাড়িল। অতএব ভারতে এখন আমেরিকা হইতে আমদানি কম হইবে। ঠিক একই কারণে, আমেরিকার আমদানীকারকরা দেখিবে যে পূর্বে তাহারা ২৫ সেন্টের পরিবর্তে যে মাল পাইত এখন ২০ সেন্টের পরিবর্তে ঠিক সেই মাল পাইতেছে। অতএব তাহাদের আমদানির মূল্য কমিল। তাহারা ভারত হইতে বেশী আমদানি করিবে (অর্থাৎ ভারতের রপ্তানি বাড়িবে)।

কোন দেশের দেনাপাওনার উদ্ধৃত্ত (Balance of Payment) যখন স্থায়ী ভাবে তাহাব প্রতিকূলে (against) যায় তখন অল্পপায় হইয়া এই

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

অবস্থার পরিবর্তন করিবার জন্ত তাহাকে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে হয়। ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডের স্টার্লিং মূল্য কমান হইয়াছিল। স্টার্লিং ভিত্তিক ভারতীয় টাকার মূল্য ও তাই ১৯৪৯ সালে কমান হয়। কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানী টাকার মূল্য ও কমান হইয়াছে। মুদ্রামূল্য কমাইলে দেশের আমদানি কমে এবং রপ্তানি বাড়ে ইহা সত্য কিন্তু কত বাড়িবে বা কমিবে তাহা আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি, উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ও সম্ভাবনা এবং আরও অনেক কারনের উপর নির্ভর করে। মুদ্রামূল্য হ্রাস কবিলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলিয়া অনিবার্ধ কারণ ছাড়া মুদ্রামূল্য হ্রাস সমর্থিত হয় না।

### বর্তমান যুগের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control) :

মুদ্রামূল্যের ওঠা নামার সহিত বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় বর্তমানে প্রায় সবদেশের সরকারই বৈদেশিক মুদ্রার ও বিনিময় হারের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সাধারণত ৫ টি উদ্দেশ্য :—

- ১। বিনিময় হার স্থির করা ও তাহা রক্ষা করা ;
- ২। মূলধন, স্বর্ণ ইত্যাদির আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা ;
- ৩। অপরিহার্য (Essential) দ্রব্যের আমদানি অব্যাহত রাখা ;
- ৪। লেনদেনের প্রতিকূল উদ্ভূতের (Adverse balance of Payment) প্রতিবিধান করা ; এবং
- ৫। কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি আমদানি করা।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হয় :—

(ক) বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় সরকারের অনুমতি ছাড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(খ) দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ‘কোটা’ (quota) প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হয় ; এবং কোন দেশ হইতে আমদানি করা হইবে অথবা কোন দেশে রপ্তানি করা হইবে তাহা লাইসেন্স দ্বারা ঠিক করিয়া দেওয়া হয়।

(গ) বিদেশের পাওনা আটকাইয়া রাখিয়া এই দেশের ব্যবসায়ীকে শুধু দেশীয় মুদ্রায় খরচ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন, আমেরিকার ব্যবসায়ী ভারতে রপ্তানি করিল। তাহার পাওনা যদি আটকাইয়া শুধু

ভারতে ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হয় তবে তাহাকে ভারত হইতে মাল নিতে হইবে কারণ ভারত হইতে তাহার টাকা অথবা কোন মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে অনেক সময় বাণিজ্য সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়।

(ঘ) বিদেশের সহিত সরাসরি পণ্য লেন দেনের চুক্তি (Barter agreement অর্থাৎ মালের পরিবর্তে মাল, টাকার উল্লেখ নাই), দেনা পাওনা কাটাকাটি করিবার চুক্তি (Clearing agreement) এবং কিভাবে কোন মূল্য দেওয়া হইবে সে বিষয়ে চুক্তি (Payment agreement) ইত্যাদির দ্বারাও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারতবর্ষ এইরূপ চুক্তি বর্তমানে প্রচুর সংখ্যায় করিতেছে।

### বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Defects of Exchange Control)

#### সুবিধা (Merits)

১। ইহার সাহায্যে বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৈদেশিক মুদ্রার ফাটকাবাজি বন্ধ হয় এবং বিনিময় হারের অশিষ্টিতা দূর হয়।

২। অনাবশ্যক আমদানি হ্রাস হয়।

৩। উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদির জন্য অত্যাবশ্যক আমদানির জন্য বৈজ্ঞানিক মুদ্রার যোগান পাওয়া যায়।

৪। দেশের শিল্পপ্রসার করা যায়, ঐ শিল্পের পণ্য বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া।

#### অসুবিধা (defects)

১। ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

২। রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। নিয়ন্ত্রণ হইলেও বৈদেশিক মুদ্রার চোরাকারবার (Black market) ও বৈআইনী আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি দেখা দেয়।

৪। নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত কর্মচারী বৃন্দের অযোগ্যতা, অসামুখ্যতা ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়।

৫। অবাধ বাণিজ্যের অভাবে প্রতিযোগিতা থাকে না, ফলে, দেশী শিল্প ক্রমে অযোগ্য হইয়া পড়ে।

অতএব, অবাধ বাণিজ্যই স্বাভাবিকভাবে সকলের উন্নতির জন্য কাব্য। কিন্তু বর্তমান যুগের জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিনিময়

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এই নিয়ন্ত্রণকে পরিস্থিতি অনুসারে শিথিল করিয়া অবাধ বাণিজ্য পুনরায় প্রবর্তন করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

### আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্য প্রদান ও বিনিময় সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা :

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বাণিজ্য ছত্তির মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা পাওনা অধিকাংশ মিটান হয়। বাণিজ্যছত্তির দর সাধারণত ছত্তির মেয়াদ এবং অর্থপ্রেরণের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

যেমন, টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারের মত এদেশের ব্যাঙ্ক যদি পাওনাদারের দেশের কোন ব্যাঙ্কে তার করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাওনাদারকে দেওয়ার নির্দেশ দেয় তবে পাওনাদার তাড়াতাড়ি টাকা পাইবে। কিন্তু ছত্তির দর বেশী হইবে কারণ তারের খরচাও ঐ দরের সঙ্গে ধরিয়া লওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে (Telegraphic Transfer বা সংক্ষেপে T. T. বলে।

অনেক সময় ছত্তিটি এমন থাকে যে ছত্তির পাওনাদার ছত্তিগ্রাহকের (drawee) নিকট ছত্তিটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পাইয়া যায়। ইহাকে বলে Sight draft বা Demand draft (D. D.)। যদিও ইহা নামে চাহিবা মাত্র দেয় তবু সাধারণত ইহার মেয়াদ তিন দিন। ইহার দর কিন্তু T. T. হইতে কম।

আবার, স্বল্পমেয়াদী বিল (সাধারণত দশদিনের) দিলে (বিলের তারিখ হইতে) তের দিনের দিন (১০+৩ অল্পগ্রহ দিবস) টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার দর D. D. হইতেও কম হইবে। ইহাকে Short Rate বলে।

অনুরূপ ভাবে, ৯০ দিনের মেয়াদী বিল দিলে টাকা পাওয়া যায় ৯৩ দিন পরে। ইহার দর তাই Short Rate হইতেও কম। এই দরকে Long Rate বলে।

অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদী ছত্তির মেয়াদের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর বিক্রয় করা হইলে উহা কি মূলে বিক্রয় করা হইবে তাহা, অবশিষ্টাংশ সময়ের জন্য কি সুদ দিতে হইতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে। যে ছত্তির মেয়াদ ছিল ৬ মাস উহা দুই মাস সময় বাকী থাকিতে যে হারে সুদ দিতে হইবে তাহা কখনই পূর্ববর্তী ৬ মাস মিষাদের ছত্তির উপর প্রযোজ্য

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

স্বদের হারের সমান হইতে পারে না। এই দুই মাসের জন্ত যে স্বদের হার দাবী করা হইবে তাহা স্বল্পমেয়াদী হারও নহে, আবার দীর্ঘ মেয়াদী হারও নহে। এক্ষেত্রে তাই স্বদেশ হারের অনুরূপ হইতে হইবে।

ইহাকে বলে **আংশিক হার** বা **Tel Quel Rate**।

আমরা জানি যে রপ্তানীকারক ব্যাঙ্ক মারফৎ আমদানিকারকের দেশে ছুটি প্রেরণ করে। ব্যাঙ্ক ছুটির প্রাপ্য টাকা আমদানিকারকের নিকট হইতে যে হারে আদায় করে তাহাকে “**ছুটির আদায়ী হার**” বা **Bill collection Rate** বলে। আমদানি কারকের দেশে প্রচলিত হারেই ছুটির টাকা আদায় করা হয়। কিন্তু অনেক সময় বাজার দর যদি খুব উঠানামা করিতে দেখা যায় তাহা হইলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে অগ্রিম চুক্তির দ্বারা (forward contract) এই হার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে তাই অগ্রিমচুক্তি (forward contract) সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার।

### অগ্রিম চুক্তি (Forward Contract)

যখন কোন পক্ষ অপর পক্ষের সহিত ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিবসে নির্দিষ্ট মূল্যে কোন জব্ব ক্রয় বা বিক্রয় করিবার চুক্তি করে তখন সেই চুক্তিকে অগ্রিম চুক্তি বা Forward Contract বলে। অনিশ্চয়তার ঝুঁকি দূর করিবার জন্ত অগ্রিম চুক্তি করা হয়। মনে করা যাউক কলিকাতা বুক হাউস লগনের বুক সিণ্ডিকেটের নিকট ৩০০ শত পাউণ্ড মূল্যের পুস্তকের অর্ডার দিয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতায় পৌঁছিতে ২ মাস সময় লাগিলে এই সময়ের মধ্যে যদি বিনিময় হার পরিবর্তন হয় তবে কোন এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ধরা যাউক যে বর্তমান বিনিময় হার ১টা: = ১শি: ৬পে:। যদি দুইমাস পরে ১টা: = ১শি: ৪পে: হয় তবে কলিকাতা বুক হাউসের ক্ষতি কারণ তাহাকে ৩০০ পাউণ্ডের জন্ত বেশী টাকা দিতে হইবে, আবার বুক সিণ্ডিকেটের লাভ কারণ সে ৩০০ পাউণ্ডের জন্ত বেশী টাকা পাইবে। আবার, যদি বিনিময় হার ১টা: = ১শি: ৮পে: হয় তবে কলিকাতা বুক হাউসের লাভ এবং বুক সিণ্ডিকেটের ক্ষতি। উভয় পক্ষ এই সান্ত্বন্য ক্ষতি এড়াইবার জন্ত অগ্রিম চুক্তি করে। কলিকাতা বুক হাউস কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অগ্রিম চুক্তিতে ২ মাস পরে দেয় ৩০০ পাউণ্ড ১শি:

## বাণিজ্যিক ভব

৬পে: দরে ক্রয় করিবে এবং বুক সিণ্ডিকেট তাহার এক্সচেঞ্জ ব্যাকের নিকট ২ মাস পরে দেয় ৪০০০ টাকা (ইহা, ১টা: = ১শি: ৬পে: দরে ৩০০ পাউণ্ডের সমান) বিক্রয় করিবে। উভয় এক্সচেঞ্জ ব্যাক তাহাদের বুকি গ্রহণ করিল। ব্যাক আবার তাহাদের বুকি কমাইবার জগ্ৰ অগ্রিম চুক্তিতে যত বিক্রয় করিল ঠিক তত পরিমাণ আবার অগ্রিম চুক্তিতে ক্রয়ও করিবে। তাহা হইলে বিপরীত বুকিতে কোন লোকসান হইবে না, কারণ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে লোকসান হইলে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভ হইবে এবং মোটের উপর কোন ক্ষতি হইবে না।

অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে যেমন ভবিষ্যতে বিনিময় হার ওঠা নামার বুকি এড়ান সম্ভব তেমনি আর একটি উপায়েও অনেক ক্ষেত্রে এই লোকসান মিটান যায়। মনে করি উপরিউক্ত উদাহরণে, দুইমাস পরে (অর্থাৎ যখন কলিকাতা বুক হাউস আমদানির মূল্য প্রদান করিবে)। কলিকাতায় ১টা: = ১শি: ৪পে: হইল কিন্তু লণ্ডনে ১শি: ৬পে: = ১ টাকা এই হার আছে। (এই অবস্থা খুবই সম্ভব, কারণ, বিনিময় হার কোন সময়ে পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে)। এক্ষেত্রে কলিকাতা বুক হাউস লণ্ডনে টাকা প্রেরণ করিয়া যদি সেখান হইতে পাউণ্ড (ষ্টার্লিং) ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদান করে তবে তাহার লাভ হইবে এবং ভারতে বিনিময় হার পরিবর্তন জনিত ক্ষতি এড়ান সম্ভব হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে একই সময় দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার দুই দেশের বাজারে, চাহিদা ও যোগানের তারতম্য অনুসারে, ভিন্ন থাকে—যেমন কলিকাতায় ১টা: = ১শি: ৪পে: আবার লণ্ডনে ১শি ৬পে = ১ টাকা এক্ষেত্রে কোন ব্যবসায়ী যদি এই হারের তারতম্যের সুযোগ লইয়া কলিকাতা হইতে ষ্টার্লিং-এর পরিবর্তে টাকা ক্রয় করিয়া উহা লণ্ডনে বিক্রয় করে তবে তাহার লাভ হইবে, কারণ, কলিকাতায় ১শি: ৪পে: এর পরিবর্তে ১ টাকা পাইবে এবং এই টাকা লণ্ডনে বিক্রয় করিলে ১শি: ৬পে: পাইবে। এইরূপ কারবারকে আরবিট্রেজ (Arbitrage Transaction) বলে।

বর্তমান যুগে সকল দেশেই বিনিময় হার স্থির রাখা হয় বলিয়া আরবিট্রেজ-এর প্রচলন নাই বলিলেই চলে। পূর্বে প্রায় প্রতিদেশেই আরবিট্রেজ কারবার চলিত এবং প্রতি দেশের মুদ্রায়ই ইহার কারবার চলিত।



## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

### Exercise

1. What is Foreign Trade ? What are the reasons for foreign trade ?

বৈদেশিক বাণিজ্য কি ? কি কি কারণে উহা সংগঠিত হয় ?

2. Explain the Law of Comparative cost in your own language.

আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম তোমার নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও ।

3. Explain the merits and demerits of foreign Trade.

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা কি ?

4. Explain the characteristics of Indian foreign trade at different phases. (H. S: 1961)

বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর ।

5. Describe the Import procedure in detail.

আমদানি পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা কর ।

or

Supposing you are to import certain goods from London, what procedure you would adopt step by step from the placing of order up to the receipt of the goods and payment therefor ?

অথবা

মনে কর লণ্ডন হইতে তোমাকে কোন দ্রব্য আমদানি করিতে হইবে ।  
অর্ডার পেশ করিবার সময় হইতে দ্রব্য পাওয়া ও তাহার মূল্য পরিশোধ  
করা পর্য্যন্ত পরপর কি পদ্ধতি গ্রহণ করিবে ?

6. Describe the different documents used in Import Trade. (H. S. 1961)

৬. আমদানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দলিলাদির উল্লেখ কর ।

7. Explain the term O. G. L. (open general licence).

ও, জি, এল, কাহাকে বলে ?

8. Describe in detail the Export procedure.

or

What procedure would you follow in exporting goods to a foreign Country ? (W. S. E. B, H. S. 1960)

রপ্তানি পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা কর ।

## বাণিজ্যিক শব্দ

9. Explain the following terms in the Context of foreign Trade:—

(a) Bill of Lading (b) Letter of Hypothecation (c) Letter of credit (d) Certificate of origin (e) Consular Invoice and (f) Mates Receipt.

● বহির্বাণিজ্য প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতগুলি বর্ণনা কর :—

(ক) চালানী রসিদ (খ) বন্ধকী পত্র (গ) ঋণের নিদর্শন পত্র (ঘ) প্রভব লেখ (ঙ) বাণিজ্য দূতের চালান (চ) জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ (মালিকের রসিদ)

10. Write notes on—

(a) Bonded Warehouse (b) D/A (c) D/P.

সংক্ষেপে বর্ণনা কর—

(ক) বন্ধকী গুদাম (খ) ডি/এ (গ) ডি/পি.

11. Define Customs duty and Excise duty, and Distinguish between Customs duty and Excise duty.

(W. S. E. B, H. S. 1960)

বাণিজ্যশুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক কি? বাণিজ্যশুল্ক ও উৎপাদন শুল্কের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

12. With what different aims in view duty is levied on goods?

কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে শুল্কের উপর শুল্ক বসান হয়?

13. What do you know about Advalorem duty and Specific duty? (W. S. E. B., H., S. 1960)

মূল্যানুযায়ী শুল্ক ও নির্দিষ্ট শুল্ক বিষয়ে কি জান?

14. Explain how duty is levied on the basis of Customs Invoice and Consular Invoice.

শুল্কবিভাগীয় চালান এবং বাণিজ্যদূতের চালানের ভিত্তিতে কি ভাবে শুল্ক ধার্য হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

15. Write briefly what you know about—(a) Bounties (b) Subsidies.

(ক) বাউন্টি ও (খ) সাবসিডি সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

16. What is 'Draw Back' ?

ড্র-ব্যাক কি ?

17. What is meant by 'Ships Report' and 'Entry' ?

'জাহাজী রিপোর্ট' ও এন্ট্রি বলিতে কি বুঝায় ?

18. Describe the procedure of remitting money to a foreign country.

বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

19. Define a Bill of Exchange. What is the difference between an Inland Bill and a Foreign Bill ?

বাণিজ্যহুতির হুত্র কি ? আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যহুতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য-হুতির মধ্যে তফাৎ কি ?

20. Write notes on Documentary Bill. (H. S. 1961)

দলিলী হুতির পরিচয় দাও।

21. How does a Bill of Exchange facilitate commerce.

(H. S. 1960)

or

What are the functions of Bill of Exchange.

বাণিজ্যহুতি কি ভাবে বাণিজ্যে সহায়তা করে ?

অথবা

বাণিজ্যহুতির কার্যকারিতা কি ?

22. How does a cheque differ from a Bill of Exchange ?

What is a Promissory Note ?

বাণিজ্য হুতি হইতে চেকের তফাৎ কি ? অঙ্গীকারপত্র কি ?

23. What do you mean by foreign Exchange rate ?

How foreign Exchange rate is determined ?

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বলিতে কি বুঝ ? বিনিময় হার কি ভাবে নির্ধারিত হয় ?

24. Explain how rate of exchange is determined

(a) Under gold standard and (b) Under inconvertible paper currency.

## বাণিজ্যিক তত্ত্ব

স্বর্ণমানের অধীনে ও অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অধীনে কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

25. Can the rate of exchange fluctuate indefinitely under free exchange ?

অবাধ বিনিময়ে বিনিময় হার কি যথেষ্ট ঊঠানামা করিতে পারে ?

●Hints—স্বর্ণবিন্দু (gold points or specie points) আলোচনা কর।

26. Is the Exchange freely allowed in present times ?

বর্তমানযুগে বিনিময় কি অবাধে চলিতে পারে ?

27. Put your argument in favour and against free Trade.

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে তোমার যুক্তির উল্লেখ কর।

28. How rate of Exchange influences foreign trade ? Discuss the effect of devaluation.

কি ভাবে বিনিময় হার বহির্বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ? মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল কি ?

29. State what different classes of rates are generally quoted in foreign trade.

বহির্বাণিজ্যে কি কি বিভিন্ন প্রকারের দর সাধারণত উল্লেখ করা হয় তাহা লিখ।

30. Explain briefly —

(a) Bill collection rate.

(b) Forward contract.

(c) Arbitrage transaction.

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর—

(ক) ছণ্ডির আদায়ী হার

(খ) অগ্রিম চুক্তি

(গ) আরাবট্রেজ

31. What is the utility of letters of credit in foreign trade ?

বহির্বাণিজ্যে ঋণের নিদর্শনপত্রের প্রয়োজনীয়তা কি ?

(Hints—এই পত্রের সাহায্যে রপ্তানিকারক পাওনা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারে : অপরিচিত নূতন ব্যবসায়ীও আমদানি করিতে পারে :

বহির্বাণিজ্যের তাই প্রসার ঘটে : আমদানিকারকের ব্যাক্ উহার যে শাখা রপ্তানিকারকের দেশে আছে তাহার উপর অথবা শাখা না থাকিলে সেই দেশে তাহার যে এজেন্ট আছে তাহার উপর এই নির্দেশ দেয় যে রপ্তানিকারক মাল চালানোর পর প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি জমা দিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ শাখা ব্যাক্ অথবা এজেন্টের নিকট হইতে যেন পায়। এই নির্দেশপত্রে প্রয়োজনীয় দলিলের উল্লেখ থাকে যেমন, চালানএর এক কপি, চালানী রসিদের এক বা একাধিক কপি, নৌ-বীমাপত্র, বাণিজ্যদূতের চালানের কপি, প্রভবলেখ...ইত্যাদি। ঋণের নিদর্শন পত্রের সর্ব নানা রূপ হইতে পারে যেমন—অহুমোদন সাপেক্ষ ঋণ, অহুমোদনীয় ঋণ, দলিলপত্র দাখিল সাপেক্ষ ঋণ, দলিল গ্রহণ সাপেক্ষ ঋণ এবং নির্দিষ্ট ঋণ।)

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বাজার ( Market )

বাজার আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাই সেইখানেই যেখানে বিক্রেতার পণ্য মজুত করে এবং ক্রেতার উহা ক্রয় করিবার জন্ত সমাবেশ হয়। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে বাজার কথাটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কোন পণ্য যখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে কোনস্থানে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় তখন ঐ স্থানকে বাজার বলা হয়; কিন্তু ঐ স্থানে যে ঐ পণ্যের সমাবেশ থাকিতে হইবে এমন নহে; আবার কোন স্থানে আকস্মিক ভাবে বেচা-কেনা হইলেও উহাকে বাজার বলা চলে না; নিয়মিত বেচা কেনা হওয়াই ‘বাজারের’ বৈশিষ্ট্য।

### বাজারের শ্রেণীবিভাগ

#### ( Classification of Market )

নিম্নলিখিত ভাবে বাজারকে শ্রেণীবিভক্ত করিতে পারা যায় :

(ক) বাজারের সীমানার উপর ভিত্তি করিয়া বাজারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) স্থানীয় ( Local ) ( এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রেতা এবং বিক্রেতারাই লেন-দেন করিয়া থাকে এবং সাধারণত, স্থানীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইয়া থাকে ) (২) জাতীয় ( National ) ( এক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয় দেশের সমগ্র ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ) (৩) আন্তর্জাতিক ( International ) ( ক্রয়-বিক্রয় এ ক্ষেত্রে শুধু দেশের সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়ে। )

(খ) বাজারে একক লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া বাজারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) পাইকারী বাজার ( Wholesale Market ) : এ ক্ষেত্রে একক লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশী। )

(২) খুচরা বাজার ( Retail Market ) : ( এ ক্ষেত্রে একক লেনদেনের পরিমাণ খুব কম থাকে। )

(গ) বাজারে বিক্রয়ী পণ্যের ভিত্তিতে বাজারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) শেয়ার বাজার ( Share Market বা Stock Exchange ) :

এই বাজারে গভর্ণমেন্টের ঋণপত্র এবং সরকারী ও বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হইয়া থাকে।

(২) পণ্যের বাজার (Commodity Market বা Commodity Exchange) : এই বাজারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—  
কাঁচামালের বাজার (Produce Exchange) এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার (Industrial Goods Market) : কাঁচামালের বাজারে তুলা, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি বিক্রয় হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে।

(৩) মূলধন বাজার (Capital Market) এবং অর্থের বাজার (Money Market) : এই বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মূলধন সরবরাহ করে এবং আর্থিক সাহায্য দান করে। এই বাজারে মূল্য পাওয়া যায় লভ্যাংশ এবং সুদের মাধ্যমে। ছড়ি বাজারও (Bill Market) অর্থের বাজারের একটি অঙ্গ।

(৪) বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (Foreign Exchange Market) : এই বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এই বাজারে লেনদেন করিতে হয়। বৈদেশিক ছড়ি (foreign bills) এই বাজারের প্রধান বিক্রয়।

(৫) বিক্রীত পণ্যের সরবরাহের সময় অনুসারে অথবা অর্থের বাজারে ধারের মেয়াদ অনুসারে বাজারকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) সত্ত্ব বাজার (Ready Market) : পণ্য যদি বিক্রয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতাকে যোগান দেওয়া হয় তবে সেই বাজারকে সত্ত্ব বাজার বলা হয়।

(২) ফাটকা বাজার (Futures Market) : যে বাজারে লেনদেনটি সম্পূর্ণ হওয়ার অনেকদিন পরে ক্রেতাকে পণ্যের যোগান দেওয়ার চুক্তি থাকে তাহাকে ফাটকা বাজার বলে।

(৩) দ্রুতমেয়াদী অর্থের বাজার (Short term Money Market) : এই বাজারের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে কমদিনের জন্ত (সাধারণত ৯০ দিন) টাকা ধার দেওয়া হয়।

(৪) দীর্ঘমেয়াদী অর্থের বাজার (Long term Money Market) : এই বাজারে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়।

(৬) বাজারে প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া বাজারকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market) : যখন কোন বিশেষ ক্রেতা বা বিক্রেতার উপর কোন দ্রব্যের সামগ্রিক ক্রয় বিক্রয় নির্ভর করে তখন সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। বাস্তবক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার নাই বলিলেই চলে।

(২) পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfectly Competitive Market) : এই বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বহুসংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা অল্পরূপ দ্রব্য বহুল পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কাহারও হাতে বাজারকে প্রভাবিত করিবার ক্ষমতা থাকে না।

(৩) আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfectly Competitive Market) : এই বাজারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলি অবর্তমান। আবার, ইহা একচেটিয়া বাজারও নয়।

(৫) বাজারের সংগঠনের ভিত্তিতে বাজারকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) অসংগঠিত বাজার (Unorganised Market) : এই বাজারের কোন নিয়ম কাহ্নন থাকে না। তাই এই বাজার খুব প্রসার লাভ করিতে পারে না। স্থানীয় সীমারেখার মধ্যেই ইহা প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) সুসংগঠিত বাজার (Organised Market) : এই বাজারের লেনদেন এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়ম থাকে। প্রত্যেককে ঐ নিয়ম মানিয়া লইতে হয়।

(৩) নিয়ন্ত্রিত বাজার (Regulated Market) : এই বাজার গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলি যেমন, বৈদেশিক মজার বাজার, সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। অত্যাবশ্যক দ্রব্যের বাজারও সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপরে বাজারের শ্রেণীবিভাগ দেখান হইল। কিন্তু আমরা ঐ সব শ্রেণীর বাজারের আলোচনা না করিয়া পরবর্তী কয়েকটিতে উহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগুলি নিয়া আলোচনা করিব।



### শেয়ার বাজার ( Stock Exchange )

কোম্পানীর অংশপত্র, সরকারী অথবা স্বায়ত্ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই শেয়ার বাজার দায় সীমাবদ্ধ ( Limited Liability ) কারবার। এই বাজারের সদস্য ছাড়া বাজারের কক্ষের অভ্যন্তরে যাইবার আর কাহারও অধিকার নাই। সদস্যরা অসংখ্য দালালের ( Broker ) মাধ্যমে জমা-সাধারণের সহিত লেনদেন করিয়া থাকে। বর্তমান যুগে শেয়ার বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। কারণ, লর্ড কীনসের মতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপরে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রায় প্রত্যেক দেশের সরকারই তাই, শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখিয়া ঐ বাজারে যাহাতে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর কার্যকলাপ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন।

### শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

#### ( Importance of Stock Exchange )

প্রত্যেক দেশেই শেয়ার বাজারের গুরুত্ব স্বীকৃত। শেয়ার বাজার বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা করে এবং দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়। কিভাবে শেয়ার বাজার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধান করে তাহার কয়েকটি আলোচনা নিয়ে করা হইল।

(১) শেয়ার বাজারের নিত্য পরিবর্তনীয় মূল্য তালিকা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার মাপকাঠির মত কাজ করে। দেশের সঞ্চয়ের বিনিয়োগ শেয়ারের ওঠানামার উপর নির্ভর করে। কোন শেয়ারের দর কমিলে ঐ শেয়ারে আরও বিনিয়োগে লোকের আগ্রহ থাকে না। আবার কোন শেয়ারের দর বাড়িলে ঐ শেয়ারে বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে। তাই বাজার দরের উপর বিনিয়োগ নির্ভর করে। যে স্থলে বেশী বিনিয়োগ কাম্য নয় সেই স্থল হইতে অর্থ কাম্য বিনিয়োগ স্থলে ঘুরাইয়া দেওয়াও শেয়ার বাজারের একটি কার্য।

(২) প্রত্যেক লোকেই তাহার সঞ্চয়কে আয়ের জন্ত বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক যদি তাহার সঞ্চয় নষ্ট হইয়া যাইবার ভয় না থাকে। আবার, শিল্পেরও স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। শেয়ার বাজারে যে কোন সময়ে যে কোন শেয়ার কেনা বেচা হয়। তাই যে বিনিয়োগের জন্ত কিনিতে চায় সে যেমন কিনিতে পারে আবার প্রয়োজনবোধে ঐ শেয়ার সে আবার বিক্রয়ও করিতে

পারে। শেয়ার বাজার না থাকিলে বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া কোম্পানী হইতে অধিক শেয়ারও সে কিনিবে না।

(৩) শেয়ার বাজারের লিষ্টিভুক্ত শেয়ারগুলির দৈনিক দর সর্বদা ছাপান হয় বলিয়া জনসাধারণ জানে যে ঐ দরে সে শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে বিনিয়োগের ইচ্ছা বাড়ে।

(৪) বর্তমান যুগে ক্রমবর্দ্ধমান হারে ব্যবসায় সংগঠন যৌথ কারবারের (Joint Stock Company) দিকে সরিয়া আসিতেছে। যে কোন দেশের অধিকাংশ বিনিয়োগ এই যৌথ কারবারে। তাই যৌথ কারবারের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে বলিয়া শেয়ার বাজার এখন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমান সময়ে শেয়ার বাজারের এমনই গুরুত্ব যে ইহার মূল্যতালিকার গতি দেখিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গতি বোঝা যায়।

(৫) নূতন শিল্পসংস্থাগুলির পক্ষে শেয়ার বাজার খুবই সহায়ক। নূতন কোম্পানীর উত্থোক্তারা তাহাদের কোম্পানীর শেয়ারগুলি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত করাইয়া লয়। ফলে, ঐ শেয়ার বিক্রয় হইতে কোনই অস্ববিধা থাকে না। অনেক সময় শেয়ার বাজারের দালালরা নূতন কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার কিনিয়া লয় এবং পরে উহা বাজারে বিক্রয় করে। ইহাতে নূতন কোম্পানীর খুবই সাহায্য হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্রের প্রচার হয় এই শেয়ার বাজার মারফত। তাই ইহার ফলে ঐ সব কোম্পানীর সুনাম বৃদ্ধি পায় ও ভবিষ্যতে ইহাতে আরও বিনিয়োগ হয়।

(৬) বিনিয়োগকারী জনসাধারণ ও যোগ্য দালালদের কৌশলপূর্ণ কেনা বেচার ফলে শেয়ারের দর আদ্য ভাবে ওঠানামা করে। তবে কিছু কিছু দুর্নীতি ও ফাঁটকার জগু অনেক সময় দর বেনিয়মে ওঠানামা করে।

(৭) সরকারী ঋণ তোলায় ব্যাপারেও শেয়ার বাজার একটি অত্যাবশ্যক সংস্থা। “গভর্নমেন্ট সিকুরিটি” শেয়ার বাজারে কেনা বেচা করিতে না পারিলে অনেকেই ঐগুলি গভর্নমেন্টের কাছ হইতে কিনিত না এবং ফলে গভর্নমেন্টের ঋণ তোলায় অস্ববিধা হইত।

(৮) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও শেয়ার বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ব্যাঙ্কের স্বল্পমেয়াদী জমা শেয়ার বাজারে খাটাইয়া মুনাফা আয় করা হয়। ব্যাঙ্কের ইহা একটি মস্ত বড় আয়ের পথ।

এক্ষণে আমরা শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিব।

## শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য

( Characteristics of Stock Exchange )

শেয়ার বাজারের কর্তৃত্ব, পরিচালনা ও নিয়মবিধি অনুসারে উহার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সবদেশের সব শেয়ার বাজারের কর্তৃত্ব, পরিচালনা বা নিয়মকানুন এক হওয়া সম্ভব নয় তাই উহাদের বৈশিষ্ট্যও একরূপ নহে। তবে কতকগুলি ব্যাপারে মোটামুটিভাবে উহাদের বৈশিষ্ট্যের একটি মিল আছে। তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

(১) শেয়ার বাজার সাধারণত দায়নীয়মাবদ্ধ যৌথ কোম্পানীরূপে গঠিত হয়।

(২) ইহাদের অংশীদারগণ নির্বাচন করিয়া একটি 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্' অথবা 'কমিটি অব ম্যানেজমেন্ট' গঠন করেন। এই বোর্ড বা কমিটি বাজারের পরিচালনার ভাব গ্রহণ করেন।

(৩) শেয়ার বাজারের একটি নিজস্ব ঘর থাকে। ঐ ঘরে সদস্যবা ছাড়া অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই।

(৪) শেয়ার বাজারের যাবতীয় ক্রয় বিক্রয় দালালের মাধ্যমে হইয়া থাকে। দালালবা শেয়ার বাজার কর্তৃক অনুমোদিত। দালালদের মারফত ছাড়া শেয়ার বাজারে কেনা বেচা চলে না।

(৫) শেয়ার বাজারের কেনা বেচা নগদে অথবা বাকীতে হইয়া থাকে। নগদ কারবাবে সাধারণত শেয়ার বিলি ( delivery ) দিবার সময় মূল্য দেওয়া হয়। বাকী কারবারে ১৫ দিন হইতে ১ মাস সময় দেওয়া হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে মূল্য দিতে না পারিলে কিছু সুদ দিয়া আরও সময় পাওয়া যায়।

(৬) ভবিষ্যতে বিলি ও মূল্য প্রদানের চুক্তিতে অনেক সময় শেয়ার কেনা বেচা হয়। স্বতরাং চুক্তি সম্পন্ন হইবার তারিখে শেয়ারের বিলি দিতে না পারিলে অথবা বিলিকৃত শেয়ারের মূল্য প্রদান করিতে না পারিলে চুক্তি করার তাবিখ এবং চুক্তি সম্পাদন হওয়ার তারিখের মধ্যে ঐ শেয়ারের দরের যে পার্থক্য তাহা এক পক্ষ অপর পক্ষকে দিয়া চুক্তি সম্পন্ন করিতে পারে। যেমন, ক ১লা জামুয়ারী তাবিখে ঋ এর নিকট ৩১শে জুলাই তারিখে বিলি দেওয়ার ও মূল্য গ্রহণের ভিত্তিতে ১০০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ শেয়ার ১২৭৮ দরে বিক্রয় করে। ৩১শে জুলাই ঐ শেয়ারের বাজার দর দাঁড়াইল ১৩১৮। ক শেয়ার না দিয়া ঋকে  $8 \times 100 = 800$  টাকা দিয়া চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে।

আমরা এখন পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শেয়ার বাজার নিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব ॥ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শেয়ার বাজারের মধ্যে—

- (১) লণ্ডন শেয়ার বাজার
- (২) নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার
- (৩) কলিকাতা শেয়ার বাজার
- এবং (৪) বোম্বাই শেয়ার বাজার—ই প্রধান।

### লণ্ডন শেয়ার বাজার (London Stock Exchange)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লণ্ডন শেয়ার বাজারের কেনা বেচা চলিত চেঞ্জ এলের (Change Alley) কফি হাউসে। লণ্ডন শেয়ার বাজারের বর্তমান গৃহ স্থাপিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এবং উহার সংবিধান ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সহি হয়। ট্রাষ্টি এবং ম্যানেজারের বোর্ড এই বাড়ীর ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাঁদা আদায় করিত। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল নয় জন। তাহারা মালিকের স্বার্থ দেখিত কিন্তু শেয়ার কেনা বেচায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না। শেয়ার বাজারের প্রকৃত কার্য পরিচালনা করিত ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সাধারণ কমিটি (Committee for general Purposes)। এই কমিটির সদস্যরা প্রতি বৎসর সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইত। এই কমিটি সদস্যদের নালিশ বিবেচনা করিত এবং শেয়ার বাজারের যাবতীয় আইন বলবৎ রাখিবার দায়িত্ব পালন করিত।

এইরূপ দ্বৈত শাসন একশত চল্লিশ বৎসর চলিয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া যায়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ‘বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ’ এবং সাধারণ কমিটি ভাঙ্গিয়া একটি গভর্নিং বডি গঠিত হয়। ইহার নাম হইল ‘কাউন্সিল অব স্টক এক্চেঞ্জ’।

এই কাউন্সিলে সর্বোচ্চ নয়জন স্থাপক সদস্য (foundation members) এবং ২৭ জন সাধারণ সদস্য অর্থাৎ মোট ৩৬ জন সদস্য আছে। কমপক্ষে কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৩০। কাউন্সিলের কার্যাবলীর মধ্যে—শেয়ার বাজারের গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থা, বেতন ভূক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, চাঁদা ইত্যাদি ধার্য করা, সদস্য ও অহুমোদিত কারণিক ভর্তি করা, আরবিটেজ লেন-দেনের অহুমোদন করা, সদস্যদের বিচার করা ও তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা বা অপরাধ মাপ করা……ইত্যাদি প্রধান। বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে একজন

সাধারণ সেক্রেটারী ও একজন করিয়া শেয়ার ও লোন বিভাগের সেক্রেটারী, আর্কিটেক, সাধারণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, নাতোয়ান ( official assignee ), প্রতিনিধি নাতোয়ান ( deputy official assignee ), বিলি ব্যবস্থা বিভাগের ম্যানেজার ( manager of settlement department ) এবং ক্রয় এবং বিক্রয় বিভাগের ম্যানেজার আছে।

কাউন্সিলের নয় জন স্থাপক সদস্য মালিক কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং ২৭ জন সাধারণ সদস্য শেয়ার বাজারের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হয়। প্রতি বৎসর এই ২৭ জন সদস্যের এক তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করে।

লণ্ডন শেয়ার বাজারের মূলধন ২০০০০ শেয়ারের মধ্যে বিভক্ত মোট ৭২০০০০ পাউণ্ড। ৩৬ পাউণ্ডের প্রতিটি শেয়ার সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত। সদস্যরা প্রত্যেকে দুইটি করিয়া শেয়ার ক্রয় করিয়া সদস্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে। যাহাদের অনুমোদিত অভিজ্ঞতা নাই তাহাদের তিনটি করিয়া শেয়ার ক্রয় করিতে হয়। লণ্ডন শেয়ার বাজারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫০০০।

লণ্ডন শেয়ার বাজারের সদস্যরা দুইভাগে বিভক্ত—(১) দালাল ( Brokers ) ও (২) প্রত্যক্ষ কারবারী ( Jobbers )। দালালরা প্রত্যক্ষ কারবারী এবং ক্রেতা বা বিক্রেতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। প্রত্যক্ষ কারবারী ক্রেতা বা বিক্রেতার সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারে না। যোগাযোগ দালালের মারফত হইয়া থাকে। দালালরা সব শেয়ার ক্রয় বিক্রয়েই যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে। প্রত্যক্ষ কারবারীরা শুধু নিজ নিজ বিশেষ শেয়ারই কেনা বেচা দালালের মারফত করিতে পুরে। কোন ব্যক্তি যদি ‘ক’ নামক শেয়ার কিনিতে বা বেচিতে চায় তবে সে দালালের শরণাপন্ন হইবে। দালাল ‘ক’ শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ কারবারীর নিকট দর জানিবে। প্রত্যক্ষ কারবারী দ্বিমুখীদর ( double barrelled price ) অর্থাৎ ক্রয়ের দর ও বিক্রয়ের দর—উভয়ই উল্লেখ করিবে। যখন চুক্তি সম্পাদন হইবে তখন দালাল বিক্রয়-নামা বা ক্রয়-নামা ( sold note or Bought note ) প্রস্তুত করিবে ও উহা বিক্রেতা বা ক্রেতাকে পাঠাইয়া দিবে। দালালের মুনাফা শুধু নির্দিষ্ট হারে ক্রীত বা বিক্রীত শেয়ারের নামিক মূল্যের উপর ( nominal value ) দালালী। সাধারণত দালালরা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই দালালী পায়। প্রত্যক্ষ কারবারীর কিন্তু নীট ক্ষয় দর ও নীট বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যই লাভ বা ক্ষতি। এই লাভ বা ক্ষতিকে বলে Jobbers Turn।

প্রত্যেক দালালের অথবা প্রত্যক্ষ কারবারীর কর্মচারীদের মধ্যে অনুমোদিত কারাগণক (authorised clerk) এবং অননুমোদিত কারাগণক (unauthorised) আছে। উহারা শেয়ার বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। অনুমোদিত কারাগণক তাহার মালিক পক্ষে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অননুমোদিত কারাগণক ক্রয় বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রত্যেক দালাল বা প্রত্যক্ষ কারবারী একজন অনুমোদিত কারাগণক ও দুইজন অননুমোদিত কারাগণকের বেশী নিয়োগ করিতে পারে না।

লণ্ডন শেয়ার বাজারে ‘স্বর্ণপত্র’ সরকারী, বৃটিশ কন্সল, দেশীয় রেলওয়ে শেয়ার এবং দেশীয় শিল্পের শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় হয়।

লণ্ডন শেয়ার বাজারে নগদে অথবা বাকীতে কেনা-বেচা হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯—৪৫) বাকী বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য পাঁচদিনের মধ্যে পরিশোধ্য ছিল। ১৯৪৬ সনের শেষের দিক হইতে আবার বাকী বিক্রয় চালু হয়। সাধারণত বাকী ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে ১৪ দিন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ২১ দিন সময় পাওয়া যায়। ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সমাধা হয় চারদিন বসিয়া। প্রথম দিনকে বলে **মেকিং আপ** (Making up) বা **কণ্ট্যাগো** (Contango) দিবস, দ্বিতীয় দিনকে বলে **টিকেট দিবস** (Ticket day), তৃতীয় দিনকে বলে **অন্তর্বর্ত্তীদিবস** (Intermediate days) এবং চতুর্থ দিবসকে বলে **নিষ্পত্তির দিবস** (settlement day) অথবা **হিসাব দিবস** (Account day)।

প্রথম দিবসে ক্রেতা স্থির করেন যে তিনি নগদ টাকা দিবেন না পরবর্ত্তী নিষ্পত্তির দিন পর্য্যন্ত উহার জের টানিয়া রাখিবেন। এই দিনকে বলে **কণ্ট্যাগো দিবস**। যদি জের টানিয়া রাখিতে চান তবে বিক্রেতাকে কিছু অর্থ দিতে হইবে। এই অর্থকে বলে **কণ্ট্যাগো**। দ্বিতীয় দিবসে দালাল ক্রেতা বিক্রেতার নাম ও অগ্রাঙ্ক বিবরণ লিখিয়া প্রত্যক্ষকারবারীকে দেয়। তৃতীয় দিবসে দলিল পত্রাদি প্রস্তুত হয়। এবং চতুর্থ দিবসে নিষ্পত্তি হয়। যদি নগদ কারবার হয় তবে এই দিনে পাওনা মিটান হয়। যদি বাকী কারবার হয় তবে হিসাবে লেনদেনটি লেখা হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে মূল্য নগদ পরিশোধ না করিয়া পরবর্ত্তী নিষ্পত্তির তারিখ পর্য্যন্ত জের টানিতে হইলে, বিক্রেতাকে কণ্ট্যাগো দক্ষিণ দিতে হয়। সেইরূপ ভাবে যদি বিক্রেতা শেয়ারের বিলি এখনই না দিয়া উহার জের

পরবর্তী নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত টানিতে চাহেন তবে ক্রেতাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। এই দক্ষিণাকে বলে 'Backwardation'।

### নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার

নিউইয়র্কের Wall Street-এ অবস্থিত নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার এখন Wall Street নামেই বেশী পরিচিত। লণ্ডন শেয়ার বাজারের মত ইহা স্বসংহত নহে। ইহাকে মোটামুটি ভাবে একটি স্বৈচ্ছামূলক (voluntary) প্রতিষ্ঠান বলা চলে। ইহার সংবিধান অল্পযায়ী সদস্য সংখ্যা ১৩৭৫ জনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সদস্যপদ অপরের নিকট বিক্রয় করা যাইতে পারে। সদস্য হইতে হইলে গভর্নর বোর্ডের মিটিং-এ নাম প্রস্তাব এবং দুই তৃতীয়াংশ গভর্নরের সমর্থন লাভ করা প্রয়োজন। সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ায় সদস্য হওয়া কঠিন। বর্তমানে সদস্যদের মধ্যে ৬০০ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বহু পুঁজিপতি, দালাল ও কারবারী আছে। Wall Street-এর সভ্যপদ মর্যাদাপূর্ণ। তাই অর্থের জোর ও নানারূপ গুণ না থাকিলে সদস্য পদ লাভ করা যায় না। সদস্যদের ব্যবসায়ে (firm) অংশীদার হইয়া 'এলায়েড' মেম্বর হওয়া যায়। তবে তাহাদের বাজারে প্রবেশাধিকার থাকে না।

Wall Street এর কর্ম ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত ৪২ জন গভর্নর লইয়া গঠিত একটি গভর্নিং কমিটি আছে। এই কমিটিরা গভর্নর বা সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। লণ্ডন শেয়ার বাজারে যেমন দালাল এবং প্রত্যক্ষ কারবারী দুইটা বিভিন্ন রকমের সদস্য আছে, Wall Street এ সেইরূপ সদস্য নাই। একই সদস্য দালাল ও কারবারী—এই দুইভাবেই কাজ করিতে পারে। তবে একই লেনদেনে একাধারে দালাল ও কারবারী হইয়া মুনাফা ও দালালী দুইই পাইবার উপায় নাই। কোন লেনদেনে দালাল হইয়া এবং কোন লেনদেনে কারবারী হইয়া কাজ করিতে পারা যায়।

যে কোন সদস্য নিম্নলিখিত অর্থ বাজারকে দিতে বাধ্য—

- (ক) সূচনার দক্ষিণা (initiation fee) ৪০০০ ডলার
- (খ) গ্রাচুইটি ফাণ্ডের টাঁকা ১৫ ডলার
- (গ) মোট লেনদেনের মূল্যের শতকরা ১ ভাগ কমিশন এবং
- (ঘ) গভর্নরগণ কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক টাঁকা।

গভর্নর বোর্ডে কার্য কলাপের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

- (১) সদস্যদের বিরুদ্ধে নালিশের তদন্ত করা এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে শাস্তির ব্যবস্থা করা।

- (২) বাজারের অর্থ সংরক্ষণ করা
- (৩) বাজারের নিয়মকানুন তৈয়ারী করা ও রক্ষা করা।
- (৩) বাজারে বিভিন্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- এবং (৫) বাজারের সর্বোত্তম উন্নতির চেষ্টা করা।

ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যেক দিন ১০টা হইতে ৩টা পর্যন্ত বাজারে লেনদেন চলে। উহার আগে বা পরে লেনদেন করিলে সদস্যদের ৫০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। দালালরা নিজেদের হিসাবে কেনা বেচা করে না। কিন্তু কারবারীরা নিজেদের হিসাবে কেনা বেচা করে—তাই তাহাদিগকে Room Trader বলে।

Wall Street এর কেনা বেচার নিষ্পত্তি দ্বিতীয় দিবসে হয়। লগুনের মত এখানে ৫দিন বসিয়া নিষ্পত্তি হয় না। সাধারণত Wall Street-এ নগদ কারবারই বেশী। তবে ফটকা কারবারও চলে। Wall Street এর লেনদেনের বিভিন্ন রূপ শেয়ার বিলির ব্যবস্থা আছে, যেমন—Cash Delivery, Regular way Delivery, Regular way delayed Delivery ইত্যাদি। Wall Street-এ আমেরিকার শেয়ার এবং স্টকই বেশী ক্রয় বিক্রয় হয়। অত্রাণ্ড ঋণ-পত্রের লেনদেন উহার তুলনায় অনেক কম।

### কলিকাতা শেয়ার বাজার

কলিকাতা শেয়ার বাজার ১৯০৮ সালে প্রথম স্থাপিত হয় এবং ১৯২৩ সালে কোম্পানী আইন অনুযায়ী দায় সীমাবদ্ধ কোম্পানী রূপে রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং ইহার নাম হয় কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড।

ইহার মূলধন মোট ৩ লক্ষ টাকা। ১০০০ টাকা কারিয়া ৩০০টি শেয়ারে এই মূলধন বিভক্ত। কেহ সদস্য হইতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে একটি শেয়ার কিনিতে হইবে এবং ৫০০ টাকা ভত্তি ফি জমা দিতে হইবে। তবে কলিকাতা শেয়ার বাজারের সদস্য হওয়া খুবই কঠিন। যদিও একটি শেয়ারের নামিকমূল্য ১০০০ টাকা, বাজারে উহার মূল্য ৪০০০০ হইতে ৫০০০০ হাজার টাকার মধ্যে। গত মহাযুদ্ধের সময় একটি শেয়ারের মূল্য দুইলক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছিল। এই শেয়ার বাজারের পরিচালনা ভার ১৪ জন ডাইরেক্টর লইয়া গঠিত একটি কমিটির উপর গ্রস্ত। ডাইরেক্টরগণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হন।

শেয়ার বাজারের কেনা বেচা সদস্য অথবা তাহাদিগের প্রতিনিধি কর্তৃক



সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক সদস্য ৮ জনের অধিক কারণিক (প্রতিনিধি) নিয়োগ করিতে পারে না।

শেয়ার বাজারে কেনাবেচা নগদেই চলিয়া থাকে। লেনদেনের তারিখের পরের দিন অথবা তাহার পরের দিন নগদ টাকা লইয়া শেয়ার বিলি দেওয়ার নিয়ম। চুক্তির সর্ব পালন না করিলে ৭ দিন পরে দুইদিনের নোটিশে চুক্তি বাতিল অথবা প্রকাশ্য বাজারে শেয়ার বিক্রয় হইতে পারে। নিষ্পত্তির সময় কম হইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্রেতা বা বিক্রেতার নগদ মূল্য প্রদান বা শেয়ার বিলি না দিয়া নিষ্পত্তির তারিখে শেয়ারের যে মূল্য থাকে সেই মূল্য এবং পর্ববর্তী ক্রয় বিক্রয় কালের মূল্যের যে পার্থক্য হয় তাহা দিয়াই নিষ্পত্তি করে। তাই প্রকৃত কেনা বেচা না হইয়া শুধু মূল্যের পার্থক্য লাভের আশায়ই কেনা বেচার চুক্তি হইয়া থাকে। এইরূপ লেনদেন হয় বলিয়া কলিকাতা শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য খুব ওঠা নামা করে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক কলিকাতা শেয়ার বাজারের নিকাশ ঘরের (Clearing House) কাজ করে।

কমিটি অব ডাইবেক্টরস এর সদস্যের অর্ধেক প্রতি বৎসর পদত্যাগ করে। উহার পুনরায় নির্বাচিত হইবার জন্ম ভোটে দাড়াইতে পারে। এই কমিটি কয়েকটা সাব কমিটির সাহায্যে শেয়ার বাজারের কার্য পরিচালনা করে।

কলিকাতা শেয়ার বাজারের গৃহ লায়ন্স রেঞ্জ। এখানে সদস্যরা এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা ছাড়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। প্রতিনিধিরা তাহাদের মালিকের পক্ষে কেনা-বেচা করিতে পারে। প্রত্যেক সদস্যও প্রতিনিধিকে প্রতিমাসে ৪৮ টাকা করিয়া টাঙ্গা দিতে হয়। প্রত্যেক সদস্যই দালাল ও কারবারীরূপে কাজ করিতে পারে।

### বোম্বাই শেয়ার বাজার

কলিকাতা শেয়ার বাজারের মত বোম্বাই শেয়ার বাজার লিমিটেড কোম্পানীর আকারে গঠিত নহে। ইহার আইন ও নিয়মাবলী সদস্যরা গঠন করে এবং বোম্বাই সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়। ইহার সাংগঠনিক নাম 'ইণ্ডিয়ান শেয়ার এণ্ড স্টক ব্রোকারস এসোসিয়েশন'।

এই শেয়ার বাজারের মোট সদস্যসংখ্যা ৪৫১ জন। সদস্য হইতে হইলে প্রত্যেককে ১০,০০০ জমা রাখিতে হয়। তবে, কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে এই জামানত ফেরত পায়। ৪৫১ জন সদস্যের প্রত্যেকে আবার ৫ জন করিয়া

কারণিক নিযুক্ত করিতে পারে। এই কারণিকগণও শেয়ার বাজারে নিজ নিজ নিয়োগকর্তার ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করিতে পারে। সদস্য এবং কারণিকের মাথাপিছু ৬ টাকা করিয়া বাৎসরিক চাঁদা দিতে হয় এবং এই ৬ টাকার মধ্যে ১ টাকা দান এবং ৫ টাকা চাঁদা হিসাবে ধরা হয়।

এই শেয়ার বাজারে সদস্যরা (ও কারণিকরা) ছাড়া আর কেহই কেনা-বেচা করিতে পারে না। জনসাধারণের কেহ শেয়ার কেনা-বেচা করিলে কোন সদস্য এই লেনদেনে দালাল হিসাবে কাজ করে।

বোম্বাই শেয়ার বাজারের পরিচালনা ভার ১৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি 'গভর্নিং বোর্ডের' হাতে হস্ত। গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরা প্রতি বৎসর নির্বাচিত হয়। এই বোর্ডের একজন করিয়া সভাপতি, উপ-সভাপতি ও ট্রেজারার আছে। এই গভর্নিং বোর্ড ছাড়া কতগুলি সাব কমিটিও আছে। ইহারা মীমাংসা, বকেয়া পাওনা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করে। যদি কোন সদস্য তাহার দেনা ইত্যাদি পরিশোধ করিতে না পারে তবে তাহাকে সম্বর বার্কদার (defaulter) হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সদস্য-তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। আপেক্ষিকালে গভর্নিং বোর্ড শেয়ার বাজারের সমস্ত লেনদেন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা রাখে।

বোম্বাই শেয়ার বাজারে চুক্তির দায় নিষ্পত্তির (Settlement) জন্ত ১ মাস সময় দেওয়া হয়। যদি কেহ এক মাসের মধ্যে দায় নিষ্পত্তি করিতে (অর্থাৎ শেয়ারের বিলি বা মূল্য প্রদান করিতে) না পারে তবে কিছু দক্ষিণা দিয়া পরবর্তী নিষ্পত্তিদিবস পর্যন্ত টানিয়া লইতে পারে। এই বাজারে একটি নিকাশ-ঘর (Clearing House) আছে। নিষ্পত্তির দিন ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রকৃত মূল্য ও শেয়ার বিলির পরিবর্তে চুক্তির তারিখে ও নিষ্পত্তির দিবসে শেয়ারের মূল্যের তফাতটি (difference) একে অপরকে দিয়া দায় নিষ্পত্তি করিতে পারে।

একাধারে একমাস নিষ্পত্তির সময় এবং অল্পদিকে নিকাশ ঘরের অবস্থিতি, 'ফাটকা কারবারকে' (speculative business) খুব সাহায্য করে। ফলে বোম্বাই শেয়ার বাজারে প্রকৃত কেনা-বেচার পরিবর্তে ফাটকা কারবারের প্রাধান্য দেখা যায়। শেয়ার বিলির বা মূল্য প্রদানের উদ্দেশ্য নাই অথচ রোজই শেয়ার কেনা-বেচা চলিতেছে শুধু 'বাদলা' (difference) লাভের আশায়। অনেকে তাই, বোম্বাই শেয়ার বাজারকে জুয়ারীবাজার (Gambler's market) বলিয়া থাকেন।

## বিভিন্ন শেয়ারের বাজারের তুলনা

নিউইয়র্ক	লণ্ডন	বোম্বাই	কলিকাতা
১। সদস্য সংখ্যা ১৩৭৫	১। সদস্য সংখ্যা ৪০০০।	১। সদস্য সংখ্যা ৪৫১	১। সদস্য সংখ্যা ৩০০
২। দালান ও প্রত্যক্ষ কারবারীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নাই।	২। দালান ও প্রত্যক্ষ কারবারীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে।	২। দালান ও প্রত্যক্ষ কারবারীর মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই।	২। দালান ও প্রত্যক্ষ কারবারীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নাই।
৩। দায় নিষ্পত্তির মেয়াদ ২ দিন।	৩। দায় নিষ্পত্তির মেয়াদ ১৪ দিন।	৩। দায় নিষ্পত্তির মেয়াদ ১ মাস।	৩। দায় নিষ্পত্তির মেয়াদ ২ দিন।
৪। ফটকা কারবার সামান্ত চলে।	৪। ফটকা নাই বলিলেই চলে।	৪। ফটকাই ইহার বৈশিষ্ট্য।	৪। মূল্যের পার্থক্য প্রদান চলে বলিয়া ফটকা চলে।
৫। এখানে জনসাধারণের স্বার্থ, কলিকাতা ও বোম্বাইর মত ক্ষুদ্র ইহার সম্ভাবনা কম।	৫। এখানে দরদস্তুর ঠিক হইলে বাহিরের ক্রেতা বা বিক্রেতার নাম এবং ক্রয় বা বিক্রয়ের মূল্য প্রকাশ করিতে হয়। তাই তাহারা ভিতরের মূল্য জানিতে পারে।	৫। কলিকাতার মতই বাহিরের ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজারের কি মূল্য কেনা-বেচা হইল তাহা জানিতে পারেনা।	৫। কি মূল্য বাজারের শেয়ার কেনা-বেচা হইল তাহা বাহিরের ক্রেতা বা বিক্রেতা জানিতে পারেনা। তাই তাহাদের ক্ষতি হইতে পারে।
৬। ৪২ জন সদস্য লইয়া গঠিত গভর্নিং কমিটির হস্তে পরিচালন-ভার ন্যস্ত।	৬। ৯ জন স্থাপক সদস্য এবং ২৭ জন সাধারণ সদস্য লইয়া গঠিত কাউন্সিলের হাতে পরিচালন-ভার ন্যস্ত।	৬। ১৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি গভর্নিং বোর্ডের হস্তে পরিচালন-ভার ন্যস্ত।	৬। পরিচালনাভার ১৬ জন ডাইরেক্টরের হাতে ন্যস্ত।

## প্রত্যক্ষ কারবারী ও দালালের তুলনা

প্রত্যক্ষ কারবারী  
( Jobber )

দালাল  
( Broker )

১। প্রত্যক্ষ কারবারী নিজেই মালিক হইয়া কেনা-বেচা করে।

২। প্রত্যক্ষ কারবারী জনসাধারণের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারে না।

৩। প্রত্যক্ষ কারবারী দালালকে বিক্রীত শেয়াব বিলি দেয়। এবং দালালের নিকট হইতে ক্রীত শেয়ার গ্রহণ করে।

৪। লণ্ডন বাজারে প্রত্যক্ষ কারবারীরা বিশেষ বিশেষ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে।

৫। প্রত্যক্ষ কারবারীরা সর্বদা ক্রয় ও বিক্রয়ের পার্থক্য লাভ পায় বা লোকসান দেয়।

বিঃ দ্রঃ—লণ্ডন বাজারেই শুধু প্রত্যক্ষ কারবারী ও দালালের শ্রেণীবিভাগ আছে। অতীত, সমস্তরা দালাল বা প্রত্যক্ষ কারবারী হিসাবে কাজ করিতে পারে।

লণ্ডন বাজারে প্রত্যক্ষ কারবারীরা সর্বদা শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। উহারা তাই যে-দরে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও যে-দরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক—উভয় দরই উল্লেখ করে। যদি কোন প্রত্যক্ষ কারবারী কোন শেয়ারের দর £118½ - 1½ আনায় তবে বুঝিতে হইবে যে সে £118—2s

১। দালাল প্রত্যক্ষ কারবারী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়।

২। দালাল প্রত্যক্ষ কারবারী ও জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ করিতে পারে এবং উভয়ের মধ্যে লেনদেনের ঘটকালী করে।

৩। দালাল ক্রীত শেয়ার প্রত্যক্ষ কারবারীর নিকট হইতে লইয়া জনসাধারণ-ক্রেতাকে (public buyers) বিলি দেয় এবং বিক্রীত শেয়াব জনসাধারণ-বিক্রেতার (public seller) নিকট হইতে লইয়া প্রত্যক্ষ কারবারীকে বিলি দেয়।

৪। লণ্ডনেব দালালরা সব শেয়ার কেনা-বেচায়ই অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

৫। দালালদের মূল্য শুধু নির্দিষ্ট হারে শেয়ারের নামিক মূল্যের উপর নির্ধারিত দস্তুরী।

দরে ক্রয় করিতে এবং £118—6s দরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। দালাল এই দর মানিলে প্রত্যক্ষ কারবারী লেনদেনের চুক্তি করে। লগুনে যদিও প্রত্যক্ষ কারবারী সর্বদা শেয়ার বেচা কেনা করিতে প্রস্তুত, তথাপি সে নিজ অর্থ-শক্তির বাহিবে কিনিতে পারে না অথবা যে শেয়ার তাহার আছে (বা সংগ্রহ করিতে পারিবে) তাহার অতিরিক্ত বিক্রয়ও করিতে পারে না।

### শেয়ার বাজারের বিভিন্নরূপ ফাটকাবাজ

#### ( Different types of Speculators in Stock Exchange )

ফাটকাবাজের কার্যকলাপ আমরা অনেক সময়ই গর্হিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই ধারণা সর্বদা সত্য নহে। ফাটকাবাজীরা যদি সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাষ করে তবে তাহারা দেশের বহু উপকার করিতে পারে। বুদ্ধিমান ফাটকাবাজ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আভাস নানারূপ তথ্যের মধ্য হইতে অনেক পূর্বেই পায় এবং এই পরিবর্তনের কি ফলাফল বাজারের উপর হইবে তাহাও নিজ বিচারবুদ্ধি দিয়া অনেক আগেই বুঝিতে পারে। তাই এই রূপ ফাটকাবাজরা মোটামুটিভাবে দেশের হঠাৎ পরিবর্তন আগেই বুঝিতে পারে বলিয়া শেয়ার বাজারের কেনাবেচাও আগেই আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে, বাজারের হঠাৎ পতন হইবার বা চড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায় ভাল ফাটকাবাজদের কার্যকলাপের ফলে বাজারদর খুব বেশী ওঠানামা করিতে পারে না। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর। আবার, যে ফাটকাবাজরা শুধু আন্দাজের উপর ভবিষ্যৎ কেনাবেচা করিয়া থাকে তাহাদের কার্যকলাপের ফলে বাজারদর স্বাভাবিক হইতেও বেশী ওঠানামা করে।

সাধারণত ফাটকাবাজের তিনটি শ্রেণী আছে, যথা—

- (১) তেজীওয়াল ( Bull )
- (২) মন্দীওয়াল ( Bear )
- (৩) অনিয়মিত ব্যবসায়ী ( Stag )

১। তেজীওয়াল ( Bull )—তেজীওয়াল ফাটকাবাজ ভবিষ্যতে শেয়ারের দর উঠিবে এই ধারণায় শেয়ার ক্রয় করে। তাহার উদ্দেশ্য শেয়ার কিনিয়া রাখা নহে। সে শুধু এমন একটি ক্রয়চুক্তি করে যাহাতে শেয়ার বিলির দিবস কিছুদিন পরে উল্লেখ থাকে এবং এই বিলির দিবসের পূর্বে কোন দিন শেয়ারের মূল্য বাড়িলে ঐ শেয়ার বিক্রি করিয়া দেয়। ইহাতে ক্রয়মূল্য এবং

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যটি সে মুনাফারূপে লইয়া উভয় চুক্তি নিষ্পত্তি করে। তেজীওয়ালার তাই প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন নাই। যদি শেয়ার বিলি দিবসের মধ্যে শেয়ারের মূল্য না বাড়িয়া কমিতে থাকে, তাহা হইলে বিলি-দিবসে ক্রয়মূল্য এবং বিলিদিবসের মূল্যের পার্থক্যটি লোকসান দিয়া তেজীওয়ালাকে নিষ্পত্তি করিতে হয়। তবে সে যদি বিবেচনা করে যে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য আবার বাড়িবে, তবে সে কিছু দক্ষিণা দিয়া উহার নিষ্পত্তি পরবর্তী নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত টানিয়া দিতে পারে। তেজীওয়ালার মূলধন শুধু ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য ও দক্ষিণা ইত্যাদি দেওয়ার মত থাকিলেই চলে; কারণ সে কখনই সম্পূর্ণ অর্থ দিয়া শেয়ারের বিলি লয় না। তেজীওয়ালার অনেক সময় কিছু ক্রয় করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দর চড়াইয়া পরে নিজ শেয়ার বিক্রয় করে।

২। **মন্দীওয়ালার (Bear) :**—মন্দীওয়ালার শেয়ারের দর নামিবে এই ধারণায় শেয়ার ভবিষ্যতে বিলি দেওয়ার ভিত্তিতে বিক্রয় করে। বিলি দেওয়ার তারিখে যদি শেয়ারের দর বিক্রয়মূল্য হইতে কমে, তবে ঐ কম মূল্যে শেয়ারগুলি আবার কিনিয়া লয়। ইহাতে তাহার বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের পার্থক্যটি লাভ হয়। মন্দীওয়ালারও (তেজীওয়ালার মত) বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। যদি বিলির তারিখে শেয়ারের দর বিক্রয়মূল্য হইতে বেশী থাকে তবে তাহাকে লোকসান দিতে হয়। আবার, ঐ বিলির তারিখ সে পরবর্তী নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত টানিয়া লইতেও পারে—যদি সে মনে করে যে ভবিষ্যতে দর কমিবে; তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। মন্দীওয়ালার আবার নিজে একজাতীয় কিছু শেয়ার বিক্রয় করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দর কমাইয়া পরে সেই দরে কিনিতে আরম্ভ করে।

৩। **অনিয়মিত ব্যবসায়ী (Stag) :**—এই ধরনের ব্যবসায়ীরা কোন নূতন কোম্পানীর ‘প্রসপেক্টাস’ বাহির হইলেই শেয়ার কিনিবার আবেদন করে। এই শেয়ারের বাজার নিজেদের কেনার জগুই চড়িয়া যায়, এবং পরে ঐ শেয়ার বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ করে।

তবে অনিয়মিত ব্যবসায়ীর ঝুঁকি খুব বেশী, কারণ শেয়ার বণ্টন হইবার পরে যদি দেখা যায় যে, জনসাধারণের এই শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছা তেমন নাই তবে অনিয়মিত ব্যবসায়ীকে প্রচুর লোকসান দিয়া বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতে হয়। তেজীওয়ালার বা মন্দীওয়ালার মত অনিয়মিত

ব্যবসায়ীর নগদ অর্থ দিয়া শেয়ার ক্রয় করার ইচ্ছা থাকে না, শুধু দর বাড়াইয়া ক্রীত শেয়ার বিক্রয় করিয়া মুনাফা করাই তাহার উদ্দেশ্য।

ফাটকাবাজার গড়মূল্য হিসাব করিয়া কিভাবে তাহাদের মূল্যকা সর্বোচ্চে দাঁড় করায় তাহা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মনে কর একজন তেজীওয়াল ৪ টাকা দরে ১০০ শেয়ার ক্রয় করে। কিন্তু তাহার শেয়ারের দর না বাড়িয়া বাজারে উহার দর কমিতে থাকে। প্রত্যেক কম দরে যদি আরও কিছু কিছু শেয়ার ক্রয় করা হয় তবে গড়ে ঐ শেয়ারের মূল্য তাহার কাছে কমিতে থাকিবে (ভবিষ্যতে দর বাড়িবে এই আশা থাকিলেই সে আরও ক্রয় করিবে, নতুবা নহে)। মনে কর ঐ শেয়ারের দর ৪ টাকা হইতে টা ৩.৫০ নয়া, টা ৩.২৫ নয়া এবং ৩.০০ টাকা পর্যন্ত নামিল এবং তেজীওয়াল প্রত্যেক দরে আরও ১০০ করিয়া শেয়ার কিনিল। ইহাতে তাহার গড়পড়তা খরচ হইল শেয়ার প্রতি প্রায় টা. ৩.৪৪ নয়া পয়সা। এখন যদি শেয়ারের মূল্য ৪ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা পর্যন্ত বাড়িয়া যায় তবে তেজীওয়ালার প্রচুর লাভ হইবে। সে যদি পরের ৩০০ শেয়ার না কিনিত তবে এত লাভ হইত না। পরের কেনার আরও একটু সুবিধা আছে যে, এই কেনার ফলে বাজারদর কমি বন্ধ হইয়া বাড়িতে আরম্ভ হয়। অত্যাশ্চর্য ফাটকাবাজারও অনুরূপভাবে লাভ বাড়াইবার চেষ্টা করে—তেজীওয়াল যেমন পর পর ক্রমবৃদ্ধিমান মূল্যে ক্রয় করিয়া গড়পড়তা খরচ কমাইয়া লয়, মন্দীওয়াল আবার ক্রমবর্ধমান হারে বিক্রয় করিয়া গড়পড়তা বিক্রয়মূল্য বাড়াইয়া লয় এবং পরে বাজার বাস্তবিক কমিলে ক্রয় করে এবং প্রচুর পার্থক্য লাভ রূপে পায়।

### শেয়ার বাজারে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দ

১। 'কন্ট্যাঙ্গো' (Contango)—যখন ক্রেতা নিজের ইচ্ছায় নিষ্পত্তি (Settlement) পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেয় তখন বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা আদায় করে। এই দক্ষিণাকে 'কন্ট্যাঙ্গো' বা ক্রেতাদত্ত ব্যাজ বলে।

২। 'ব্যাকওয়ার্ডেশন' (Backwardation)—যখন বিক্রেতা নিজের সুবিধার জন্য নিষ্পত্তি পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া লয় তখন ক্রেতা তাহার নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা আদায় করে। এই দক্ষিণাকে 'ব্যাকওয়ার্ডেশন' বা বিক্রেতাদত্ত ব্যাজ বলে।

৩। **Ex-Div.**—(লভ্যাংশ বাদে)—কোন শেয়ারের দরের সহিত **Ex-Div.**, **Ex-Dividend** অথবা **X.D.** এই শব্দগুলি যুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ শেয়ারের উপর পরবর্তী লভ্যাংশ ক্রেতা পাইবে না, পাইবে বিক্রেতা। মনে কর কোন শেয়ারের লভ্যাংশ বৎসরে দুইবার দেওয়া হয়—১লা জুলাই ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখে। ঐ শেয়ার (মনে কর) অক্টোবর মাসে বিক্রয় হইল। তাহা হইলে ৩১শে ডিসেম্বরের লভ্যাংশ পাইবে বিক্রেতা।

৪। **Cum-Div.**—(লভ্যাংশ সমেত)—শেয়ারের দরের সহিত যদি **Cum-Div.** অথবা **Cum-Dividend** অথবা **C. D.** কথাগুলি থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ শেয়ারের পরবর্তী লভ্যাংশ ক্রেতা পাইবে। যে শেয়ারের লভ্যাংশ ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জুলাই তারিখে দেওয়া হয় তাহা যদি (মনে কর) অক্টোবর মাসে বিক্রয় হয় তবে ৩১শে ডিসেম্বর মাসের লভ্যাংশ ক্রেতাই পাইবে।

৫। **C. T.**—অনেক সময় দেখা যায় যে একপক্ষ, অপরপক্ষের নিকট হইতে একপ্রকার শেয়ারের পরিবর্তে অল্প শেয়ার গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এই দুই প্রকার শেয়ারের মূল্যের পার্থক্য একে অগ্ৰকে প্রদান করে। এইরূপ লেনদেনকে **Cross Transaction** বা সংক্ষেপে **C. T.** অর্থাৎ বিনিময় বলা হইয়া থাকে।

৬। **Cum-right**—যখন বিক্রেতা শেয়ার বিক্রয় করে তখন এই বিক্রয়ের মূল্যই সে আরও কিছু শেয়ার ক্রেতাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে সে **Cum right** কথাটি ব্যবহার করে। ইহার অর্থ এই যে, ক্রেতা ইচ্ছা করিলে সে এই মূল্যই আরও কিছু শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি শেয়ারের মূল্য পরে বৃদ্ধি পায় তবে ক্রেতা কমমূল্যে শেয়ার ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে।

৭। **Ex-right**—বিক্রেতা যখন বিক্রয়মূল্যে আর শেয়ার বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে না, তখন সে **Ex-right** কথাটি ব্যবহার করে। ইহার অর্থ এই যে, পরে ক্রেতা আর শেয়ার এই মূল্যে কিনিতে পারিবে না।

৮। **Opening**—কোনদিন যে দরে বাজার শুরু হয়, অর্থাৎ বাজারের কেনাবেচা শুরু হওয়ার সময় যে দর থাকে, তাহাকে **Opening** বা আরম্ভিক দর বলে।

৯। **Closing**—কোনদিন বাজার বন্ধ হওয়ার সময় কোন শেয়ারের যে দর থাকে তাহাকে **Closing** বা সমাপ্তি দর বলে।



১০। **Ready** :—শেয়ারের দর উল্লেখের সময় যদি ready কথাটি যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ শেয়ার ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতাকে বিলি (delivery) দেওয়া হইবে।

১১। **Small Lots (S. L.)** :—অনেক শেয়ারবাজারেই (যেমন কলিকাতায় আছে) কোন শেয়ার সাধারণত কত সংখ্যক একসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় হইবে তাহার একটা প্রচলিত নিয়ম থাকে। যদি কেহ এই সংখ্যা হইতে কম (অর্থাৎ ইহার অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ বা এক-দশমাংশ....ইত্যাদি) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তবে Small lots বা S. L. অর্থাৎ ‘ছোটলপ্ত’ কথাটি ব্যবহার করে। মনে করা যাউক, শতকরা ১০০ টাকা প্রদত্ত (fully paid) শেয়ার সাধারণত ৫০ খানার লপ্তে বিক্রয়ের নিয়ম। কেহ যদি ২৫ খানা অথবা ১০ খানা শেয়ার বিক্রয় করে তবে Small lots কথাটি ব্যবহার করিবে। (ছোট লপ্তের অর্থাৎ Small lots-এর শেয়ারের সংখ্যাকে কোন পূর্ণ সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে সাধারণ লপ্তের সংখ্যাটি পাওয়া যায়।)

১২। **Small odd lots (S. O. L.)** :—ছোট লপ্তে (অর্থাৎ Small lot-এ) যে সংখ্যক শেয়ার থাকে তাহাকে কোন পূর্ণসংখ্যা দিয়া গুণ করিলে যদি সাধারণ লপ্তের শেয়ার-সংখ্যা না পাওয়া যায়, তবে এইরূপ লপ্তকে বেজোড় ছোট লপ্ত বা Small odd lot বলে। সাধারণ লপ্তে যদি ৫০ খানা শেয়ার থাকে এবং কোন লপ্তে যদি ২ খানা অথবা ১৭ খানা.... ইত্যাদি শেয়ার থাকে তবে এই লপ্তকে বেজোড় ছোট লপ্ত বলে।

### কলিকাতা শেয়ার বাজারের নিয়মানুসারে

সাধারণত নিম্নলিখিত লপ্তে শেয়ার বিক্রয় হয় :—

১। যে শেয়ারের ২৫ টাকা প্রদত্ত (Paid up), উহা ১০০ খানা শেয়ারের লপ্তে বিক্রয় হয়।

২। যে শেয়ারের ২৫ টাকার অধিক এবং ৫০ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত, উহা ৫০ খানা শেয়ারের লপ্তে বিক্রয় হয়।

৩। যে শেয়ারের ৫০ টাকার উর্ধ্বে এবং ৫০০ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত, উহা ২৫ খানা শেয়ারের লপ্তে বিক্রয় হয়।

৪। যে শেয়ারের ৫০০ টাকার অধিক প্রদত্ত উহা ৫ খানার লপ্তে বিক্রয় হয়।

৫। শেয়ারে নামিক মূল্য ১০০ টাকা, কিন্তু উহার মধ্যে ৫০ টাকার কম প্রদত্ত উহা ২৫ খানার লগ্নে বিক্রয় হয়।

৬। গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি এবং ডিবেঞ্চারের প্রতি লগ্নে মোট ২৫০০০ টাকা নামিক মূল্য হইতে হইবে।

### শেয়ারের তালিকাভুক্তি

( Listing of Shares )

যে-কোন শেয়ারই শেয়ারবাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে না। শেয়ার-বাজারের তালিকাভুক্ত না হইলে কোন শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে না।

তালিকাভুক্তির জন্ত শেয়ারবাজারের কোন সদস্য নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করিবে। ইহাতে কতগুলি দলিল, যথা—যে কোম্পানীর শেয়ার তালিকাভুক্ত করিতে হইবে উহার ‘মেমোরান্ডাম’, আর্টিকেলস, প্রসপেক্টাস, ব্যালান্সসীট ( গত ৫ বৎসরের ), গত দশ বৎসরের লভ্যাংশ বিলির হিসাব, ম্যানেজিং এজেন্ট ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি এবং ঐ কোম্পানীর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দাখিল করিতে হয়। এই আবেদনপত্র বিভিন্ন কমিটি বিবেচনা করিয়া গ্রহণযোগ্য মনে করিলে ঐ শেয়ার তালিকাভুক্ত হয়।

শেয়ার তালিকাভুক্ত হইলে—উহা বেশী কেনাবেচা হইবে; উহা বিভিন্ন লোকের হাতে ছড়াইয়া পড়িলে কোম্পানীর কার্যে বিভিন্ন লোকের আগ্রহ দেখা দিবে; তালিকাভুক্তির জন্ত জনসাধারণের এই কোম্পানীর উপর আস্থা বাড়িবে; তালিকাভুক্তির জন্ত এই শেয়ার যখন-তখন বাজারে বিক্রয় করা যায় বলিয়া ইহা ক্রয় করায় জনসাধারণের বিশেষ আপত্তি থাকে না। ইত্যাদি সুবিধাগুলি পাওয়া যায় বলিয়া শেয়ার তালিকাভুক্তির আগ্রহ প্রায় সব কোম্পানীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

### ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্রটি

ফাটকা লেনদেনের জন্ত ভারতীয় শেয়ার বাজারের দুর্নাম আছে। এই বাজারগুলির সংবিধান ও নিয়মাবলীরও অনেক ক্রটি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মাবলী ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় না বলিয়াও বাজারের লেনদেনের গুঁহু পরিচালনা দেখা যায় না। ১৯৪৬ সালে শিল্পসংস্থার শোয়ারের বাজারদরের সূচক- ( Index ) সংখ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনুরূপ

সূচক সংখ্যা হইতে অনেক বেশী। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, বাধাহীন ভাবে ফাটকা ব্যবসা ভারতীয় শেয়ারবাজারে শেয়ারের দরকে খুব ওঠা-নামা করায়। ভারতীয় শেয়ারবাজারের ক্রটিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হইল :—

(ক) লেনদেনের নিষ্পত্তির তারিখ পিছাইয়া লওয়ার রীতি ফটকা লেনদেনকে সাহায্য করে।

(খ) নিষ্পত্তির তারিখে শুধু মূল্যের পার্থক্য দিয়া নিষ্পত্তির করার রীতি অপ্রকৃত লেনদেনকে বাড়াইয়া দেয়।

(গ) লম্বা নিষ্পত্তির সময়ও ফাটকা ব্যবসায়কে সাহায্য করে।

(ঘ) Blank Transfer রীতি ব্যাংক ইত্যাদি হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দিলেও ধরা পড়ে না।

(ঙ) নিয়মাবলী অধিকক্ষেত্রেই অমান্য করিতে দেখা যায়।

(চ) শেয়ারবাজারের বাহিরে অবস্থিত ফাটকাবাজার কতকগুলি লেনদেন করে। এই লেনদেনকে ‘কাটনি’ Katni লেনদেন বলে। ইহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

(ছ) জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের কোনই ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই নাই।

(জ) কোম্পানীর ডাইরেক্টরেরা অনেক সময় শেয়ারবাজারের দালালদের সঙ্গে জোট করিয়া শেয়ারের দর ওঠা-নামা করায়। এইরূপ ওঠা-নামায় তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই থাকে, কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

উপরিউক্ত ক্রটিগুলি বর্তমান থাকায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে ক্রটি ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই এই শেয়ার বাজারগুলির কতগুলি দোষত্রুটি আইন দ্বারা বন্ধ করার কথা জনসাধারণ ও সরকারের মনে ওঠে। ফরাসী, জার্মানী, জাপান ও আমেরিকার মত ভারত সরকারও শেয়ার বাজারগুলিকে আইনদ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার প্রয়াসে Dr. P. J. Thomas রিপোর্ট বিবেচনা করেন। ইহার পরে Sri A. D. Gorwala-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়া উহার রিপোর্টও বিবেচনা করেন। অন্তঃপর ১৯৫৬ সালে Securities Contract (Regulation) Act, পাশ হয়। এই আইনের মূল ধারাগুলির বিষয়বস্তু পরপৃষ্ঠায় আলোচনা করা গেল—

**Security Contracts (Regulation) Act, 1956-এর মূল ধারাগুলির  
বিষয় বস্তু :—**

- ১। ভারত সরকার শেয়ার বাজারগুলিকে আইনের স্বীকৃতি দিতে পারিবে, অথবা স্বীকৃতি বাতিল করিতে পারিবে।
- ২। ভারত সরকার শেয়ার বাজারকে কোন বিধি তৈয়ারী করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।
- ৩। স্বীকৃত শেয়ার বাজারের উপবিধি তৈয়ারী করিবার অধিকার থাকিবে। এবং ভারত সরকারেরও শেয়ারবাজারের জ্ঞাত উপবিধি তৈয়ার অথবা উহা সংশোধন করিবার অধিকার থাকিবে।
- ৪। ভারত সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে।
- ৫। শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।
- ৬। তেজী-মন্দী চুক্তি নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।
- ৭। আইন অমান্তে জরিমানা ও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে।

কোন শেয়ার বাজারের নিয়মাবলী ব্যবসা ও জনসাধারণের স্বার্থ-বিরুদ্ধ হইলে, অথবা উহা বে-আইনী হইলে ভারত সরকার ঐ শেয়ার বাজারকে আইনের স্বীকৃতি দিবে না।

প্রত্যেক স্বীকৃত শেয়ারবাজারকে নির্দিষ্ট সময় অন্তে হিসাবনিকাশ ভারত সরকারের অফিসে পেশ করিতে হইবে।

জনস্বার্থে প্রত্যেক শেয়ারবাজার ও উহার প্রত্যেক সদস্যকে অনুধ্বংস ৫ বৎসরের হিলাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ভারত সরকার শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীর অথবা শেয়ার-বাজারের কোন সদস্যের কোন ব্যাপারে অস্থগতকার্য চালাইতে পারে।

শেয়ার বাজারের উপবিধিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ধারাগুলি থাকিতে হইবে :—

- ক) Blank Transfer নিয়মবদ্ধ করা বা নিষিদ্ধ করা।
- খ) যে শেয়ারের নিষ্পত্তি বিলি দিয়া ও অর্থ প্রদান করিয়া হইবে তাহাদের নাম উল্লেখ করা এবং যে শেয়ারের নিষ্পত্তি মূল্যের পার্থক্য দিয়া হইতে পারিবে তাহাদের নাম উল্লেখ করা।
- গ) নিষ্পত্তি পিছাইয়া লওয়ার সুবিধা নিয়মবদ্ধ করা অথবা নিষিদ্ধ করা।
- ঘ) দালালীর হার নির্ধারণ করা এবং সদস্যদের নিজের নামে কেনা-বেচার নিয়ম করা.....ইত্যাদি।

কোন সদস্য অন্য কোন সদস্য ছাড়া আর কাহারও সহিত কোন চুক্তিতে মালিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোন সদস্য মালিক হিসাবে অপর ব্যক্তির সম্মতিক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহার প্রতিটি নোটে সে যে মালিক হিসাবে কাজ করিতেছে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে।

আইনগতভাবে স্বীকৃত শেয়ার বাজার ভিন্ন অন্য কোন শেয়ার বাজার সংগঠন নিষিদ্ধ হইবে।

শেয়ার বাজারে যাবতীয় option ( তেজী-মন্দী ) বে-আইনী হইবে।

শেয়ার বাজারের পবিচালকমণ্ডলীতে ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি থাকিবে। প্রয়োজনবোধে সরকার যে-কোন শেয়ার বাজার নিজহস্তে তুলিয়া লইতে পারিবে।

ভারত সরকার কোন কোম্পানীর শেয়ারকে শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে। এইরূপ তালিকাভুক্তি যদি জনসাধারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষা করে তবেই ভারত সরকার এই নির্দেশ দিবে।

শেয়ার বাজারের উন্নতির জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত Stock Exchange Commission নামে একটি সংস্থা গঠন করা হইবে।

### সংবাদপত্রে শেয়ারের দর

সংবাদপত্রে শেয়ারের দর প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে লেখা থাকে উহা সকলের বোধগম্য হয় না। তাই উহার দুই-একটি নমুনার আলোচনা করা কর্তব্য।

#### (ক) গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি

১। 3½P.C. (1980)—73/35, 74/10, 74/56 S.L.S.

ইহার অর্থ এই যে, ৩½% হারের ভারত সরকারের ঋণপত্র ( যাহা ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে পরিশোধ হইবে ) তাহার বাজার দর গতকল্য ছিল—প্রারম্ভিক দর ৭৩ টাকা ৩৫ নঃ পঃ, সমাপ্তিদর ৭৪ টাকা ১০ নঃ পঃ এবং ছোটলপ্তে ৭৪ টাকা ৫৬ নঃ পয়সায় বিক্রয় হইয়াছিল।

২। 3% (1970-75)—(91'50, 91'87 S.L.S.), 91'25

শতকরা ৩ টাকা হার সুদের ভারত সরকারের ঋণপত্রের ( যাহার পরিশোধ হইবে ১৯৭০ হইতে ১৯৭৫ এর মধ্যে ) বাজার দর গতকল্য ছিল—

প্রারম্ভিক ২১'৫০ নঃ পঃ, ছোটলপ্তে বিক্রয় হয় ২১'৮৭ নঃ পরসী দরে এবং সমাপ্তি দর ছিল ২১ টা ২৫ নঃ পঃ।

৩। 4½% (1995)—99'25

শতকরা ৪½ টাকা হাব স্বদের ভারত সরকারের ঋণপত্রের (যাহার পরিশোধ তারিখ ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ) গতকল্য বাজাব দব ছিল ৯৯ টাকা ২৫ নঃ পঃ।

(খ) কোম্পানীর শেয়ার

১। Dalmia (Bharat) Defd.—2/43, 2/57 X.D.

ডালমিয়া (ভারত) সিমেন্ট কোম্পানীর ডেফার্ড শেয়ারের লভ্যাংশ ছাড়া (X. D.) দর গতকল্য ছিল—আবন্তিক ২ টা. ৪৩ নঃ পঃ এবং সমাপ্তি ২ টা. ৫৭ নঃ পঃ

২। Equitable (Pref.) 86 cum. Div.

Equitable Coal কোম্পানীর Preference Shares এর লভ্যাংশ সমেত দর গতকল্য ছিল ৮৬ টাকা।

৩। Howrah. (OP.) 20/50, 20/65, 20/46, S.O L, (CLO.) 20/56.

হাওড়া জুটমিলের শেয়ারের আবন্তিক দব ছিল ২০ টা. ৫০ নঃ পঃ। ইহা গতকল্য ২০ টা. ৬৫ নঃ পঃ দবেও বিক্রয় হইয়াছে। ছোট বেজোড় লপ্তে (S.O.L.) ২০ টা ৪৬ নঃ পঃ দরে বিক্রয় হয়। সমাপ্তি দর ছিল ২০ টা. ৫৬ নঃ পঃ।

৪। Indian Copper (OP.) 5/82, 5/85, 5/90, 5/89 (CLO.) 5/85.

ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের শেয়ারের আবন্তিক দর ছিল ৫ টা. ৮২ নঃ পঃ। সমস্ত দিনে উহা ৫ টা. ৮৫ নঃ পঃ, ৫ টা. ৯০ নঃ পঃ এবং ৫ টা. ৮৯ নঃ পঃ দরেও বিক্রয় হইয়াছে। সমাপ্তি দর ছিল ৫ টা ৮৫ নঃ পঃ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক শেয়ারবাজারে দর খুব বেশী ওঠানামা করে। তবে প্রত্যেক শেয়ারবাজারেই কিছু-না-কিছু দর ওঠানামা করিবেই। তাই কি কি কারণে শেয়ারবাজারের দর ওঠানামা করে তাহা উল্লেখ করিয়া শেয়ার বাজারের আলোচনা শেষ করিব।

প্রথমত, মুঁকিদার ফাটকা কারবারীদের বেহিসাবী কার্যকলাপের জন্য শেয়ার বাজারের দর খুব বেশী ওঠা-নামা করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কের স্বদের হারের সহিত শেয়ারের দরের সম্পর্ক আছে। যেমন, ব্যাঙ্কের স্বদের হার বেশী হইলে বেশী ধার পাওয়া যায় না, তাই শেয়ারে বিনিয়োগ কমে, ফলে শেয়ারের দর কমে। ব্যাঙ্কের স্বদের হার কমিলে আবার শেয়ারের দর বাড়ে।

তৃতীয়ত, কোম্পানীর অবস্থার উপর উহার শেয়ারের দর নির্ভর করে। যে কোম্পানীর জ্ঞানাম (goodwill) বেশী অথবা যে কোম্পানীর ব্যবসা উন্নতির দিকে (সে যে কারণেই হউক) চলে সেই কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা বাড়ে এবং তাই উহার দরও বাড়ে। আবার, কোম্পানীর জ্ঞানাম নষ্ট হইলে অথবা ব্যবসা অল্প কারণে মন্দার দিকে গেলে উহার শেয়ারের চাহিদা কমে এবং উহার দরও কমে।

চতুর্থত, ব্যাঙ্ক, বীম-সংস্থা ইত্যাদি বর্ধিত হারে শেয়ার ক্রয় করিতে থাকিলে শেয়ারের দর বাড়ে। বীমা সংস্থা বা ব্যাঙ্ক তাহাদের ফাণ্ডের টাকা শেয়ারে বিনিয়োগ করে। তাই তাহাদের ফাণ্ড বাড়িলে শেয়ারের চাহিদা বাড়ে এবং উহার দরও বাড়ে।

পঞ্চমত, বাজারের সাধারণ অবস্থা শেয়ারের দরের উপর প্রতিফলিত হয়। বাজার গরমের দিকে (towards boom) গেলে শেয়ারের বাজারও গরমের দিকে যায়। আবার বাজার মন্দার দিকে গেলে শেয়ারবাজারও মন্দার দিকে চলে।

ষষ্ঠত, সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ অথবা সরকারের উপর আস্থা নষ্ট হইলে ঐ ঋণপত্রের চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে। তাই উহার দরও কমিয়া যায়।

সপ্তমত, বহির্বাণিজ্যে যদি প্রতিকূল অবস্থা দাড়ায় তবে বৈদেশিক ঋণ শোধ করিবার জন্য শেয়ার ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় করা হয়। ইহাতে শেয়ারের যোগান বাড়ে। তাই উহার দর কমে।

অষ্টমত, যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বাজারে সর্বপ্রকার চাহিদা বাড়ে; তাই সাধারণ বাজারের মূল্যস্তর উঠিতে থাকে। এইরূপ দরের উর্ধ্বগতি শেয়ারের দরের উপরও প্রতিফলিত হয়। মুদ্রাস্ফীতির জন্য সাধারণ বাজার চড়িলেও উহা শেয়ারের দরের উপর প্রতিফলিত হয়।

নবমত, বাজারে ঋণের যোগান বাড়িলে ঐ ঋণলব্ধ অর্থ শেয়ারে বিনিয়োগ হইতে থাকে; কারণ শেয়ারবাজারের মাধ্যমে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়। তাই এই অবস্থায় শেয়ারের দর বাড়ে।

দশমত, সরকারের কর-নীতির জন্তও শেয়ারবাজারের দর ওঠা-নামা করে।

শেষত, কোন বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারের দর এক বাজারে বাড়িলে অমূরূপ শেয়ারের দর অন্য বাজারেও বাড়িতে দেখা যায়। ইহাকে সহানুভূতি সূচক গতি (Sympathetic movement of Price) বলা যায়।

উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও সরকারের শিল্পনীতি Underwriter এর কার্যকলাপ জাতীয়করণ, আইন প্রণয়ন, কোম্পানীর একত্রীকরণ, পরিচালকের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণের জন্তও শেয়ারের দর উঠা-নামা করে।

### • কাঁচামালের বাজার (Produce Exchange)

শেয়ার ইত্যাদি কেনা-বেচার যেমন বাজার থাকে, পণ্য কেনা-বেচারও তেমনি বাজার আছে। কিন্তু পণ্য বলিতে কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য—এই তিনটিই বুঝায়। সুতরাং পণ্যেব বাজার বলিতে গেলে এমন বাজার বুঝায়, যে-বাজারে ঐ তিনটি দ্রব্যেরই ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। কাঁচামালের বাজারে কিন্তু শুধু কৃষিজাত দ্রব্যই কেনা-বেচা হয়। তাই কাঁচামালের বাজার পণ্যের বাজারের একটি অংশমাত্র। কাঁচামালের বাজারে পাট, তুলা, গম, চাউল, ভূট্টা, তৈলবীজ ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য পাইকারী হারের অথবা নিলামে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

কাঁচামালের বাজার ও শেয়ার বাজারের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

প্রথমত, শেয়ার বাজারে শেয়ার, ভিবেঞ্চার, স্টক ইত্যাদি কেনা-বেচা হয়, কিন্তু কাঁচামালের বাজারে পাট, তুলা, খাতিশস্ত, তৈলবীজ পানীয় শস্ত, ইত্যাদি কেনা-বেচা হয়।

দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারে শুধু যে-কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হইবে এবং যে-শ্রেণীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিলেই চলে। শেয়ারের নমুনা বা উহার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কাঁচামালের বাজারে কিন্তু কাঁচামালের উপস্থিতির প্রয়োজন না হইলেও উহার নমুনার প্রয়োজন আছে। অনেক ক্ষেত্রে নমুনার প্রয়োজনও হয়ত হয় না, সেক্ষেত্রে গুণাগুণ অথবা নামকরা স্থানের বিশেষ কাঁচামাল হইলে উহার শ্রেণীর নামের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়ত, যে কোম্পানী এখনও স্থিতি হয় নাই তাহার শেয়ার কেনা-বেচা



শেয়ারবাজারে হইতে পাবে না। কিন্তু কাঁচামালের বাজারে যে কসল এখনও জমিতে তৈয়ারী হয় নাই সেই ফসলেবও কেনা-বেচা চলে।

চতুর্থত, পণ্যের বাজারে পণ্যের গুণাগুণের ভিত্তিতে যেমন পণ্যের শ্রেণীবিভাগ হয় শেয়ার বাজারে সেইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিতে দেখা যায় না।

পঞ্চমত, কোন কোম্পানী যখন প্রথম শেয়ার বিক্রয় কবে, তখন উহা বিক্রয় হইলে পরে ঐ কোম্পানীর কাছে বিক্রীত শেয়ারের পুনবায় ক্রয়-বিক্রয়ে ততটা উৎসাহ থাকে না। কিন্তু কাঁচামালের বাজারে একই দ্রব্য প্রতি মবস্তুমে ক্রয়-বিক্রয় হয় বলিয়া উহাব ক্রেতা বা বিক্রেতার তৎপবতা স্থায়ী থাকে।

ষষ্ঠত, শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় কবিয়া ঐ শেয়ারের বলে শেয়ার-বিক্রয়কারী কোম্পানীর পবিচালনা কার্বে হস্তক্ষেপ কবিতো পারেন। কিন্তু কাঁচামালের বাজারে দ্রব্য ক্রয় কবিয়া অনুরূপ ভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করা যায় না।

সপ্তমত, শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহা বহনের জন্ত যানবাহনেব প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কাঁচামালের বাজারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহার জন্ত পবিবহণেব প্রয়োজন আছে।

অষ্টমত, শেয়ারবাজারে শেয়ার অধিকদিন পড়িয়া থাকিলে উহা নষ্ট বা অব্যবহায, হইয়া যায় না কিন্তু কাঁচামাল অধিকদিন পড়িয়া থাকিলে উহা নষ্ট হয়।

নবমত, শেয়ার বিক্রয়ার্থ মজুত রাখিতে হইলে ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিটভন্ট অথবা বাড়ীর তোবজই যথেষ্ট, কিন্তু কাঁচামাল বিক্রয়ার্থ মজুত রাখিতে হইলে উপযুক্ত গুদাম থাকা প্রয়োজন এবং এই গুদাম কাঁচামালের বাজারের সন্নিকটে হইলেই ভাল।

শেয়ারবাজার ও কাঁচামালের বাজারের মধ্যে যেমন বৈষম্য আছে, উহাদের মধ্যে তেমনি কয়েকটি সাদৃশ্যও আছে—

প্রথমত, উভয় বাজারেই দালালের মাযফত ক্রয়-বিক্রয় চলে।

দ্বিতীয়ত, উভয় বাজারেই ফাটকা প্রায় সবক্ষেত্রেই চলে।

তৃতীয়ত, উভয় বাজারেরই নিয়মাবলী প্রায় একই রকম ভিত্তিতে রচিত।

শেয়ারবাজারের মত কাঁচামালের বাজারেরও কঙকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন,

(ক) প্রায় সব কাঁচামালের বাজারই যৌধকারবারের ভিত্তিতে গঠিত।

(খ) ইহার পরিচালনার ভার থাকে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এর উপরে।

(গ) দালাল, প্রত্যক্ষ কারাবাবী, আয়দানিকারক, রপ্তানিকারক, পাইকার, খুচরা বিক্রেতা এবং উৎপাদক—প্রত্যেকেই ইহার সভ্য হইতে পারে।

(ঘ) কাঁচামালের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বাজার থাকে ; যথা, Calcutta Tea Exchange, Hapur wheat Exchange, Bombay Cotton Exchange, etc.।

(ঙ) পরিচালক সমিতি যে নিয়মাবলী রচনা করে, প্রত্যেক সভ্যকে তাহা মানিয়া লইতে হয়। পরিচালক সমিতি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ঠিক করিয়া দেন, পণ্যের গুণাগুণ ও যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করেন, গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণীবিভাগ করেন, বাজারের দর স্থির করার ব্যাপারে সাহায্য করেন, সদস্যদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে উহার মীমাংসা করেন, বাজারের নিয়মাবলী বলবৎ রাখিবার প্রচেষ্টা করেন এবং সর্বোপরি কোন সদস্য আইন লঙ্ঘন করিলে উহার শাস্তিবিধান অথবা জরিমানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

(চ) কাঁচামালের বাজারে সাধারণতঃ নগদ লেনদেন (Cash or Spot Transaction) এবং ফাটকা লেনদেন (Future's transaction) —এই দুই প্রকারের লেনদেন চলিয়া থাকে।

এ যাবৎ আমরা কাঁচামালের বাজারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছি কিন্তু এই সব বাজারে যে সমস্ত কাঁচামালের লেনদেন হয়, তাহাদের কতকগুলি গুণাগুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই অত্যাবশ্যক গুণাগুণগুলি ন থাকিলে বাজারে উহার ক্রয়বিক্রয় সহজসাধ্য হয় না। তাই যে সমস্ত গুণাগুণ থাকিলে কাঁচামাল বাজারে বিক্রয়যোগ্য হয়, সেইগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, প্রকারের ব্যাপক চাহিদা থাকা প্রয়োজন। এই চাহিদা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে আসে, তাহা হইলে বাজারের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, প্রকারের পরিবহন-যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। প্রকার যদি পরিবহন-যোগ্য না হয়, অথবা উহা যদি অল্প সময়ের মধ্যে পরিবহন না হইলে নষ্ট হইয়া যায়, অথবা যদি উহার পরিবহন ব্যয় মূল্যের তুলনায় অধিক হইয়া পড়ে, তবে সেই প্রকারের বাজার উন্নতি লাভ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রকারের স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। যে প্রকার অধিক দিন যত্ন

রাখিলেও নষ্ট হইয়া যায় না, অথবা যে দ্রব্য সহজ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণযোগ্য অথবা যে দ্রব্যের সংরক্ষণ-ব্যয় উহার মূল্যের তুলনায় অধিক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যের বাজার বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

চতুর্থত, দ্রব্য শ্রেণীবিভক্ত হইবার উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ বাজারের পরিচালক সমিতির দ্বারা করা হইলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ গুণ আছে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা চাষের বাজারে যে শ্রেণীবিভাগ হয় ঐ শ্রেণীর নামের ভিত্তিতেই বেচাকেনা চলিয়া থাকে। কারণ প্রতিটি শ্রেণীর গুণাগুণ নির্দিষ্ট।

পঞ্চমত, দ্রব্য নমূনার দ্বারা সঠিক পরিচিত হইবার উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ এমন ভাবে হইয়া থাকে যে, যেকোন একটি শ্রেণীর কিছু অংশ কোন লোককে দেখাইলে ঐ শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যই নমুনা অমুযায়ী আছে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নমূনার দ্বারা বিক্রয় করিতে গেলে নমূনার গুণাগুণ সমস্ত দ্রব্যের গুণাগুণের সমান হইবে। কিন্তু কোন দ্রব্য যদি নমূনার দ্বারা বুঝান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের বাজারও বেশী প্রসার লাভ করে না।

ষষ্ঠত, দ্রব্যের ওজন, পরিমাণ এবং সংখ্যা ইত্যাদির মান নির্ধারিত (Standardized) হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে অনেক সময় বিভিন্ন ওজন অথবা গণনা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি দ্রব্যের বিক্রয় ক্ষেত্রে প্রতিটি এককের (Unit of Sale) ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, উহা সমস্ত ক্রেতারাই বুঝিতে পারে।

সপ্তমত, দ্রব্যের যোগানের তৎপরতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যে সমস্ত দ্রব্য সর্বদা মজুত থাকে এবং চাহিদার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপরতার সহিত উহার যোগান দেওয়া যায়, সেই সমস্ত দ্রব্যের বাজার প্রসার লাভ করে। যে সমস্ত দ্রব্য বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন হয় তাহা বৎসরের বার মাস যোগান দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। কিন্তু এই সকল দ্রব্যই স্বল্প ব্যয়ে সংরক্ষণ ও মজুত রাখিয়া যোগান দিতে পারিলে বাজার প্রসারিত হয়। উপরন্তু দেশের রবহণ ব্যবস্থা অমূল্য না হইলে সর্বদা যোগান দেওয়া অস্ববিধাজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বল্প ওজনের অধিক দামী দ্রব্য (যেমন চা, কাফি, কোকো, কাজু ইত্যাদি) অধিক ব্যয়েও (যেমন, আকাশযান ইত্যাদির সাহায্যে) যোগান দেওয়া সম্ভব।

শেষত, দ্রব্যের উৎপাদন তথ্য, যোগান তথ্য এবং সন্তোষ তথ্য সংবাদপত্র

অথবা অল্প কোন নিয়মিত প্রকাশিত পুস্তকাদির মাধ্যমে পাওয়া বাঞ্ছনীয়। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ক্রেতা বা বিক্রেতার উহাদের ক্রয়-বিক্রয় কার্খের তালিকা স্থির করিয়া থাকে। এই তথ্যগুলি পাওয়া না গেলে অনেকেই ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে অস্থবিধা অনুভব করে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কাঁচামালের বাজারে নগদ ও ফাটকা—এই দুই প্রকারের লেনদেন চলে। এক্ষণে নগদ লেনদেন ও ফাটকা লেনদেন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

**নগদ লেনদেন** মালের বিলি ও মূল্য প্রদানের ভিত্তিতে চলে। মালের বিলি দিয়া মূল্য গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ মালের বিলি দিতে ও অর্থ প্রদান করিতে এক সপ্তাহের বেশী সময় নেওয়া হয় না। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তাহা নহে। নগদ লেনদেন একটি বাস্তব চুক্তি এই কারণে যে, ইহার পিছনে মালের বিলি দেওয়ার এবং মূল্য প্রদান করার অভিপ্রায় বিক্রেতা ও ক্রেতার থাকে।

**ফাটকা লেনদেনের** পিছনে অনেক সময়ই মালের বিলি দেওয়ার বা মূল্য প্রদানের অভিপ্রায় থাকে না। শুধু নিষ্পত্তির দিবসে যদি মালের মূল্য বাড়ে অথবা কমে তবে চুক্তির মূল্য এবং নিষ্পত্তির দিবসের মূল্যের পার্থক্য একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রদান করিয়া চুক্তি নিষ্পত্তি কবে। ফাটকা লেনদেন বিক্রেতা কোন নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ দিবসে বিলি দিতে রাজী হয়। কাঁচামালের মূল্য উঠানামা করে, তাই ক্রেতা অগ্রিম চুক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট মূল্যে মাল পাইয়া থাকে। ইহাতে ভবিষ্যতে দর উঠানামার অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় না। বিক্রেতাও জানে কোন তারিখে তাহাকে মালের বিলি দিতে হইবে। তাই সে পূর্ব হইতেই মালের সংগ্রহ করিতে পারে। তবে ফাটকা লেনদেনে অধিকাংশ সময়েই মূল্যের পার্থক্য প্রদান করিয়া চুক্তির নিষ্পত্তি হয় বলিয়া মালের সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

যাহারা কাঁচামালের সাহায্যে শিল্পীয় পণ্য প্রস্তুত করেন, তাহাদের নিবট ফাটকা লেনদেন একটি প্রয়োজনীয় উপায়। মালের মূল্যের তারতম্যের জন্য অথবা উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিলে ক্রেতা বা বিক্রেতার অস্থবিধা হয়। ফাটকা লেনদেনের সাহায্যে এই আশঙ্কিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এইরূপ ফাটকা লেনদেনকে রক্ষণ বা **Hedging** বলে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাউক।

মনে কর বাদামতেলের মূল্য প্রতি মণ ৫০ এবং কাঁচা বাদামের মূল্য প্রতি মণ ৪৮ টাকা। কোন উৎপাদক জাহুয়ারী মাসে ৪৮ টাকা দরে ১০০ মণ কাঁচা বাদাম ক্রয় করিয়া তৈল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। মনে করা যাউক যে মার্চ মাসের শেষে প্রস্তুতকার্য শেষ হইবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি কাঁচাবাদামের মূল্য কমে তবে তেলের মূল্যও কমিবে। আবার কাঁচা বাদামের মূল্য বাড়িলে তেলের মূল্যও বাড়িবে। এইরূপ অনিশ্চয়তা দূর করিয়া সাধারণ লাভ ভোগ করিবার জন্ত “রক্ষণ” লেনদেন (hedging) করিবে। ইহাতে সে একটি অগ্রিম চুক্তিতে ৪৮ টাকা দরে মার্চ মাসের শেষে ১০০ মণ কাঁচাবাদাম বিলি দেওয়ার চুক্তি করিবে (অর্থাৎ যে মূল্যে যে পরিমাণ ক্রয় করিয়াছিল সেই মূল্যে সেই পরিমাণ অগ্রিম বিক্রয় করিবে।)

মনে কর মার্চ মাসের শেষে কাঁচা বাদামের মূল্য ৪৫ টাকা হইল এবং তেলের মূল্য হইল ৪৭ টাকা। সুতরাং সে তেল বিক্রয়ে মণপ্রতি তিন টাকা লোকসান দিবে এবং অগ্রিম বিক্রয়ে মণপ্রতি ৩ টাকা লাভ করিবে। (সে বিক্রয় করিয়াছে ৪৮ টাকা দরে এখন বাজার হইতে ৪৫ দরে ক্রয় করিয়া উহা বিলি দিয়া ৪৮ টাকা দর পাইবে।) অতএব লাভ ও লোকসান সমান হওয়ায় তাহার পূর্বের স্বাভাবিক উৎপাদন লাভ (normal manufacturing profit) অর্থাৎ ৫০-৪৮ বা মণ প্রতি ২ টাকা ঠিক থাকিবে।

আবার মনে কর যে, মার্চ মাসের শেষ কাঁচাবাদামের মূল্য ৫২ টাকা হইল এবং তেলের দাম হইল ৫৬ টাকা। এই ক্ষেত্রে কাঁচামালের ক্ষেত্রে সে মণপ্রতি ৪ টাকা লোকসান দিবে এবং তেলের ক্ষেত্রে মণপ্রতি ৬ টাকা লাভ করিবে। সুতরাং স্বাভাবিক উৎপাদন লাভ (normal manufacturing) মণপ্রতি ২ টাকা ঠিকই থাকিবে।

রক্ষণ লেনদেন তাই বিলম্বিত উৎপাদনকে সাহায্য করে অর্থাৎ ক্ষতির আশঙ্কা হইতে মুক্ত করে এবং স্বাভাবিক উৎপাদন লাভ পাইতে সাহায্য করে। রক্ষণ লেনদেন আবার অধিক লাভও করিতে দেয় না। মূল্য বাড়িলেও স্বাভাবিক লাভ ঠিকই থাকে। রক্ষণ লেনদেন কিন্তু ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ের মধ্যে (Speculative dealings) পড়ে না।

কার্টকা লেনদেনে অংশগ্রহণকারীদের নানা শ্রেণী আছে। যেমন, যে ব্যাবসায়ী ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এই আশায় বর্তমানে কমমূল্যে মাল ক্রয়

করে তাহাকে **ভেজীওয়াল** ( Bull ) বলে এবং যে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে দাম কমিবে এই আশায় বর্তমানে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তাহাকে **মস্কীওয়াল** ( Bear ) বলে।

কোন নির্দিষ্ট দরে ভবিষ্যতে পণ্য বিলি দেওয়ার চুক্তিকে বলে **"Put Option"** এবং কোন নির্দিষ্ট মূল্যে ভবিষ্যতে ক্রয় করার চুক্তিকে বলে **"Call Option"**। আবার নির্দিষ্ট মূল্যে ভবিষ্যতে ক্রয়-বিক্রয় উভয় চুক্তিকে একসঙ্গে **"Double Option"** বলে।

ফাটকা কারবার সব সময়েই যে দেশের ক্ষতি কবে তাহা নহে। স্বন্দর-ভাবে এবং পরিমিত হারে ফাটকা চলিলে বাজার স্বস্থ থাকে। কিন্তু অনেকের ধারণা যে, ফাটকা মাত্রেরই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক; এই জন্ত এইরূপে ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করিব।

### ফাটকা লেনদেনের গুণ ও দোষ

( Merits and demerits of futures transaction )

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রায় প্রত্যেক কাঁচামালের বাজারেই নগদ ও ফাটকা এই দুই রকমের লেনদেন ঘটয়া থাকে। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে সব ফটকা লেনদেনই দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তাই এই প্রসঙ্গে ফাটকা বাজারের গুণ ও দোষগুলি আলোচন, করা বাঞ্ছনীয়। প্রধান প্রধান গুণ ও দোষগুলি নিম্নরূপ—

#### গুণ ( Merits )

১। যে সকল দ্রব্য বৎসরের বার মাস জন্মায় না তাহাদের বাজারদর অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সুবিধা, কারণ যে সময়ে উহার যোগান হইবে সেই সময় কি দাম হইবে সে সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তাই অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে এই অনিশ্চয়তা দূর হয়।

#### দোষ ( Defects )

১। বে-হিসাবী ফাটকাবাজীদের বে-হিসাবী লেনদেনের জন্ত অনেক ক্ষেত্রে বাজারদর অত্যধিক পরিমাণে উঠানামা করে।

## গুণ (Merits)

২। রক্ষণ ব্যবস্থার (Hedging) দ্বারা শিল্পপতিগণ (যাহারা কাঁচামাল ব্যবহার করে) নিজেদের লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারে।

৩। শিল্পপতির অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে মালের যোগান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারে।

৪। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও অগ্রিম চুক্তি সহায়ক। তাহার কারণ রপ্তানী ও আমদানী দ্রব্য যথা সময়ে অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

৫। ফাটকাবাজদের (Speculator) কার্যকলাপের জন্ত বাজার-দর অত্যধিক উঠানামা করিতে পারে না। বাজার দর কমিতে থাকিলে অথবা কমিবার মত অবস্থা হইলে ফাটকাবাজরা ক্রয় আরম্ভ করে। আবার বাজারদর চড়িতে থাকিলে উহারা বিক্রয় শুরু করে। ইহার ফলে বাজারদর অত্যাধিক উঠানামা করিতে পারে না।

৬। বিভিন্ন বাজারের মধ্যেও ফাটকাবাজরা মূল্যস্তরের সমতা রক্ষা করিতে পারে। যে বাজারে দাম কম

## দোষ (Defects)

২। বে-হিসাবী ফাটকাবাজদের কার্য-কলাপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাজারদর অনেক উপরে উঠিয়া উঠিয়া এমন ভাবে পড়িয়া যায় যে, উহাতে অনেক ব্যবসায়ীর অত্যাধিক ক্ষতি হয়।

৩। যে বাজারে বেহিসাবী ফাটকাবাজদের কীর্তিকলাপ প্রভূত, সেই বাজারের দর হইতে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা বুঝা সম্ভব নহে।

৪। অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে প্রচুর মাল ক্রয় করিয়া এবং বাজারে কিছু কিছু করিয়া উহা ছাড়িয়া যে কৃত্রিম যোগান-স্বল্পতা সৃষ্টি করে, তাহার ফলে কোন বিশেষ ফাটকাবাজ লাভবান হইলেও জনসাধারণের ও দেশের পক্ষে ইহা অমঙ্গলজনক।

৫। কাঁচামালের বাজারে অনেক অনভিজ্ঞ লোক এবেশ করিয়া ফাটকাবাজদের হাতে পাড়ে এবং নাজেহাল ও নিঃস্ব হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

## ভুগ (Merits)

সেই স্থান হইতে ক্রয় করিয়া এবং যে  
বাজারে মূল্য অধিক সেইখানে বিক্রয়  
করিয়া উভয় বাজারের মধ্যে দরের  
সমতা আনে।

## দৌষ (Defects)

এই সব অসুবিধার জগু সরকার  
আইনের দ্বারা ফাটকা লেনদেন গুলির  
নিয়ন্ত্রণ সাধন করিতেছে। (ইহার  
প্রধান ধারাগুলি পরে আলোচিত

৭। ফাটকা কাববায়ের ক্ষেত্রে হইবে)।

ব্যাক হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ  
পাওয়া খুবই সহজ।

## অগ্রিম চুক্তি আইন (Forward Contract Regulation)

১৯৫২ সালে এই আইন পাশ হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রধান ধারাগুলি  
নিম্নরূপ :

(১) তালিকাকৃত দ্রব্য সকলের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অগ্রিম চুক্তি বে-আইনী  
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে আইন কর্তৃক স্বীকৃত কোন বাজার-  
সংস্থার সদস্যদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।

(২) সর্বপ্রকার Option লেনদেন বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কোন সংস্থাকে স্বীকৃতি দিতে পারিবে অথবা  
কোন স্বীকৃত সংস্থার স্বীকৃতি বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে অগ্রিম বাজার কমিশন  
(Forward Market Commission) নিয়োগ করিতে পারিবে। এই  
কমিশন বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারকে বুদ্ধি দিতে এবং অগ্রিম বাজার  
সম্পর্কীয় যে-কোন তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইতে পারিবে। ইহা  
ছাড়া বাজারের উন্নতি ও স্বীকৃতি, আবেদনপত্র বিচার ও অনুসন্ধান, বিভিন্ন  
বাজার-সংস্থার কার্যকলাপ পরিদর্শন এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এই  
কমিশনের প্রধান কাজ। ভারত সরকার ১৯৫৩ সালে একটি অগ্রিম  
বাজার কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কমিশন তুলা, বাদাম, তিসি,  
পাট এবং রেড়ি ইত্যাদি কাঁচামাল সংক্রান্ত অগ্রিম চুক্তি সম্পর্কে এক  
বৎসরের মধ্যেই একটি রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে।

কাঁচামালের বাজার সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে Bombay  
Grain Merchants' Association সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ  
ইহা ভারতের প্রধান কাঁচামালের বাজার।



খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য Bombay Grain Merchant's Association গঠিত হয়। দুইটি বাজার ইহার তত্ত্বাবধানে আছে এবং প্রত্যেকটি বাজারেই খাদ্যশস্য এবং তৈলবীজ কেনাবেচা হয়। এই এসোসিয়েশনে সংশ্লিষ্ট সদস্য (Associated Member) এবং সাধারণ সদস্য (Ordinary Member)—এই দুই প্রকার সদস্য আছে। সংশ্লিষ্ট সদস্য হইতে হইলে আবেদনকারীকে ১০১ টাকা ফি হইতে নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করিতে হয়। এই দুই প্রকারের সদস্য ছাড়া দুই প্রকারের দালালও আছে। প্রথম প্রকারের দালালরা মালের মূল্য প্রদান বা বিলি দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এবং দ্বিতীয় প্রকারের দালালরা উহার দায়িত্ব গ্রহণ করে; কিন্তু উভয় প্রকারের দালালরাই ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যে দালালরা মূল্য প্রদান এবং বিলি দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহাদিগকে Muccadum বলে। প্রথম প্রকারের দালালদের সামান্য ফি দিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দালালদের প্রচুর অর্থ জামানত রাখিতে হয়।

এসোসিয়েশনের নিয়মামুত্বারে দুই প্রকারের লেনদেন হইতে পারে—নগদ লেনদেন এবং অগ্রিম বা ভবিষ্যৎ কেনাবেচা। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে মালের মূল্য এবং বিলি চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ার নিয়ম। অগ্রিম চুক্তি এবং ভবিষ্যৎ কেনাবেচার মধ্যে (between forward contract and futures) এসোসিয়েশনের একটু প্রভেদ রাখিয়াছে। ভবিষ্যৎ কেনাবেচার ক্ষেত্রে মূল্য এবং বিলি দুই-ই ভবিষ্যতে অর্থাৎ পরে দিতে হয়। কিন্তু অগ্রিম চুক্তির ক্ষেত্রে যদিও মালের বিলি পরে দেওয়া হয় তথাপি উহার মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ লেনদেনের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ার নিয়ম।

বাজারের অভ্যন্তরে তেজীওয়ালা ও মন্দীওয়ালা লেনদেন প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে।

অগ্রিম চুক্তি অথবা নগদ লেনদেন বিলিশর্তে (Delivery terms) অথবা বাজার শর্তে (Bazar terms) হইতে পারে। বাজার শর্তে বিক্রয় হইলে মাল ওজন হইবে বিক্রেতার ওদামে এবং বিলি শর্তে বিক্রয় হইলে মাল ওজন হইবে ক্রেতার ওদামে।

নগদ লেনদেন বাজার শর্তে হইলে যে সমস্ত ক্রেতার মিল বা ওদাম বোঝাইতে আছে তাহারা লেনদেনের অন্তিমদিনের মধ্যে বিলি লইবে, কিন্তু বাজারের মিল বা ওদাম বোঝাইতে নাই তাহারা ১৪ দিনের মধ্যে বিলি

লইবে। বাজার শর্তে নগদ লেনদেনের মূল্য চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার পরের দিন দিতে হইবে।

বিলি শর্তে লেনদেনের বেলায় বিক্রেতা রেলওয়ে রসিদ (Railway receipt) অথবা গুদাম হইতে বিলির আদেশ (Godown delivery order) ক্রেতার নামে হস্তান্তর করিবে এবং ক্রেতা মালের মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি লইয়া মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ অগ্রিম দিবে। ভবিষ্যৎ কেনাবেচার নিষ্পত্তি (Settlement) বিশেষ একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে বৎসরে তিনবার হইয়া থাকে। মার্চ, জুন এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ দীর্ঘ নিষ্পত্তির যেদ্বারা ঝুঁকিদারী কার্যকলাপ (Speculative activities) বৃদ্ধি করে।

এসোসিয়েশন বিবাদ মীমাংসার জন্ত মধ্যস্থ কমিটি (Arbitration Committee) গঠন করিতে পারে।

শেয়ার বাজারের দর যেমন প্রতিদিন খবরের কাগজে ওঠে, কাঁচামালের বাজারেব দরও তেমনি দৈনিক খবরের কাগজে ওঠে। উহার দুই-একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল—

1. Oil-seeds futures : Mustard October 185'37, high 188'25 and low 184'75.

সরিষার ফাটকা দর। যে সরিষা অক্টোবর মাসে বিলি দেওয়া হইবে তাহার দর গতকল্য ছিল ১৮৫ টাকা ৩৭ নয়া পয়সা, গতকল্যের সর্বোচ্চ দর ছিল ১৮৮ টাকা ২৫ নয়া পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর ছিল ১৮৪ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা।

2. Cotton futures : Moglai Jarilla June 595'75, high and low 597'25 and 594'50.

তুলার ফাটকা দর। জুন মাসে যে তুলার বিলি দেওয়া হইবে তাহার দর ছিল বেল প্রতি ৫৯৫ টাকা ৭৫ নঃ পঃ। গতকল্যের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দর ছিল যথাক্রমে ৫৯৭ টাকা ২৫ নঃ পঃ এবং ৫৯৪ টাকা ৫০ নঃ পঃ। (Moglai Jarilla একটি বিশেষ প্রণীর তুলার নাম)।

3. Jute Ready, Rs. 319'25 op., Rs. 318'50, Rs. 319'00 clo.

সজ্জ বিলির পাটের বেলপ্রতি দর ছিল দিনের গোড়ায় ৩১৯ টাকা ২৫ নঃ পঃ, দিনের মধ্যে ৩১৮ টাকা ৫০ নঃ পঃ দরও বিক্রয় হইয়াছিল, এবং দিনের শেষে ৩১৯ টাকা দর ছিল।

### নিলাম বাজার ( Auction Market )

নিলাম বাজারের বিশেষত্ব এই যে, এখানে ক্রেতারা একত্রিত হইয়া কোন পণ্যের দর ডাকিতে থাকে। সর্বোচ্চ দরে পণ্যটি বিক্রয় হয়। নিলাম বাজারের কর্তৃপক্ষ কোন পণ্য নিলামে তুলিয়া ক্রেতাদের মূল্য ডাক দিতে অগ্রবোধ করেন। সর্বোচ্চ দরে তিনবার হাতুড়ি ঠুকিবার মধ্যে কেহ পরবর্তী দর না বলিলে ঐ দরই সর্বোচ্চ দর হিসাবে পরিগণিত হয় এবং পণ্যটি ঐ দরেই বিক্রয় হইয়া যায়। অনেক সময় কোন পণ্যকে নিলামে তুলিবার সময় উহাব ন্যূনতম দর উল্লেখ করিয়া দেওয়া হয়। এই দরের কম দর বাজারে উঠিলে পণ্যটি নিলাম হইতে তুলিয়া লওয়া হয়।

যে সমস্ত পণ্য গুণ অমুযায়ী শ্রেণী-বিভক্ত করী যায় না, তাহাদিগকে সাধারণতঃ নিলামে বিক্রয় করা হয়। নিলামে দর ডাকিবার পূর্বে ক্রেতাকে পণ্য যাচাই করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। গভর্ণমেন্টের বাজেয়াপ্ত জিনিসগুলিও নিলাম বাজারে বিক্রয় করা হয়। কাঁচামালের ক্ষেত্রে উৎপন্নস্থানের নাম এবং নমুনা ক্রেতাকে বলা ও দেখান হয়। ক্রেতা ইচ্ছা করিলে গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিতে পারে।

নিলাম বাজারের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে সাধারণতঃ অনেক মাল একসঙ্গে বিক্রয় করা হয়। তাই যে দ্রব্য নিলামে বিক্রয় হয় তাহার ব্যাপক চাহিদা থাকিতে হইবে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নিলাম বাজার আছে, কোনখানে ফার্ণিচার কোনস্থানে চা, কোনস্থানে ফল, কোন স্থানে তুলা, কোনস্থানে চামড়া ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা চায়ের বাজার সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া দরকার। কলিকাতা চায়ের নিলাম-বাজারটি ব্রোকারস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত। মিশন রো'তে একটি কক্ষে প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার চায়ের নিলাম ডাক হয়। দার্জিলিং, ডুমাস, আসাম ইত্যাদি চা খিদিরপুরের গুদামে মজুত থাকে। ঐ চায়ের নমুনা দালালরা ক্রেতাদের দেখায় এবং ক্রেতারা নিলামে দর দ্বাহাকে। ক্রেতা গুদামে গিয়া চা পরীক্ষা করিতে পারে। কোন ক্রেতা দালালের মাধ্যমে ছাড়া নিলাম ডাকিতে পারে না। বিক্রয়ের পর চায়ের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা বিক্রয়ের ৬ দিনের মধ্যে পেশ

## বাণিজ্য

করিতে হইবে। বিক্রয়ের দশদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য ক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হয়। এই দিনটিকে Prompt day বলে। মূল্য পরিশোধ ও বিলি সাধারণতঃ একসঙ্গেই হইয়া থাকে। বিক্রেতা দশদিন পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে মাল গুদামে রক্ষণা বক্ষণ করিয়া থাকে।

মূল্য পরিশোধ হওয়ার পরে দালালরা নিজ কমিশন কাটিয়া রাখিয়া মালিককে বাকী অর্থ দিয়া দেয়। কলিকাতা চায়ের নিলাম বাজারে পূর্বে শুধু ইউরোপীয়ন দালালরাই কাজ করিত, বর্তমানে ভারতীয়রা কিছু কিছু প্রবেশ করিতেছে। তবে এখনও দালালদের সংখ্যা খুবই কম।

কলিকাতার চায়ের নিলামবাজারের অনুরূপ বাজার কোচিন এবং পূর্বপাকিস্তানের চট্টগ্রামে আছে। লন্ডনের 'Tea Auction Market' ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চায়ের বাজার। কলিকাতায় ফলের বাজারে নিলামে ফল বিক্রয় হয়।

সুসংগঠিত নিলাম বাজার ছাড়াও কতগুলি ছোট খুচরা নিলামবাজার বিভিন্ন স্থানে আছে। এখানে গৃহস্থালী দ্রব্য, পুরাতন আসবাব, সরকারের বাজেয়াপ্ত দ্রব্যসকল ও কাষ্টমসের বাজেয়াপ্ত দ্রব্যসকল বিক্রয় হয়। তবে এইরূপ বাজার সুসংবদ্ধ নিলাম বাজার হইতে আলাদা। দিল্লীর নিকটে হাপুর, বিহারের মজফরপুর, পঞ্জাবের ফিরোজপুর ইত্যাদি স্থানে গমের জন্তও নিলাম বাজার আছে।

## Exercise

1. What is meant by a Market ?

বাজার বলিতে কি বুঝায় ?

2. Classify Market into different category on various bases.

বিভিন্ন ভিত্তিতে বাজারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর।

3. What do you mean by Stock Exchange ? What are the functions of a Stock Exchange ?

শেয়ার বাজার বলিতে কি বুঝায় ? শেয়ার বাজারের কি কি কার্য ?

4. Describe briefly the main services rendered by Stock Exchange.

শেয়ার বাজারের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (H. S. 1060)

5. What are the principal Stock Exchanges of the world? Describe any one Stock Exchange briefly.  
পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শেয়ার বাজার কি কি? যে-কোন একটি শেয়ার বাজার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
6. What are the characteristics of a Stock Exchange?  
শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি?
7. Describe any one of the following Stock Exchange briefly :—
  - (a) London Stock Exchange
  - (b) Calcutta Stock Exchange
  - (c) New York Stock Exchange ( Wall Street )
  - (d) Bombay Stock Exchange.

নিম্নলিখিত শেয়ার বাজারের যে-কোন একটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর :—

- (ক) লন্ডন শেয়ার বাজার
  - (খ) কলিকাতা শেয়ার বাজার
  - (গ) নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজার ( ওয়াল স্ট্রীট )
  - (ঘ) বোম্বাই শেয়ার বাজার।
8. Write what you know about the following :—
    - (a) Jobbers and Brokers
    - (b) Bull and Bears
    - (c) Contango and Backwardation
    - (d) Put option and Call option.

নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে যাহা জ্ঞান লিখ :—

- (ক) প্রত্যক্ষ কারবারী ও দালাল
- (খ) তেজীওয়ালা ও মন্দীওয়ালা
- (গ) কন্ট্যাঙ্গো ও ব্যাকওয়ার্ডেশন
- (ঘ) 'পুট অপশন' ও 'কল অপশন'

9. Make a comparative study of the Calcutta, London and Bombay Stock Exchanges.

কলিকাতা, লন্ডন ও বোম্বাই শেয়ার বাজারের তুলনামূলক আলোচনা কর।

10. what are the defects of the Indian Stock Exchanges ?

ভারতীয় শেয়ার বাজারের গলদ কি কি ?

11. What steps have been taken for removing the defects of Indian Stock Exchange ?

ভারতীয় শেয়ার বাজারের গলদ দূর করিবার জন্ত কি করা হইয়াছে ?

12. Mention the principal provisions of the Securities Contract ( Regulation ) Act 1956.

১৯৫৬ সালের সিকিউরিটি কনট্রাক্ট ( রেগুলেশন ) আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি উল্লেখ কর।

13. How share prices are quoted in the Newspaper ? Give at least 3 examples.

সংবাদপত্রে শেয়ারের দর কিভাবে উল্লেখ করা হয় ? অন্ততঃ তিনটি উদাহরণ দাও।

14. What is a Produce Exchange ? ( H. S. 1960 ) How does it differ from a Stock Exchange ?

উৎপন্ন কাঁচামালের বাজার কি ? শেয়ার বাজার হইতে ইহার পার্থক্য কি ?

15. What conditions are to be satisfied by a commodity to be saleable in the market ?

বাজারের বিক্রয় হইতে গেলে কোন বস্তুর কি কি গুণ থাকা দরকার ?

16. Describe the characteristics of a Produce Exchange. কাঁচা মালের বাজারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

17. What is futures market ? Describe its merits and defects.

ফাটকা বাজার কি ? উহার গুণ ও দোষগুলি বর্ণনা কর।

18. Write what you know about Bombay Grain-Merchants' Association.

বোম্বাই শস্য ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন সম্পর্কে যাঁহা জ্ঞান লিখ।

## পাণিজ্যিক তত্ত্ব

19. What are the important provisions of the Forward Contract Regulation Act ?

অগ্রিম চুক্তি আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি কি কি ?

20. How Commodity-prices quoted in the daily news paper ? Give at least 3 illustrations.

কিভাবে পণ্যের দর দৈনিক খবরের কাগজে উল্লিখিত হয় ?  
ন্যূনপক্ষে তিনটি উদাহরণ দাও।

21. What is Auction Market ? How goods are sold there ?

নিলাম বাজার কি ? কিভাবে সেখানে জিনিস বিক্রয় হয় ?

22. How tea is sold in Calcutta Tea Auction House at Mission Row ?

কলিকাতায় মিশন রো-এর চায়ে নিলামঘরে কি ভাবে চা বিক্রয় করা হয় ?

---

## তৃতীয় অধ্যায়

### মালগুদাম ( Warehouse )

বৃহৎ উৎপাদন ( Large Scale Production ) ক্ষেত্রে একসঙ্গে প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন হয়। কিন্তু সস্তোগকারীরা উহা ক্রমে ক্রমে সস্তোগ করে। তাই উৎপাদনের পরে যতদিন উহা সম্পূর্ণ সস্তোগ না হয়, ততদিন উহা কোন সুরক্ষিত স্থানে মজুত রাখিতে হয়। এই স্থানকে মালগুদাম বলা হয়। কৃষিজ দ্রব্য, খনিজদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্যের জন্য মালগুদাম বিশেষ প্রয়োজন। কৃষিজ দ্রব্য বৎসবেব কোন কোন ঋতুতে উৎপাদন হয় কিন্তু বৎসরের বারমাস উহা সস্তোগ হয়। তাই উৎপাদনের পর ক্রমে বণ্টনের নিমিত্ত উহাকে মালগুদামে সংরক্ষণ করিতে হয়। বর্তমান যুগে স্বল্প উৎপাদন দ্রব্য (Scarce product) নাগরিকদের মধ্যে স্ববণ্টনের জন্য মালগুদামে রক্ষা করা হয়। যেমন, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি দ্রব্য বাজারে কম পাওয়া যায় বলিয়া উহা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গুদামজাত হয় এবং সবকারী পারমিটের ভিত্তিতে উহা বণ্টন হয়।

উৎপাদনকারী উৎপন্ন দ্রব্যের জামিনে ঋণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে অনেকক্ষেত্রেই ঐ দ্রব্য মালগুদামে রাখিয়া জমা রসিদ ঋণদাতাকে স্বত্বান্তর করিতে হয়।

মালগুদামের গৃহ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়—যাহাতে দ্রব্যের নিরাপত্তা থাকে, দ্রব্যের গুণ নষ্ট না হয়, উৎপাদন স্থান হইতে উহা আনিতে কষ্ট বা ব্যয় অধিক না হয় এবং মালগুদাম হইতে উহা বণ্টন করিতে অসুবিধা বা ব্যয় বেশী না হয়।

মালগুদামের বিভিন্ন সুবিধা থাকায় প্রত্যেক সভ্যদেশেই প্রচুর মালগুদাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বেসবকারী মালগুদাম ছাড়াও সরকারী মালগুদাম প্রচুর আছে ও তৈয়ারী হইতেছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক Warehousing Corporation উহা নির্মাণের ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

### মালগুদামের সুবিধাগুলি আলোচনা করা যাউক

প্রথমত, মালগুদামে পণ্য নিরাপদ অবস্থায় সংরক্ষিত হয়। কর্মকুশল ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে থাকে বলিয়া মাল নষ্ট বা অতরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরন্তু, মালগুদামে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি যদি



উৎপাদনকারীর নিজস্বায়ে ব্যবহার করিতে হইত তবে উৎপাদন মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইত।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন বৃহৎ হারে হইলে উহা গুদামজাত করিতে পারিলে অল্প উৎপাদন আরম্ভ করা যায়। অথবা দুর্দিনের আশঙ্কায় অধিক উৎপাদন করিয়া রাখিতেও পারা যায়। আমদানী দ্রব্যও অধিক হারে আমদানি করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য মজুত রাখা যায়।

তৃতীয়ত, মালগুদাম উৎপাদন স্থানের সন্নিকটে হইলে উহা গুদামজাত করায় উৎপাদন মূল্যের বেশী বৃদ্ধি হয় না।

চতুর্থত, মালগুদাম হইতে বিভিন্ন যানবাহনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশে মাল বণ্টন করা সহজ। আবার গুদামজাত দ্রব্য নমুনা দেখাইয়া বিক্রয় করা হইলে ক্রেতাকে গুদামের মাল পরিদর্শন করিবার সুবিধা দেওয়া হয়। ইহাতে বিক্রয়ের সুবিধা, ক্রয়েরও সুবিধা। কলিকাতায় নিলামে চা বিক্রয়ের পূর্বে ক্রেতার খিদিরপুরের মালগুদামে গিয়া চা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

পঞ্চমত, মালগুদামে পণ্য গুদামজাত করিয়া যে রসিদ বা গুদাম পরওয়ানা ( Warehouse Warrant ) পাওয়া যায়, তাহা ঋণদাতার নামে স্বত্বান্তর করিয়া ঋণ গ্রহণ করা খুবই সহজ। এই ঋণের সাহায্যেই পরবর্তী উৎপাদন বা আমদানি করা যায়। তাই মালগুদাম মালের মালিকানাশ্বত্ব বদলাইতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠত, মালগুদামে মাল মজুত থাকিলে বাজারে উহার দর বেশী ওঠানামা করিতে পারে না, কারণ যখনই বাজারে দর বাড়িতে থাকে তখনই গুদাম হইতে উহার যোগান বাড়াইয়া দিলে দর বাড়িতে পারে না। অল্পরূপভাবে গুদাম হইতে যোগান কমাইয়া দিলে মালের দাম পড়িতেও পারে না। ভারত সরকার এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যান্তর ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সপ্তমত, অনেক সময় পণ্য এক দেশ হইতে আমদানি করিয়া অল্প দেশে রপ্তানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমদানি ও পুনঃ রপ্তানি একই সময় প্রায়ই হয় না বলিয়া অন্তর্বর্তী কালের জন্য উহা গুদামজাত করিতে হয়।

অষ্টমত, মালগুদামে মাল মজুত থাকিলে পাইকারী ক্রেতার খরচ পূঁজি লইয়াও ব্যবসা করিতে পারে। কারণ, একবার ক্রয় করিয়া উহা বিক্রয় করা হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাহায্যে আবার ক্রয় করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে মালগুদাম বিক্রয় বাজারের সন্নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শেষতঃ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রাম্য ইচ্ছুকদের অজ্ঞতার স্বযোগে লইয়া ফড়িয়ারা উহাদের উৎপন্ন দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে ও নিজেরা মুনাকা ভোগ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মালগুদাম হওয়ায় গুদামের কর্তৃপক্ষ গ্রায্য মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, ইহাতে অজ্ঞ কৃষকের ঠকিবার ভয় থাকে না।

উৎপাদনকারী মালগুদামে পণ্য রাখিলে তাহাকে কিছু ভাড়া দিতে হয়। তবে এই সামান্য ভাড়ার পরিবর্তে যে সাহায্য সে পায়, তাহার মূল্য অনেক বেশী।

উপরে সাধারণভাবে মালগুদামের সুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে একটি বিশেষ মালগুদামের আলোচনা করা যাউক। ইহা হইল চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম বা Bonded warehouse.

যখন কোন আমদানিকারক আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর আমদানীশুল্ক দিতে অক্ষম হয়, তখন শুল্কবিভাগের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া শুল্কবিভাগের মালগুদামে আমদানিকৃত পণ্য মজুত রাখে এবং পরে শুল্ক দিয়া এককালে অথবা ক্রমে ক্রমে পণ্য লইয়া যায়। শুল্ক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এইরূপ মালগুদামকে চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম বা Bonded warehouse বলা হয়।

আমদানি কারক ও শুল্ক বিভাগের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহার শর্ত মালের প্রকার ভেদে নানারূপ হইতে পারে। তবে উহার কর্মপদ্ধতি একইরূপ। প্রথমত, আমদানিকারককে একটি ফরম পূরণ করিতে হইবে। এই ফরমকে বলা হয় Entry for warehousing form. ইহাতে মালের বিস্তৃত বিবরণ শুল্ক বিভাগে পেশ করিতে হয়। শুল্ক বিভাগ ইহা পরীক্ষা করিয়া মাল গুদামজাত করিবার আদেশ দেন। শুল্ক বিভাগের কর্মচারী ও সরকারী প্রহরীর তত্ত্বাবধানে এই মাল গুদামজাত হয় এবং সংরক্ষিত হয়; গুদামের কর্তৃপক্ষ মাল গুদামজাত করিয়া একটি রসিদ দেয়। ইহাকে বলে warehouse keeper's receipt. আমদানিকারক পরে শুল্ক দিয়া এককালে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে মাল গ্রহণ করিতে পারে। শুল্ক দিয়া গুদামের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে Warehouse keeper's order পায় এবং উহার ভিত্তিতে গুদাম হইতে মাল খালাস করা হয়, রপ্তানীদ্রব্যও চুক্তিবদ্ধ মালগুদামে মজুত রাখিয়া পরে রপ্তানী শুল্ক দিয়া মাল জাহাজে তোলা যায়।

চুক্তিবদ্ধ মালগুদামের অনেক সুবিধা আছে; উহাদের নিম্ন-লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। আমদানিকারক শুদ্ধ দিতে অক্ষম হইলেও তাহার মাল গুদামে নিরাপদে সংরক্ষণ করিতে পারেন। এবং পরে সাধ্যমত এককালে অথবা কিছু কিছু করিয়া শুদ্ধ দিয়া মাল খালাস করিতে পারেন। এই সুবিধা না থাকিলে আমদানী বাণিজ্য শিথিল হইয়া পড়িত।

২। রপ্তানীদ্রব্যও খরিদের পর চুক্তিবদ্ধ মালগুদামে মজুত করা যায় এবং পরে রপ্তানী শুদ্ধ দিয়া ঐস্থান হইতেই মাল সরাসরি জাহাজে তোলা যায়।

৩। আমদানির পরে অথবা রপ্তানির আগে মাল গুদামে থাকাকালীন উহাকে শ্রেণীবিভাগ এবং মোড়াই (Packing) করান যায়। ইহাতে বিক্রয়ের বা রপ্তানির সুবিধা হয়।

৪। আমদানিকৃত দ্রব্য মালগুদামে থাকাকালীন উহা সম্ভাব্য ক্রেতাকে দেখান যায়। ক্রেতা কিনিতে রাজী হইলে তাহার কাছ হইতে অগ্রিম কিছু টাকা লইয়া ঐ টাকার সাহায্যে শুদ্ধ প্রদান করিয়া আমদানিকারক ক্রেতাকে মাল খালাস করিয়া দিতে পারে।

৫। শুদ্ধ প্রদানের দায়িত্ব সমেত আমদানিকৃত দ্রব্য, আমদানিকারক কোন ক্রেতাকে ( গুদামে মাল থাকাকালীন ) বিক্রয় করিতে পারে।

৬। আমরা জানি যে, আমদানিকৃত দ্রব্য পুনঃ রপ্তানি করিলে আমদানি শুদ্ধ ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে অনেক অসুবিধা হয়; কারণ, আমদানিকৃত দ্রব্যই যে পুনরায় রপ্তানি হইতেছে ইহার প্রমাণ ব্যবসায়ীকেই দিতে হইবে। তাই আমদানির পর উহা চুক্তিবদ্ধ মালগুদামে রাখিয়া দিয়া ঐ স্থান হইতেই পুনরায় রপ্তানি করিলে এই অসুবিধা থাকে না।

তাই দেখা যাইতেছে যে, চুক্তিবদ্ধ মাল ও দাম আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ দ্রব্যের জন্য মালগুদাম বিশেষ প্রয়োজন। তাই এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন মালগুদাম থাকে। মালগুদাম ভাই পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন। যেমন; চালের গুদাম, পাটের গুদাম, কাপড়ের গুদাম, চিনির গুদাম, চুণের গুদাম ইত্যাদি। আবার মালগুদাম বেসরকারী ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন হইতে পারে অথবা সমবায় সমিতির কর্তৃত্বে

থাকিতে পারে অথবা সরকার বা শুদ্ধাঙ্গের মালিকানাধীন থাকিতে পারে।

### Exercise

1. Define a Warehouse. How does it function ?

মালগুদামের সংজ্ঞা দাও। ইহা কিভাবে কাজ করে ?

2. What are the various advantages of warehouse ?

or

Describe the part played by Warehouse in the development of commerce. (H.S. 1960).

মালগুদামের বিভিন্ন সুবিধা কি ? অথবা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মালগুদামের ভূমিকা বর্ণনা কর। (উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৬০)।

3. What do you mean by bonded warehouse ?

What are its advantages ?

চুক্তিবদ্ধ মালগুদাম বলিতে কি বুঝ ? ইহার সুবিধা কি ?

4. How can Warehouse be classified ?

কিভাবে মালগুদামের শ্রেণীবিভাগ করা যায় ?

---

## ‘চতুর্থ’ অধ্যায়

### বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়দক্ষতা

#### (Advertisement and Salesmanship)

বিক্রয়ের দ্রব্য অথবা শ্রমের ( goods and services ) গুণাগুণ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করাইয়া বিক্রয়ের সুযোগ লাভের প্রচেষ্টাকে **বিজ্ঞাপন** ( Advertisement ) বলা যাইতে পারে।

#### বিজ্ঞাপনের শ্রেণীবিভাগ ( Classification )

বিজ্ঞাপন দুই রকমের হইতে পারে—(১) বিক্রয়ের জন্ত বিজ্ঞাপন, (২) চাহিদার জন্ত বিজ্ঞাপন। বিক্রয়ের জন্ত বিজ্ঞাপনেই ব্যয় অধিক। এই শ্রেণীতে বিজ্ঞাপন বেশ উন্নত। চাহিদার বিজ্ঞাপন, যেমন, কর্মপ্রার্থী, জমি-বাড়া ইত্যাদি ক্রয়, পাত্র-পাত্রী, বাড়ি ভাড়া.....ইত্যাদির জন্ত হইয়া থাকে। সরকারী নিলাম ইত্যাদির বিজ্ঞাপন, কোন কোন সরকারী কর্মখালির বিজ্ঞাপন.....ইত্যাদি আইনতঃ কবণীয়।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারকাষ ( publicity ) সব সময়ে এক নহে। আদর্শ, নীতি, বিষয়বস্তু, ধর্ম অথবা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য অথবা শ্রমের গুণাগুণ বা সুবিধা ইত্যাদি জনসাধারণকে অবগত করাইবার প্রচেষ্টাকে **প্রচার** ( publicity ) বলা যায়।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মধ্যে তাই কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, বিজ্ঞাপন প্রচারেরই অংশ মাত্র। কাবণ, বিজ্ঞাপন শুধু বিক্রয়ের দ্রব্য বা শ্রমের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টা; আর প্রচার আদর্শ, নীতি, ধর্ম এবং বিক্রয়ের দ্রব্য ও শ্রমের পরিচয় ঘটাইবার প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপন শুধু ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা এবং ইহাতে উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা লাভের; কিন্তু প্রচার সর্ব সময়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে হয় না। অনেক সময় প্রচারকার্য শুধু জনস্বার্থেই হইতে দেখা যায়। বর্তমান আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে প্রচারকার্যের মাধ্যমে অপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করার প্রচেষ্টাও আমাদের সকলেরই অবগত। কিন্তু প্রচারকার্য যদি বিক্রয়ের দ্রব্য বা শ্রম লইয়া চলে তবেই উহা বিজ্ঞাপনের রূপ ধারণ করে। আবার, বিজ্ঞাপন যে কখনই জনস্বার্থে হয় না, একথা বলা চলে না। বিজ্ঞাপন

দ্বারাও অনেক সময় জনকল্যাণ সাধন করা যায় ; উক্ত এক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও ব্যবসায়ীর নিজকল্যাণ দুই-ই একসঙ্গে সাধিত হয় ।

শেষত, বিজ্ঞাপন প্রায় সব সময়েই সম্পূর্ণ কিন্তু প্রচার অনেকক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে হইয়া থাকে । ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের অসুস্থসঙ্কীর্ণতা জন্মান হয় । কিন্তু বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও তদন্তনিহিত আবেদন স্পষ্ট ।

### বিজ্ঞাপনের সুবিধা ও কার্যকারিতা

#### ( Advantages and usefulness of advertisement )

বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীর ও জনসাধারণের অনেক সুবিধা করে ।

প্রথমত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজারের চাহিদার সম্প্রসারণ হয় । বাজারের একটি দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কুচিত হইয়া যদি উহার বিকল্প ( substitute ) দ্রব্যের চাহিদার সম্প্রসারণ হয় তবে বাজারের চাহিদা বাড়ে না । যদি বর্তমান সকল দ্রব্যের চাহিদা বজায় রাখিয়া নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা যায়, তবেই প্রকৃত চাহিদা বাড়িল । সুষ্ঠু বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই ইহা সম্ভব ।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্য প্রস্তুতকারকরা সরাসরি ভাবে জনসাধারণের নিকট দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার আবেদন করিতে পারে এবং মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ফড়িয়াদের ( Middlemen ) আধিপত্য খর্ব করিতে পারে ।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতার নতুন নতুন দ্রব্যের ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে ।

চতুর্থত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাহিদা বাড়ে এবং বৃহত্তর উৎপাদন সম্ভব হয় । ইহার ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং মূল্য হ্রাস সম্ভব হয় ।

পঞ্চমত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধি এবং ফলে বৃহত্তর উৎপাদন সম্ভব হইলে দেশে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ অধিক হারে হইয়া থাকে এবং দেশের শিল্পসমৃদ্ধি ঘটে ।

ষষ্ঠত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া জনসাধারণ উহা ক্রয় করিলে এবং ক্রয়ের পরে উহা ব্যবহার করিয়া গুণাগুণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারকদের স্নাম বা goodwill বৃদ্ধি পায় ।

সপ্তমত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের চাহিদা এবং ফলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্য উৎপাদন করিতে যেসমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় তাহাদেরও চাহিদা বাড়িবে।

অষ্টমত, বিজ্ঞাপকদের দেওয়া পয়সার সাহায্যেই অনেক ভাল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র বাচিয়া থাকিয়া সমাজকে সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান ও খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান যোগাইতেছে। এবং বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর নির্ভর করে বলিয়া সংবাদপত্র কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর ধামাধরা না হইয়া পারে।

নবমত, বৈদেশিক বিজ্ঞাপনে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়।

দশমত, যেহেতু কোন বিশেষ ব্যবসায়-চিহ্ন (Trade Mark) উল্লেখ করিয়া সাধারণতঃ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে, সেইহেতু উহার নকল বস্ত্র জনসাধারণ সহজেই এড়াইয়া চলিতে পারে।

একাদশত, বর্ধিত হারে বিজ্ঞাপন চলিতে থাকিলে দেশে বিজ্ঞাপন এজেন্সী (Advertising Agency) গঠিত হয় এবং বিজ্ঞাপন কার্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কমব্যয়ে অধিক ফলদায়ক বিজ্ঞাপন দিয়া দেশের নানারূপ উন্নতির সহযোগিতা করে।

শেষত, বিজ্ঞাপনের জগৎ যেহেতু, বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে ও নানারূপ ভাবে নানা শ্রেণীর লোকের আয় বাড়ে এবং বৃহত্তর উৎপাদনের জগৎ দ্রব্যমূল্য কমে—তাই এক কথায় বলা চলে যে, বিজ্ঞাপন জনসাধারণের জীবনযাত্রা মান উন্নততর করিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞাপনে যেমন উপরিলিখিত নানারূপ সুবিধা আছে, উহার আবার নানারূপ অসুবিধাও আছে। নিম্নে বিজ্ঞাপনের অসুবিধা (disadvantages) উল্লেখ করা হইল।

প্রথমত, বিজ্ঞাপন অধিকহারে হইলে শুধু উহা ব্যয়বহুল হয় এবং ফলে দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য না কমিয়া বিজ্ঞাপন-ব্যয়ের জগৎ উহা বাড়িতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপন যদি নূতন চাহিদাসৃষ্টি করিতে না পারে অর্থাৎ, যদি কোন দ্রব্যের বর্তমান চাহিদা নষ্ট করিয়া নিজ দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে তবে সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা একটি অপচয়

(waste)। এইরূপ বিজ্ঞাপনকে ধ্বংসাত্মক (destructive) বিজ্ঞাপন বলা হয়।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপন অনেক সময় অসম্ভব ফল প্রচার করিয়া জনসাধারণের মনে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দেয়। পাজিতে অনেক সময় দেখিবে “মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়”..... ইত্যাদি। মরা মানুষ কি কখনও বাঁচি? চক্চকে টাকে কি কখনও চুল গজায়? তবু বিজ্ঞাপকরা উহার বিজ্ঞাপন দেয়।

চতুর্থত, বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রতারণা করিয়া বিজ্ঞাপন অনেক সময় জনসাধারণের ক্ষতি করে। কোন বিশেষ সাবান ব্যবহার করিলেই কি চিত্রতারকাদের মত সুন্দরী হওয়া যায়? তবু বিজ্ঞাপকরা এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে।

পঞ্চমত, বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বিজ্ঞাপকরা এমন সব পদ্ধতির আশ্রয় লয়, যাহা সমাজের নৈতিক অবনতির জন্ম দায়ী থাকে। অনেক বিজ্ঞাপনেই এমন কুৎসিত ছবি দেওয়া হয়, যাহা সমাজের পক্ষে সর্বদাই বর্জনীয়।

শেষত, বিজ্ঞাপন অনেক সময় মানুষের মনে দ্রব্যের চাহিদার প্রবণতা এমন ভাবে বাড়াইয়া দেয় যে, মানুষ তাহার আর্থিক ক্ষমতার বাহিরেও উহা ক্রয় করে এবং ফলে খণের বোঝা বহন করিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত অসুবিধা থাকিলেও বিজ্ঞাপন ব্যয়কে আমরা অপচয় (waste) বলিতে পারি না। কারণ,

বিজ্ঞাপন—(ক) চাহিদা বৃদ্ধি করে, (খ) উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও উৎপাদনব্যয় ও মূল্য কমায়, (গ) দ্রব্যের উৎকর্ষতা (সুনারের জন্ম) বৃদ্ধি করে, (ঘ) দ্রব্যের গুণাগুণ, ব্যবহার ও মূল্য জনসাধারণকে জানায়, (ঙ) সংবাদপত্রের আয় ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে, (চ) অগ্নাগ্র নানা শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি করে এবং (ছ) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে.....ইত্যাদি।

আবার বিজ্ঞাপন অনেক সময়—(ক) মূল্য বৃদ্ধি করে, (খ) প্রতারণা করে, (গ) ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞাপনের রূপ ধারণ করে.....ইত্যাদি।

তাই বিজ্ঞাপনের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। তবে অসুবিধা হইতে সুবিধাই বেশী বলিয়া এবং বিজ্ঞাপনকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া ও সুন্দরভাবে বিজ্ঞাপনের কার্য চালাইয়া অসুবিধাগুলি দূর করা যায় বলিয়াই এই কথা বলা চলে যে, বিজ্ঞাপন সবদিক হইতেই ফলপ্রসূ (“It



pays to advertise" অথবা বিজ্ঞাপন অপচয় নহে (Advertisement is not a waste)।

এ যাবৎ আমরা বিজ্ঞাপন ও উহার স্ববিধা-অস্ববিধা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম (media for advertisement) সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বর্তমান যুগে চারিদিকে নজর রাখিলে অথবা খবরাখবর রাখিলে আমরা নিম্নলিখিত মাধ্যম (media) লক্ষ্য করিব—

### ১। নমুনা ও দান (Samples and free gifts.)

দ্রব্য প্রস্তুতকারীরা অনেক সময় ঐ দ্রব্য ছোট আকারে সম্ভোগকারীদের মধ্যে নমুনা স্বরূপ বিতরণ করে। এই নমুনা ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের গুণাগুণ উপলব্ধি করা যায় এবং পরে প্রয়োজনবোধে ঐ দ্রব্য সাধারণ আকারে ক্রয় করা চলে। ঔষধ প্রস্তুতকারীরা ডাক্তারদের পরীক্ষার জন্য নমুনা ঔষধ বিতরণ করে। ডাক্তার উহা ব্যবহার করিয়া গুণাগুণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং বোগীদের মধ্যে চালু করে।

অনেক সময় কোন দ্রব্যের সঙ্গে অল্প কোন দ্রব্য দান হিসাবে বিতরণ করিয়া ঐ মূল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। সাবানের সঙ্গে বিনামূল্যে তোয়ালে, বইয়ের সঙ্গে চোখ কাগজ, কলমের সঙ্গে ড্রপার..... ইত্যাদি দান আমবা দেখিয়াছি।

### ২। দ্রব্য সজ্জা (Display)

দোকানের জানালার কাছে কাঁচের আলমারীতে দ্রব্য সকল এমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখা হয় যে, পথিক উহা দেখিবামাত্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রয়েচ্ছু হয়। অধিক পথযাত্রী চলাচল করে এমন পথের পাশে দোকানটি না থাকিলে দ্রব্যসজ্জার কলাফল আশাপ্রদ হয় না। দ্রব্যসজ্জাই বিজ্ঞাপনের সবচাইতে সহজ পন্থা।

### ৩। প্রচার পত্র (Handbill)

ট্রামে-বাসে চলিবার সময় বিভিন্ন জ্যোতিষ সম্রাটের প্রচারপত্র চলন্ত ট্রাম বা বাসের জানালার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বিভিন্ন রাস্তার বিভিন্ন এলাকায় এমন কি গ্রামাঞ্চলেও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এই প্রচারপত্র সংক্ষেপ থাকে—যাহাতে অতি

অল্প সময়েরই ইহার বিষয়বস্তু পাঠ করা যায়। প্রচারপত্রের ফলাফল খুব দীর্ঘ হইয়া থাকে। তাই ইহা পর পর চালাইয়া যাইতে হয়, যাহাতে একদিন না একদিন কাজে আসে।

### ৪। প্রাচীর পত্র (Poster)

প্রাচীরে, লাইটপোষ্টে, গাছে অথবা রাস্তার পীচের উপর বড় অক্ষরে লিখিত বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং ভুলে নষ্ট হইয়া বা অন্য বিজ্ঞাপনে ঢাকা না পড়া পর্যন্ত ইহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচারপত্র হইতে প্রাচীর পত্রের কার্যকারিতা অধিক স্থায়ী।

### ৫। তালিকাবই (Catalogue)

রেকর্ড বিক্রেতার, দড়ি প্রস্তুতকারীরা, পুস্তক প্রকাশকরা, ঔষধ প্রস্তুতকারীরা..... প্রভৃতি নিজ নিজ দ্রব্যসকলের নাম, গুণাগুণ ও মূল্য ছাপাইয়া পুস্তিকার আকারে বিতরণ করে। এই পুস্তিকা বা তালিকাবই আলোচনা করিয়া ক্রেতার কোন দ্রব্য কিনিবে তাহা ঠিক করে। বাটা কোম্পানী তালিকা বইতে জুতার নাম, ছবি, মূল্য ইত্যাদি ছাপাইয়া দেয়। তালিকাবই অনেক দিন গৃহে রক্ষিত হয় বলিয়া ইহা বহুদিন ধরিয়া বিজ্ঞাপনের কাজ করে।

### ৬। মেলা ও প্রদর্শনী (Fairs & Exhibitions)

মেলা বা নানারূপ প্রদর্শনীতে নানা জাতীয় বহুলোকের সমাগম হয়। এই সুযোগে বহুলোকের মধ্যে বিজ্ঞাপনকার্য চালান যায়। মেলা বা প্রদর্শনীতে ষ্টল ভাড়া লইয়া উহাতে দ্রব্য সকল সাজাইয়া বিজ্ঞাপন কার্য চালান যায়। ইহাতে প্রচারকার্য ও বিক্রয় দুইই চলে। আন্তর্জাতিক মেলায় প্রচার কার্যের কার্যকারিতা দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া যায়।

### ৭। সং-এর দল (Band of clowns)

ছোটদের খেলার জিনিস, যেমন—মুখোস, ফাঁকি গোন্ধ ইত্যাদি দ্রব্যের প্রচার সং-এর দলের মাধ্যমে চলে। কলিকাতার রাস্তায় বাঁশের পা সমেত বার ফুট লম্বা একদল লোক নানা পোশাকে শোভাযাত্রা করিয়া যায়। ইহারা এইরূপ পোশাকে কোন এক দ্রব্যের প্রচারকার্য চালাইয়া যায়।

### ৮। সংবাদ পত্র ( News paper )

দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রতিদিনই আমরা বিজ্ঞাপন দেখিতে অভ্যস্ত। দৈনিক সংবাদপত্র বহুলোক পাঠ করে বলিয়া ইহার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক ; তাই ইহার দক্ষিণাও বেশী। আবার, অতীত কাল কল্যাণ পুরাতন হয় বলিয়া এই বিজ্ঞাপন স্বল্পায়ু। মাসিক পত্রগুলি কিছুদিন থাকে বলিয়া ইহার মাধ্যমে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহার আয় অধিক। তবে ইহার বিক্রয় দৈনিক কাগজ অপেক্ষা কম।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে কোন দ্রব্যের প্রশংসা ছাপাইতে পারিলে তাহার ফল খুব বেশী হয়। কারণ, পত্রিকাগুলির সম্পূর্ণ আস্থা থাকে সম্পাদকের মন্তব্যের উপর।

### ৯। সাময়িক ও নিয়মিত পত্রিকা ( Magazine & Periodicals )

বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সম্ভোগকারীদের মধ্যে প্রচারিত বিশেষ সাময়িক পত্র আছে। যেমন ডাক্তারদের জন্ত Medical Journal, কৃষকদের জন্ত কৃষি-বিষয়ক, ক্রীড়াবিদদের জন্ত ক্রীড়াবিষয়ক সাময়িক পত্র আছে। তাই যে দ্রব্য যে শ্রেণীর লোকেব জন্ত বিশেষ করিয়া প্রয়োজন সেই দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত সাময়িক পত্রে হইলেই ভাল। অর্থাৎ ঔষধের বিজ্ঞাপন Medical Journal-এ, ফুটবলের বিজ্ঞাপন Sports & Pasttime-এ এবং কৃষি বীজের বিজ্ঞাপন 'কৃষক' পত্রিকায় দেওয়াই ভাল।

### ১০। সিনেমা স্লাইড ( Cinema Slide )

শহর অঞ্চলের নাগরিকরা প্রায়ই সিনেমা দর্শক। তাই সিনেমার পর্দায় ছবি অথবা লেখা প্রতিফলিত করিয়া প্রচারকার্য চালান যায়।

### ১১। ফিল্ম ( Cinema Film )

বর্তমানে ছোট আকর্ষণীয় গল্পের সিনেমা রূপ ( সবাক অথবা নির্বাক ) দিয়া ইহার মাধ্যমে প্রচারকার্য চালান হয়। কাহিনীটি আকর্ষণীয় হইলে ইহার ফল বেশ কিছুদিন থাকে। সিনেমার মাধ্যমে কোন আকর্ষণীয় চিত্রতারকা দ্বারা কোন বস্তুর উৎকর্ষতা বলাইয়াও বর্তমানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে।

### ১২। রেডিও এবং রেডিও-ভিসন ( Radio and Rodio-vision ).

রেডিও অথবা রেডিও ভিসনের মাধ্যমেও প্রচারকার্য চলিয়া থাকে।

তবে আমাদের দেশে ইহার প্রচলন হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকায় ইহা খুব চলে। সিংহল রেডিওতে ও প্রচার কার্য চলে।

### ১৩। মাল সরবরাহের গাড়ী ( Delivery Vans, Tram and Bus )

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাল নিজ গাড়ীর সাহায্যে বিলি ( delivery ) দেয়, তাহাদের গাড়ীর গায়ে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপনের কথাগুলি লিখিয়া প্রচারকার্য চালান হয়। অল্পরূপ ভাবে মূল্য দিয়া ট্রাম-বাসের গায়েও বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচারকার্য চালান যায়।

### ১৪। আলোক সজ্জা ( Lighting )

শহরের অনেক প্রতিষ্ঠানের বাড়ীর উপরে প্রজ্জ্বলিত বৈদ্যুতিক আলোর মালা দিয়া বিজ্ঞাপনের কথাগুলি ও ছবি ইত্যাদি লিখিয়া বা আঁকিয়া দেওয়া হয়। এই আলোক যদি পুর পর নিভিতে ও জ্বলিতে থাকে তবে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

### ১৫। দেশ ও জনহিতকর কার্য ( Welfare activities )

অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুর্ধোগে ক্ষতিগ্রস্ত জন-সাধারণের সাহায্যে নানা দ্রব্য দান করে। ইহাতে সাহায্য গ্রহণকারীদের তো মন জয় করা যায়ই, জসসাধারণের মনও ইহা দ্বারা জয় করা যায়। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে বহু সপ্তদাগবী প্রতিষ্ঠান দান করিয়াছে; ইহা আমরা খবরের কাগজে দেখিয়াছি। দানের এই সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপা হইবে বলিয়াও অনেক প্রতিষ্ঠান দান করিয়াছে। কারণ, এই দান বিজ্ঞাপনেরই মতন।

### ১৬। হঠাৎ সুযোগ ( Sudden opportunity )

অনেক 'ছাতা' কোম্পানি কতকগুলি কাগজের সানসেড্ তৈয়ারী করিয়া রাখে। ক্রীকেটের চ্যারিটি ম্যাচ হইলে অথবা বড় ক্রীকেট খেলার সুযোগ হইলে অথবা রোদে দাড়াইয়া ঘুড়ি প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটিলে ঐ sun-shed দর্শকদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়—যাহাতে উহা কপালে বাঁধিয়া তাহারা খেলা ইত্যাদি ( চোখে রোদ না লাগাইয়া ) দেখিতে পারে। এইরূপ বিতরণের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বেশ ফলপ্রসূ, কারণ যে সময়ে উহা দেওয়া হয় সেই সময়ে উহার বেশ প্রয়োজন। তাই যাহারা উহা পায় তাহারা মুগ্ধ হয় এবং বিজ্ঞাপকদেরও কার্য সিদ্ধ হয়। এইরূপ বিতরণ বিশেষ সুযোগেই করিতে হয়।

বর্তমান কলা ও বিজ্ঞানের যুগে নানা রকমের বিজ্ঞাপন-মাধ্যম আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা নতুন নতুন অনেক রকম বিজ্ঞাপনই হয়ত দেখিতে পাইব।

আমরা বিজ্ঞাপন দেওয়ার পূর্বে কতগুলি গুরুতর বিষয় মনে মনে রাখিলে বিজ্ঞাপন কার্যকরী নাও হইতে পারে। কি কি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত তাহা আলোচনা করা কর্তব্য।

১। অল্পকথায় সহজভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে। অনেক সময় একটি ছোট শিরোনামা দিলে বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ বাড়ে। যেমন—

**‘অল্প আর মানুষের শত্রু নয়’**

অধ্যক্ষ নারায়ণ শাস্ত্রী ভেবগরত্বের নব আবিষ্কার ‘অল্পকথায়’ হই এক যাত্রা সেবনেই অল্পের হাত হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করা যায়।

প্রাপ্তিস্থান :—

**নবগ্রাম আয়ুর্বেদ কার্যালয়**

৩১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকতা।

২। বিজ্ঞাপনের অঙ্কন অথবা কথাগুলি মানুষের আকর্ষণীয় হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের আবেদন সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। ছবির মাধ্যমে আবেদন করিতে হইলে উপযুক্ত ছবি আঁকিতে হইবে। যেমন, শিশুর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে একটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর শিশুকে তার মায়ের কোলে আঁকিতে হইবে। যে-কোন শিশুর মা ঐ ছবি দেখিলে নিজের শিশুটিকে ঐ বেবীফুড খাওয়াইয়া ঐরূপ স্বাস্থ্যবান করিতে আগ্রহী হইবে। আবার, মৃতসঞ্জীবনের বিজ্ঞাপনে কুস্তির পালোয়ানের ছবি দিলে ভাল হয়।

৪। খরচা কত পড়িবে এবং এই খরচা বিক্রয়ের দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্যের পক্ষে উপযুক্ত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

৫। বিক্রয়ের দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করিতে হইবে। Medical Journal-এ কৃষিক্ষেত্রের বিজ্ঞাপন দিলে কোনই লাভ হইবে না।

৬। বিজ্ঞাপন সময়মত আবর্তন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা কিছুদিন পরে কমিয়া যায়। তাই একবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে যখন উহার কার্যকারিতা কমিয়া আসিবে তখন আবার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

৭। বিশেষ উৎসবের সময়, বিশেষ ঋতুতে, বিজ্ঞাপনের নতুনত্ব করিতে

হইবে। বাটার দোকানে 'পুজার সময়ে, বসন্তকালে ও বর্ষা ঋতুতে প্রতিবৎসর নূতন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পরিমাপের কৌশল করিতে হইবে, নতুবা কি ফলাফল হইল তাহা সঠিক জানা যাইবে না।

৯। বিজ্ঞাপন যাহাতে ধ্বংসাত্মক না হয় তাহা দেখিতে হইবে, কারণ, ইহা সমাজের ও দেশের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয়।

১০। বিজ্ঞাপনে নূতন চাহিদা সৃষ্টিরই প্রয়াস পাইতে হইবে।

আমরা জানি যে, বিজ্ঞাপন দিয়া আমরা বিক্রয় বাড়াইবার চেষ্টা করি কিন্তু বিজ্ঞাপনের উত্তরে যদি জনসাধারণ স্বেচ্ছায় দ্রব্য অধিক ক্রয় না করে তবে আমাদের কিছুই করার নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপক সম্ভাব্য ক্রেতাদের পিছনে এখন নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকে যে তাহার আর না কিনিয়া উপায় থাকে না। যেমন, দমদম কেমিক্যালের অশোকারিষ্টের বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল, কোন ব্যক্তি দমদম কেমিক্যালের নিকট অশোকারিষ্ট সম্পর্কে অহুসন্ধান পত্র পাঠাইল এবং দমদম কেমিক্যাল উহার উত্তর দিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কোনই অর্ডার দিল না। তখন দমদম কেমিক্যাল অশোকারিষ্টের বিস্তৃত গুণাগুণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে আবার পত্র দিল। পরে আবার বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশংসাপত্রের কপি দিয়া দিল। প্রকৃত অর্ডারের উপর উপযুক্ত কমিশনেরও উল্লেখ করিল। প্রতি চিঠির সঙ্গে এমন অর্ডার ফরম পাঠান হইল যাহাতে কোন ডাক চিকিট লাগে না,.....এইরূপ বার বার পত্র দিলে ক্রেতা চক্ষুজ্বালায় পড়ে এবং অর্ডার দিয়া ফেলে। এইরূপ ভাবে সম্ভাব্য ক্রেতার পিছনে লাগিয়া থাকাকে অনুসরণ পদ্ধতি বা Follow up System বলে।

আমরা পূর্বের আলোচনায় বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম (media) উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ মাধ্যম কোন্ বিশেষ বিজ্ঞাপকের পক্ষে সুবিধা হইবে তাহা তাহার পক্ষে জানা কর্তব্য; কারণ সবগুলি মাধ্যমে একসঙ্গে ব্যবহার করিতে অস্বাভাবিক ব্যয় হইবে এবং উহা করা যুক্তিযুক্তও নহে। উপরন্তু কোন বিশেষ মাধ্যমেরও বিভিন্ন শাখা আছে; যেমন, আমরা যদি ঠিক করি যে দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিব তাহা হইলে আমাদের আবার ভাবিতে হইবে যে আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, বিশ্বামিত্র.....ইত্যাদির কোনটায় দেওয়া হইবে।

তাই আমাদের জন্য একটি উপায় বাহির করিতে হইবে যাহাতে আমরা সবচেয়ে বেশী ফলগ্রস্থ মাধ্যমটি অথবা কোন মাধ্যমের সবচেয়ে বেশী ফলগ্রস্থ শাখাটি নিরূপণ করিতে পারি। এই উপায় বা পদ্ধতিটিকে ইংরেজীতে Keying in Advertisement বলা হয়। বাঙালীয় অনেকে ইহাকে ‘সূত্রসন্ধানী কৌশল’ বলেন। এই উপায়কে সাধারণ ভাবে ‘বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কার্যকারিতা নিরূপণ পদ্ধতি’ বলা যাইতে পারে।

কয়েকটি মাধ্যমের মধ্যে কোন মাধ্যমটির কার্যকারিতা সর্বাধিক, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে উহার প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে এবং প্রতিটি মাধ্যমের কার্যকারিতা আলাদা ভাবে নিরূপণ করিতে হইবে এবং যে মাধ্যমটির কার্যকারিতা সর্বাধিক হইবে, ভবিষ্যতে তাহাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতায় প্রতিটি মাধ্যমের কার্যকারিতা পরিমাপ করা সম্ভব :—

১। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনের সহিত অনুসন্ধানপত্র, উপপত্র বা আবেদন পত্রের ফরম দিয়া দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে অনুসন্ধানপত্র, অর্ডার ইত্যাদি আসিবে তাহার ফরমগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে কোন বিজ্ঞাপনের উত্তরে উহা আসিল। এইভাবে প্রতিটি মাধ্যমের কার্যকারিতা পরিমাপ করা সম্ভব।

২। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে নিজ ঠিকানা না দিয়া বন্ধনম্বর দিলে বিভিন্ন বন্ধনম্বরে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের উত্তরগুলি জমা হইবে। উহা হইতে প্রতিটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমের কার্যকারিতা পরিমাপ করা যাইবে।

৩। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে নিজ ঠিকানা দিয়া শুধু ঠিকনার পরে বিভিন্ন সেকসনের নাম উল্লেখ করিলে প্রতিটি সেকসনের নামে যে উত্তর আসিবে উহাব সাহায্যে এক-একটি বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যাইবে। যেমন, অমৃতবাজারে ঠিকানা দেওয়া হইল—Cico Ltd. 34, Chowringhee, ‘A’ section ; যুগান্তরে ঠিকানা দেওয়া হইল—Cico Ltd. 34, Chowringhee ‘B’ Section.। এখন ‘A’ সেকসনের নামে এবং ‘B’ সেকসনের নামে যে উত্তর আসিল উহাব সাহায্যেই যথাক্রমে অমৃতবাজার ও যুগান্তরের বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যাইবে।

৪। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনের উত্তর দাতাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম উল্লেখ করিয়া পত্র দিতে অনুরোধ করিলে যে উত্তর পাওয়া যাইবে

তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, উত্তরদাতা কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখিয়া উত্তর দিয়াছেন। এইরূপেও মাধ্যমের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যায়। তবে উত্তরদাতা অনেকসময় অনুরোধ সত্ত্বেও 'মাধ্যম' উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যান, তাই এই পন্থায় ফলাফল সঠিকভাবে নিরূপণ করা অনেকসময় সম্ভব হয় নাই।

• অনেকসময় একই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নানারূপ ভাষা বা রূপকের পরিবর্তন করিয়া প্রতিটি ভাষার বা রূপকের কার্যকারিতা নিরূপণ করিতেও 'keying' ব্যবহার করা হয়। সিনেমা ফিল্মে লাইফবয়, সাক' বা লাক্স সাবানের গল্প নানারূপে বদলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমটি (অর্থাৎ সিনেমা ফিল্ম) একই থাকে কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু বদলাইয়া দেওয়া হয়। প্রতিটি গল্পের ফিল্মের কার্যকারিতা keying-এর সাহায্যে নিরূপণ করা যায়।

### বিক্রয়দক্ষতা বা বিক্রয় কলা (Salesmanship)

"Salesmanship is the ability to Persuade people to want what they need" or Salesmanship is "the art of satisfying the need of the customer with goods and services thereby establishing continuous relations between buyer and seller"

অর্থাৎ

মানুষের যাহা প্রয়োজন তাহা তাহাদের দ্বারা ক্রয় করাইবার ক্ষমতাকে বিক্রয়দক্ষতা বা বিক্রয়-কলা বলা হয়। অথবা, দ্রব্য বা সেবাদ্বারা ক্রেতার প্রয়োজন মিটাইয়া ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে অবিরাম লাভজনক সম্পর্ক স্থাপনের নৈপুণ্যকে বিক্রয়দক্ষতা বা বিক্রয়-কলা বলা হয়।

উপরের সংখ্যা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, বিক্রেতা (Salesman) নিজ কৌশলে মানুষকে তাহার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করাইয়া ক্রেতার রূপান্তরিত করে। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার (Seller) মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। Stephenson-এর মতে স্বযোগ্য বিক্রেতা (Salesman) তাহার মালিক এবং ক্রেতা উভয়কেই সাহায্য করে—ক্রেতাকে নানারূপ বুদ্ধি দিয়া তাহার দ্রব্য নির্বাচনে সাহায্য করে এবং তাহার মালিককে (অর্থাৎ Seller) সাহায্য করে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া।



প্রত্যেক উৎপাদনকর্তা তার দ্রব্য উৎপাদন করিয়া চাহিদার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, বিক্রেতা (Salesman) এই দ্রব্যের গুণাগুণ, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্ভাব্য ক্রেতাকে ব্যক্তিগতভাবে জানাইয়া তাকে দ্রব্য কিনিতে প্রলুব্ধ করে। এইরূপ ভাবে চাহিদার সৃষ্টি করা হয় এবং দ্রব্য বিক্রয় সম্পাদিত হয়।

তাই, বিক্রেতা (Salesman) বিক্রয়দক্ষ হইলে তাহার মালিককে (Seller) দ্রব্য লইয়া চাহিদার অপেক্ষায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় না এবং ক্রেতারও সাহায্য হয় তাহার প্রয়োজন অল্পযায়ী উপযুক্ত দ্রব্য নির্বাচনে। বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকসময় চাহিদা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেক সময় আবার সম্ভাব্য ক্রেতাকে যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইলে শুধু বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহাকে ক্রয়ে প্রলুব্ধ করা যায় না। তাই বিক্রেতা বা Salesman-এর কার্য ব্যবসায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিক্রেতা বা Salesman নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করিয়া ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রয়কারীকে (Seller) সাহায্য করে

(ক) বিক্রেতা (Salesman) ব্যক্তিগত প্রচার কার্য (Personal advertisement) করিয়া পণ্যের সহিত সম্ভাব্য ক্রেতার পরিচয় করাইয়া দেয়। প্রয়োজন হইলে অনেকক্ষেত্রে সে পণ্যের নমুনা লইয়া যায় এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে উহা বিতরণ করে।

(খ) বিক্রেতা ক্রেতার প্রয়োজন কৌশলে জানিয়া যুক্তিতর্ক দিয়া নিজদ্রব্য ক্রেতার প্রয়োজনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিয়া ক্রেতাকে ক্রয় করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

(গ) বিক্রেতা (Salesman) পণ্যের গুণাগুণ ও উৎকর্ষতা প্রচার করিয়া ক্রয়ের চাহিদা সৃষ্টি করেন।

(ঘ) বিক্রেতা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করে।

(ঙ) বিক্রেতা ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের দ্রব্য নির্বাচনে সাহায্য করেন। অনেক সময় ক্রেতা তাহার প্রয়োজন বোধে কিন্তু নির্বাচনে অসুবিধা বোধ করে। তখন সেলসম্যান তাহাকে সাহায্য করে। যেমন, এক ব্যক্তি বিবাহের উপহারের জন্য একখানা শাড়ী কিনিতে চাহে, কিন্তু কি শাড়ী এবং কি রং-এর শাড়ী কিনিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছে না। এই

সেলসম্যান তাহার সজ্জিত, কনের গায়েন্দা ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া পাড়ী নির্বাচনে সাহায্য করে।

(৫) বিক্রেতা (Salesman) ক্রেতার সহিত আন্তরিক এবং সৌজন্যপূর্ণ কারিয়া ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill of the organisation) বৃদ্ধি করে।

(৬) বিক্রেতা (Salesman) তাহার নিজ সামাজিক প্রতিপত্তিও বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে নির্দোষ ভাবে কাজে লাগায়।

সেলসম্যানের উপরিলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হইলে তাহাকে কতকগুলি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। এই গুণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

১। মাল্যবর্ধনের ঠিকানা সহজেই ধরিতে পারা চাই।

২। ক্রেতার আন্তরিকতাপূর্ণ ও সৌজন্যপূর্ণ হওয়া চাই।

৩। ক্রেতার ভাষা মার্জিত ও বিনয় মিশ্রিত হওয়া চাই।

৪। ক্রেতার বিরক্তি ইত্যাদি বর্জন করিয়া অধ্যাবসায় অর্জন করা চাই।

৫। ক্রেতার আকর্ষণীয় চেহারা ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ থাকা চাই।

৬। যে পণ্য সে বিক্রয় করিবে সে সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই এবং ক্রেতাকে গুণাগুণ গুলি সুন্দর ভাবে গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাহার থাকা চাই।

৭। তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা থাকা চাই।

৮। তাহার একাধিক ভাষা আয়ত্তে থাকা চাই।

৯। তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা চাই, এবং—

১০। তাহার সততা ও নিষ্ঠা থাকা চাই এবং প্রতিযোগী ব্যবসায়ের প্রতি ধ্বংসাত্মক আচরণ বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

আমরা সাধারণ ভাবে বিক্রেতা বা সেলসম্যানের কার্যাবলী ও গুণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু, সেলসম্যানেরও বিভিন্ন শ্রেণী আছে; যেমন—(১) খুচরা দোকানের সেলসম্যান, (২) বৃহৎকারবারের ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান (ইহাদিগকে Travelling Sales-representative বলে) এবং (৩) ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কারী সেলসম্যান। ইহাদের প্রত্যেকের কাজ একরকম হইতে পারে না। খুচরা দোকানের সেলসম্যান আগন্তুক ক্রেতাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দেখায়, প্রতিটি পণ্যের বিশেষ গুণাগুণ বর্ণনা করে, ক্রেতাকে পণ্য নির্বাচনে সাহায্য করে এবং বিক্রয়

সম্পাদন করে। বিক্রয় কালে নমস্কার জানাইয়া পুনরায় আর্থিক অবস্থা জানায়।

বৃহৎ কারবারের ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান শুধু বিভিন্ন সন্তোগকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন চালাইয়া অর্ডার দিয়া জানায়। সরাসরি বিক্রয় ব্যাপারে সে অংশ গ্রহণ করে না।

ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কারী সেলসম্যান নিজেই দ্রব্য বহন করিয়া বিক্রয়ার্থে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। সন্তোগকারীর নিজ বাড়ীতেই বিক্রয় সম্পাদিত হয়। ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানরা সবসময়েই যে পণ্য বিক্রয় করে তাহা নহে। অনেক সময় তাহারা অদৃশ্য সামগ্রীও বিক্রয় করে; যেমন—লটারীর টিকিট (ইহা অদৃশ্য সামগ্রী এই অর্থে যে লটারীতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগটাই আসল, টিকিটটা শুধু অধিকারের প্রতীক, নীমাচুক্তি, প্রদর্শনীর প্রবেশপত্র..... ইত্যাদি।

### EXERCISE

1. What is advertisement? What are the different kinds of advertisement?

বিজ্ঞাপন কি? কি কি বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন হয়?

2. Explain the Advantages (usefulness) of advertisement in modern times.

বর্তমান যুগে বিজ্ঞাপনের সুবিধা (কার্যকারিতা) ব্যাখ্যা কর।

3. What is Publicity? How does it differ from advertisement?

প্রচারকার্য কি? বিজ্ঞাপন হইতে ইহা কি ভাবে স্বতন্ত্র?

4. What are the disadvantages of Advertisement? Is advertisement a waste?

বিজ্ঞাপনের অসুবিধা কি? বিজ্ঞাপন কি শুধুই অপচয়?

5. Describe the Various media of Advertisement.

or

What various methods of advertisement are usually adopted.

বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম বর্ণনা কর।

৬. বিজ্ঞাপনের কি কি বিভিন্ন পদ্ধতি সাধারণত অবলম্বন করা হয়?

What points you would bear in mind while going to advertise ?

বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে কি কি বিষয় স্মরণ রাখিবে ?

How the usefulness of a media of advertisement is measured ?

or

Describe the methods of Keying in advertisement.

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কার্যকারিতা কি ভাবে নিরূপণ করা যায় ?

অথবা

বিজ্ঞাপন, সূত্রসম্বন্ধী কৌশলগুলি বর্ণনা কর।

8. Write notes on—

(i) Follow up in advertisement.

(ii) Keying in advertisement.

নী লিখ :—

১। বিজ্ঞাপনে অনুসরণ পদ্ধতি।

২। বিজ্ঞাপনে সূত্র সম্বন্ধী কৌশল।

9. What is Salesmanship ?

বিক্রয় দক্ষতা কি ?

10. What are the functions of a Salesman ?

বিক্রেতার (সেলসম্যান) কি কি কার্য ?

11. What qualities should be possessed by a good Salesman ?

ভাল সেলসম্যানের কি কি গুণ থাকা উচিত ?

12. What different kinds of Salesman we usually find ?

কি কি বিভিন্ন প্রকারের সেলসম্যান সাধারণত দেখা যায় ?

---

## পঞ্চম অধ্যায়

### সরকার ও বাণিজ্য-জগৎ

### State and Business-World

পৃথিবীর বিভিন্ন কার্যাবলী এক সময় খুব সহজ ও সরল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলিত, কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কার্যকলাপের মধ্যে বহু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। সভ্যজগতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রতিটি দেশে একটি সরকার আছে। কিন্তু প্রাচীন কালে সরকারের দায়িত্ব ছিল সামান্য। তখন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা ছিল না বলিয়া সরকারী কার্যও ছিল সহজ ও সরল। তখন দেশরক্ষা, অপরাধীর বিচার, ধর্মরক্ষা, নাগরিকের সম্পত্তিরক্ষা, অপরাধের সহিত সংস্পর্ক এড়াই রাখা ইত্যাদি ছিল সরকারের প্রধান কর্তব্য।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ছিল নিবিরোধ (Laissez faire policy)। তখন বাণিজ্যে জটিলতা ছিল না বলিয়া সরকারে হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-জগতে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় সরকারের নীতি আর নিবিরোধ রহিল না। প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যেই বর্তমানে সরকারের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বিশেষ করিয়া ভারত—যেখানে রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক (Welfare State) এবং যেখানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য সমাজ-তাত্ত্বিক রূপ গ্রহণ, বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ এখানে বিশেষমাত্রায় কাম্য। সরকার বাণিজ্যজগতে নিম্নলিখিত ধরনে বা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন :—

১। শিল্পনীতি গ্রহণ করিয়া দেশের শিল্পের অগ্রগতির দিক নির্দেশ।

২। শিল্প-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ।

৩। শিল্প-বাণিজ্য জাতীয় করণ।

৪। বেসরকারী সংস্থার সহিত প্রতিযোগিতামূলক সহ অবস্থান।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারিত করণ।

৬। স্বল্প উৎপাদনের সুবণ্টন।

৭। শিল্প-বাণিজ্যে বেসরকারী উদ্যমকে আর্থিক ও অসুপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহদান।

৮। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের সাহায্যে শিল্পের নানাবিধ সহায়তা  
সহায়দান এবং নিয়ন্ত্রণ।

রোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা বর্তব্য।

### ১। শিল্পনীতি গ্রহণ

প্রত্যেক দেশেই শিল্পের গঠন ও উন্নতি এবং পুঁজুতন শিল্পের প্রসার সম্পর্কে কতকগুলি নীতি সরকার গ্রহণ করিয়া থাকে। যদিও প্রাচীনকালে সরকারী নীতি ছিল নির্বিবোধ। কিন্তু বর্তমান যুগে শিল্পনীতি ছাড়া সর্বাঙ্গীণ শিল্পোন্নতি প্রায় অসম্ভব। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতের শিল্পনীতি উদাসীন ও নির্বিবোধ। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সনে ও ১৯৫৬ সনে দুইটি শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১৯৫৬ সনের শিল্পনীতি বলবৎ আছে। এই নীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রত্যেকটি ভাগের শিল্পগুলির উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। এই নীতিতে অগ্রান্ত বিষয়গুলি যথা—শিল্পকে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য দান, আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পের বণ্টন, ক্ষুদ্র ও গ্রাম শিল্পে সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন এবং শিল্পের শান্তি (Industrial peace) ইত্যাদি সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্পগুলিকে তিনটি ভাগে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে :

**প্রথম ভাগ—**এইভাগে ১৭টি শিল্পের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল, ভারী যন্ত্রপাতি, বিমান পোঁত ও পরিবহণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, আনবিক শক্তি উৎপাদন এবং দেশরক্ষা ও সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শিল্পের উন্নতি ও পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। বর্তমানে এই শিল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পরিচালনায় পূর্ব হইতে আছে। এইগুলিকে এইভাবে বর্তমানে থাকিতে দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হইবে। কিন্তু এই শিল্পের মধ্যে নতুন কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পর্যায়ে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হইবে না। এই বিভাগের ১৭টি শিল্পের নাম Schedule A-তে উল্লেখ করা হইয়াছে।

**দ্বিতীয় ভাগ—**অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, সড়কপরিবহণ (Road transport), প্লাস্টিক, রং, আলুমিনিয়াম, রোগের জীবাণুনাশক ঔষধ, যেসিন টুলস ইত্যাদি ১২টি শিল্পের নাম schedule B-তে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই

শিল্পগুলিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি অবস্থান করিবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য দেওয়া হইবে, অথবা প্রয়োজনবোধে সরকার উহার যে-কোনটাকে জাতীয়করণও করিতে পারিবে।

**তৃতীয় ভাগ**—এই বিভাগে অবশিষ্ট শিল্পগুলি থাকিবে—এই বিভাগে সেই সমস্ত শিল্পগুলি থাকিবে—যাহাদের নাম প্রথম দুই বিভাগে উল্লেখ করা হয় নাই। এই বিভাগের শিল্পগুলির উন্নতি ও গঠন বেসরকারী পর্ষায়ে থাকিবে, তবে শিল্পনীতিতে পরিস্কারভাবে সরকার এই বিভাগেরও যে-কোন শিল্পকে সরকারী পর্ষায়ে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। ইহাও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিভাগগুলিতে কোন কঠোরতা (rigidity) নাই। যে-কোন বিভাগে সরকার প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং যে শিল্প বর্তমানে বেসরকারী পর্ষায়ে আছে সরকার নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার ১৯৫৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক এই নীতি ঘোষিত হয়। এই নীতির বৈশিষ্ট্য শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর সরকারী হস্তক্ষেপ সমাজতান্ত্রিক রূপের ইহা একটি প্রয়োজন।

## ২। শিল্পবাণিজ্য প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ

বর্তমান যুগে অনেক সরকারই সম্পূর্ণভাবে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত করে। মোভিয়েত দেশে সব শিল্পবাণিজ্য সমাজতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমানে নতুন শিল্পগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত হয়। ভারতবর্ষে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই কোন কোন শিল্প, যেমন—গোলাবারুদ, ডাক-তার, উড়োজাহাজ, আণবিক শক্তি, ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীন। আবার অনেক শিল্প, যেমন—বস্ত্র, চিনি, কাগজ ইত্যাদি শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে। শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের জ্ঞাত নির্ধারিত শিল্পগুলির নাম Schedule A-তে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে ১৭টি শিল্পের নাম আছে।

## ৩। শিল্পবাণিজ্য জাতীয়করণ (Nationalisation)

দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি ও জনকল্যাণকর শিল্পগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেক দেশেই এই শিল্পগুলিকে সরকার

৬.

রী প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে জাতীয়করণ করি' লয়। এইরূপভাবে  
করণ আমাদের দেশেও দেখা যায়....যেমন, জীবন-বীমা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক,  
ইন্সুরেন্স ব্যাঙ্ক...ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয়করণের কতগুলি সুবিধা ও  
অসুবিধা রয়েছে। তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

### জাতীয় করণের সুবিধা :—

ক। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থের পবিত্রের সামগ্রিকভাবে জন-  
স্বার্থ দেখে।

খ। সরকারের আয়ত্তে আনিলে শিল্পগুলি সম্প্রসারিত হয় এবং প্রাকৃতিক  
সম্পদ (natural source) ও শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার হয় এবং ইহাতে  
শ্রমিকশোষণ হয়।

গ। রাষ্ট্রের হাতে আসিলে শিল্পগুলি গবেষণার মাধ্যমে উন্নতিমূলক  
পরিবর্তন হইতে পারে।

ঘ। রাষ্ট্রীয় শিল্পের সবগুলি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হইলে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে  
প্রাত্যেগিক মূলক অপচয় দূর হয়।

ঙ। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের উদ্দেশ্য লাভ অর্জন করা নয় বলিয়া জনসাধারণ  
কম মূল্যে ঐ শিল্পের উৎপাদন ভোগ করিতে পারে।

চ। রাষ্ট্রীয় শিল্পে কিছু মুনাফা হইলে উহা জনসাধারণের স্বার্থেই  
অন্যভাবে ব্যয় হয়।

ছ। রাষ্ট্রীয় শিল্পে জনসাধারণের আস্থা থাকে বলিয়া শিল্প ক্ষতি প্রসার  
লাভ করে।

জ। যে সমস্ত শিল্পে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন, তাহা রাষ্ট্রের  
আয়ত্তে আনা উচিত। তাহাতে ঐ শিল্পগুলি প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা  
বাড়ে।

ঝ। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প হুঃসময়েও জনস্বার্থের জগুই মজুর ছাটাই বিশেষ  
করেনা। ইহাতে দেশের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়।

ঞ। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে পররাষ্ট্রের সহযোগিতা সহজেই লাভ করা যায়।

ট। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের উৎপাদনের মান উন্নত হয় বলিয়া উহা বিদেশে  
রপ্তানিও অধিক হয়ও, কারণ বিদেশীরা বিনাধিমায়ে উহা কিনিতে পারে।

### জাতীয়করণের অসুবিধা :—

(ক) অনেক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে পরিচালনার ত্রুটি দেখা যায়। ইহা  
ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবের জগুই হ'



(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকেনা।<sup>১</sup> এটি উহাদের দক্ষতা হ্রাস পাইতে থাকে।

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে প্রত্যেকেই কর্মচারী, তাই শ্রমিক-মালিক পরিবর্তে অনেক সময় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

(ঘ) সরকারী শিল্পে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আদেশটি অনেক হাত ঘুরিয়া আসে বলিয়া সময় নষ্ট হয় এবং অনেক সময় ইহার জ্ঞাত কাজ পণ্ড হয়।

(ঙ) দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি বেসরকারী শিল্পে তুলনায় সরকারী শিল্পেই অধিক দেখা যায়।

(চ) গবেষণা ও অধিক মূলধন নিয়োগের অবকাশ সরকারী শিল্পে সত্য, কিন্তু অধিকক্ষেত্রেই ইহাতে অপচয় হইতে দেখা যায়।

৪। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতামূলক সহ-অবস্থান।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই দেখা যায় বলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন অনেক সময় বাঞ্ছনীয়। তাই শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব না করিয়া উহার কতগুলি প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে এবং কতগুলি প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সংস্থার হাতে থাকে। এই পদ্ধতিকে “মিশ্র অর্থনীতি” (Mixed Economy) বলা হয়। ইহার সুবিধা এই যে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় উহাদের দক্ষতা বাড়িতে থাকে, উপরন্তু কাম্যস্থলে বেসরকারী উদ্যোগের অভাব দেখিলে সরকারী উদ্যোগে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়। ইহাতে জ্ঞাত শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপ সহজেই দেওয়া যায়।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রসারিতকরণ।

সরকার সবক্ষেত্রেই বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পাওনা-দেনা মিটাইবার জন্ত সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বাণিজ্য উদ্ভূতের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের সহিত আমদানি এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে কাম্যস্থলেই ব্যয় হয় তাহার জ্ঞাত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের Exchange Control বিভাগ খোলা হয়। রপ্তানি এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণের ও প্রসারের জ্ঞাত ৩টি পরিষদ ভারতে গঠন করা হয়—

### (ক) রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (Export Advisory Council) :—

পরিষদের কার্য রপ্তানির উন্নতিবিধান করা। রপ্তানির স্বযোগস্বাবধা কোন এবং কি ভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং উহা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এই সুপারিশ অস্থায়ী সরকার প্রতি ছয় মাস অন্তর রপ্তানির অহুমতি দিয়া থাকেন। ভারতের ‘রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ’ কুড়ি জন বেসরকারী সদস্য লইয়া গঠিত।

### (খ) আমদানি উপদেষ্টা পরিষদ (Import Advisory Council) :—

আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই পরিষদ সরকারকে উপদেশ দেয়। এই উপদেষ্টা পরিষদ অস্থায়ী ছ’মাস অন্তর আমদানী নীতি পরিবর্তন করা হয়।

ত রপ্তানী ও রপ্তানী নীতি অস্থায়ী আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে ডার’ চীফ কন্ট্রোলার অব একস্পোর্ট্ এণ্ড ইম্পোর্ট্ (Chief Controller of Exports and Imports) আমদানি ও রপ্তানির অহুমতি দিয়া থাকেন।

### (গ) রপ্তানি উন্নয়ন পরামর্শ কমিটি (Export Promotion Advisor. Committee) :—

এই কমিটির কার্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করা এবং তাহাদের সুপারিশ সরকারকে পেশ করা।

উপরিউক্ত পরিষদ ও কমিটি ছাড়া সরকার বিভিন্নভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে শিল্পকে সাহায্য করে, যেমন,—

রপ্তানী বাণিজ্য ঝুঁকি বিমা কর্পোরেশন (Export Risk Insurance Corporation) গঠিত হইয়া রপ্তানী বাণিজ্যে রপ্তানিকারকের ঝুঁকি লাঘব করে। রপ্তানী বাণিজ্য ইহার জ্ঞান প্রসারলাভ করে।

### শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) :—

শুল্ক কমিশন আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের শুল্কের হার নির্ধারণ করে। দেশীয় কোন শিল্পের সংরক্ষণ (Protection) প্রয়োজন হইলে শুল্ককমিশন শুল্কহারের মাধ্যমে উহাকে সংরক্ষিত করে। শুল্কহারের পরিবর্তনের মাধ্যমেও আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ও দিক পরিবর্তন সম্ভব।

সরকারী বিভিন্ন বিভাগের উপর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা ও

প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে ব্যবহার ভার দেওয়া আছে। এই প্রদর্শনীগুলির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের উৎপাদনগুলির সহিত বিদেশের পরিচয় ঘটে এবং ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। সরকার নিজ দেশেও আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন করে। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের উৎপাদনগুলি সহিত আমাদের পরিচয় হয়। ইহাতে আমাদের শিল্প অঙ্কুরণে সুবিধা হয় এবং আমদানী দ্রব্য বাছাই করিতেও সুবিধা হয়।

### ৬। স্বল্প উৎপাদনের সুবণ্টন,

প্রায় প্রত্যেক দেশেই কতগুলি জিনিসের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম হয়। যেমন, আমাদের দেশে বর্তমানে টিন, পেন্সিল, ইলেকট্রিক পাওয়ার ইত্যাদি স্বল্প উৎপাদন দ্রব্য। কিন্তু এই স্বল্প উৎপাদন দ্রব্যগুলি শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ প্রয়োজন, তাই সরকার এই দ্রব্যগুলির বণ্টন যত্নবদ্ধ করে। শিল্প বাণিজ্য ও জনসাধারণের মধ্যে উহা এমন ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে দেশের সবচেয়ে বেশী উপকার হয়। যেমন, শিল্প ও কৃষকপূর্ণ কাজের জন্য সিমেন্ট যথাসীম দেওয়া হয়। আবার, যে কাজের গুরুত্ব তেমন বেশী নয়, তাহার জন্য কিছু পরে সিমেন্ট দেওয়া হয়। এক্ষেপে ভাবে কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া স্বল্প উৎপাদন দ্রব্য ভোগকাবী শিল্পের মাধ্যমে সরকার বণ্টন করিয়া দিয়া শিল্পকে সাহায্য করে।

আবার, যে শিল্প এই স্বল্প উৎপাদন দ্রব্য উৎপন্ন করে গাহারা যদি জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিতে যায় তবে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং ফলে বণ্টনব্যাপারে ঐ শিল্পকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই অসুবিধার হাত হইতে সরকার তাহাদিগকে মুক্তি দেয়।

### ৭। বেসরকারী উত্তমকে আর্থিক ও অগ্রপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান।

প্রত্যেক দেশের সরকারই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বাঞ্ছনা করে। যে দেশে ‘মিশ্র অর্থনীতি’ (Mixed Economy) গ্রহণ করা হয়, সে দেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও দেশের উন্নতির জন্য দায়ী থাকে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক ও অগ্রপ্রকার সাহায্য দিয়া সরকার তাহাদেব নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করে; কারণ, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে না, আবার শিল্পব্যাঙ্ক ও প্রায় দেশেই অধিক নাই।

ত রতবর্ষে বেসরকারী শিল্পকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দানের ক্ষমতা কতগুলি সংস্থা আছে তাহাদের উল্লেখ নিম্নে করা হইল :

(১) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ( Industrial Finance Corporation ) :—দশ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন ( Authorised Capital ) লইয়া ইহা ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। ইহার শেয়ারগুলি রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড (scheduled) ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সরকারের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। যৌথ কোম্পানি, অংশীদারী কারবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক সাহায্য দান কবাই ইহার কর্তব্য। নগদ ঋদান, ঋণ-পত্র ক্রয় অথবা ঋণের জামিন হওয়ার মাধ্যমে এই সংস্থা শিল্পকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। যে সমস্ত বড় শিল্পের স্বার্থে সাহায্য করা উচিত, সেইগুলিকেই সাহায্য দেওয়া হয়।

(২) স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন ( State Finance Corporation ) :—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন যখন স্থাপিত হয় তখন আশা করা হইয়াছিল যে, উহা সর্বজাতীয় শিল্পকেই সাহায্য দান করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহা বৃহদায়তন শিল্পের চাহিদাই মিটাইতে পারিতেছিলনা বলিয়া ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের সাহায্যার্থে ১৯৫১ সালে State Finance Corporation Act নামে একটি আইন পাশ করিয়া প্রত্যেক স্টেটে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনটি ১৯৫৪ সালে ২ কোটি টাকা মূলধন লইয়া স্থাপিত হয়। আইনত উহার শেয়ারের শতকরা ৭৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইবে এবং শতকরা ২৫ ভাগ শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা চলিবে।

মধ্যম আকারের শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ( Medium Scale and Small Scale Industries ) সাহায্য দানই স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রধান কর্তব্য।

(৩) ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ( National Small Industries Corporation ) :—১৯৫৫ সালে ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ইহা গঠিত হয়। ইহার কার্য ছোট শিল্পগুলিকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যদান ও বিক্রয় ব্যাপারে সহায়তা করা। যে শিল্পের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার বেশী নহে তাহারা ইহার সাহায্য পাইবে।

আবার, যে সমস্ত শিল্প শক্তি (power) ব্যবহার করে তাহাদের বর্গসারীর সংখ্যা ৫০ জনের কম এবং যে সমস্ত শিল্প শক্তি (power) ব্যবহার করে না তাহাদের কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জনের কম হইলেই তাহারা গ্রাম - , ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের সাহায্য পাইবে। বৃহৎ শিল্পের সচিব এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সহযোগিতা স্থাপন কর', ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট (Industrial Estate) তৈয়ার করা এবং ছোট শিল্পের জন্ত সরকারী অর্ডারগুলি সংগ্রহ করা ইহার অন্যান্য কাজ। ইহাদিগকে ভাড়াপরিদ (Hire purchase) চুক্তিতে যন্ত্রপাতিও এট কর্পোরেশন দিবে। এই কর্পোরেশনের সমস্ত মূলধনই সরকার দিবে।

(৪) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভস্ (Industrial Co-operatives) :—ভারতবর্ষে ছোট শিল্পের প্রসারের জন্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভস্ এর দায়িত্ব অনেক। ত্রিশ হাজারের বেশী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভস্ ভারতে এযাবত স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের জন্ত সরকার সাহায্য যোগানেব জন্ত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন স্টেটে স্থাপিত হইছে। ছোট শিল্পকে ঋণ দিলে যদি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হয়, তবে উহার শতকরা ৯০ ভাগ সরকার পূর্বণ বঝিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এইভাবে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক মারফত প্রদত্ত সরকারী ঋণের সুদ মাত্র ২½%।

#### (৫) গ্রাম ও কুটার শিল্পের বিভিন্ন বোর্ড :

(ক) স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড (Small Scale Industries Board) :—কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি লইয়া ১৯৫৪ সালে এই বোর্ড স্থাপিত হয়। কুটার শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন বোর্ডের কার্যেব মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা ইহার কাজ।

(খ) অল ইণ্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস্ বোর্ড (The All India Handicrafts Board) :—তাঁত, চীনা মাটি, খেলনা, বেতের দ্রব্য ইত্যাদি প্রায় ৪০টি হস্তশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্ত এই বোর্ড ১৯১২ সালে স্থাপিত হয়। এই শিল্পগুলির সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিবে তাহা স্থির করা, রাজ্য সরকার কিভাবে শিল্পগুলির উন্নতি করিবে তাহার পরামর্শ দেওয়া এবং বিভিন্ন স্থানে কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এই বোর্ডের প্রধান কাজ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ইণ্ডিয়ান হ্যান্ডি-

ক্রাফটস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ( প্রাইভেট ) লি: নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। ইহার উদ্দেশ্য হস্তশিল্পের দ্রব্যের শান উন্নত করিয়া বিদেশে উহার চাহিদা বাড়ানো।

(গ) **ল ইণ্ডিয়া খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board) :**—খাদি ও নয়টি গ্রাম-শিল্পের উন্নতির জন্ত ১৯৫৩ সালে এই বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে এই নামে একটি কমিশনও গঠিত হয়, এই কমিশনের ক্ষমতা বোর্ডের ক্ষমতা হইতে অনেক বেশী। বোর্ড শুধু পরামর্শদাতা রূপে বর্তমানে কাজ করে। তবে উভয়ের কার্যই একসঙ্গে চলিয়া থাকে।

(ঘ) **দি সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড (The Central Silk Board) :**—সিল্ক শিল্পে এত তুর্ভাব চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া সিল্ক বয়ন পর্যন্ত কার্যের উন্নতি বিবেচনা করিয়া প্রথম ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড স্থাপিত হয়। পরে অধিকতর ক্ষমতা ও বাধের দায়িত্ব এবং বেশী প্রতিনিধি লইয়া ইহা আবার ১৯৫২ সালে পুনর্গঠিত হয়। সিল্কের উৎপাদনমূল্য কমাইবার জন্ত গুটিপোকা পালন ইত্যাদির কার্যও ইহার লক্ষ্যের মধ্যে আছে।

(ঙ) **দি কোয়ার বোর্ড (The Coir Board) :**—১৯৫৩ সালে কোয়ার দ্রব্যের ( নারিকেলের ছোবরা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন কার্পেট ইত্যাদি দ্রব্য ) উন্নতিসাধন এবং উহার রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত এই বোর্ড গঠিত হয়। ভারতবর্ষে কোয়ার দ্রব্য প্রচুর বৈদেশিক মূলধন আনে।

(ড) **রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (Rehabilitation Industries Corporation) :**—বাস্তহারাদের বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক, কাবিগরী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাহায্য প্রদান করা, এই শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যাপাবে সহায়তা করা এবং এই শিল্পে বাস্তহারাদের কর্মের সংস্থান করা ইহার অন্ততম কাজ। এই শিল্পে জন্ত Industrial Estate তৈয়ারী ও এই করপোরেশন করিয়া থাকে। এই সংস্থার অধীনে কতগুলি উৎপাদন কেন্দ্রে নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই সংস্থার অল্পমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা।

(এ) **ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (National Industrial Development Corpn.)**—ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে ইহার মূলধন দিয়া ১৯৫৪ সালে ইহা স্থাপন করেন। ইহার অল্পমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত (Paid-up) মূলধন

১০ লক্ষ টাকা। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যদি মুনাফা অর্জন করিতে অক্ষম হয় তবে এই করপোরেশন উহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবে ও অর্থসাহায্য করিবে। যখন উহা পুনরায় মুনাফা অর্জনে সক্ষম হইবে তখন এই করপোরেশন উহার পরিচালনাজিরা পুনরায় বেসরকারী হাতে ফিরাইয়া দিবে।

(৮) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation) :—এই সংস্থা বেসরকারী নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ করিবে এবং মূলধনের অভাবে যে সমস্ত শিল্প উন্নতি করিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দান করিবে। ইহার কাপাল সাধারণত বহুদায়তন শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা ২৫ কোটি টাকা অর্থিত মূলধন লইয়া ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়। বৈদেশিক মূলধনের সংগ্রহ ইহা মাধ্যমে হইবে। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ৫ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ২ কোটি টাকা, ভারতীয় জনসাধারণ ১ কোটি টাকা, ব্রিটিশ কমলওয়েলথ ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ১ কোটি টাকা এবং মার্কিন দেশ ৫০ লক্ষ টাকা দিয়াছে। ইহার কার্যকরী মূলধনের (Working Capital) জগ্ন মার্কিন সরকার ৭৫ কোটি টাকা, ভারত সরকার ৫ কোটি টাকা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ৫ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে।

(৯) রি-ফিন্যান্স করপোরেশন (Re-finance Corporation) :—২৫ কোটি টাকা অল্পমোদিত মূলধন লইয়া ১৯৫৮ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, লাইফইন্সিওরেন্স করপোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার ১২৫ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

শিল্পকে সরাসরি ঋণ দেওয়া ইহার কার্য নহে। তবে কোন ব্যাঙ্ক যদি মান্যকারী কোন বেসরকারী শিল্পকে আর্থিক সাহায্য নান্দীর্ঘ কালের জগ্ন দেয়, তবে এই করপোরেশন ঐ ব্যাঙ্ককে সমান পরিমাণ অর্থ ঋণ দিবে। কোন শিল্পকে কিভাবে ঋণ দিবে তাহা ব্যাঙ্কেই দ্রষ্টব্য। ব্যাঙ্ক যে ঋণ দিবে তাহা ব্যাঙ্কই আদায় করিবে এবং ব্যাঙ্ক এই করপোরেশনের নিকট হইতে যে ঋণ লইবে উহার জগ্ন ব্যাঙ্কই করপোরেশনের কাছে দায়ী থাকিবে।

(১০) ইণ্টার্ন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (International Finance Corpn.) :—দশ কোটি ডলার অল্পমোদিত মূলধন লইয়া

১৯৫৫ সালে ইহা গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রুটেন, স্কটল্যান্ড ও আর কতগুলি রাষ্ট্র ইহার মূলধন সরবরাহ করে। ইহার সভ্যদের মধ্যে যে সমস্ত দেশ অল্পকাল সেই সমস্ত দেশের বেসরকারী শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে আর্থিক ও সাহায্য দান করাই এই সংস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। যদিও এই সংস্থা ভারত সরকারের একক প্রচেষ্টায় গঠন করা হয় নাই তথাপি ভারতীয় শিল্পগুলি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবে।

**অগ্রাণু প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান—**আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য ছাড়াও সরকার অগ্রাণু বিভিন্ন প্রকারে শিল্পকে সাহায্য করে। নিম্নে উহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

(ক) **শিল্প সংরক্ষণ নীতি—**ভারতে ১৯২৩ সালে প্রথম শিল্প সংরক্ষণ নীতি প্রণীত হয়। এই নীতিতে শুধু সেই সমস্ত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণের (Protection) সুবিধা দেওয়া হইত যেগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মজুদ দেশের অভ্যন্তরেই পাওয়া যাইত এবং যেগুলিকে সংরক্ষণের সুবিধা দিলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ১৯২৯ সালে সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন করা হয়। এই নীতিতে প্রথমত, দেশের ক্ষতি সাময়িক প্রয়োজনের শিল্পগুলিকে যে-কোন ব্যয়েই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, ভিত্তিমূলক শিল্প (Basic Industry) ও অগ্রাণু শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে “টেরিফ কমিশন” কিছুকাল পর পর বিচার বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন বলিয়া এই নীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংরক্ষণ আমদানী শুল্ক (Protective Import Duty) অর্থাৎ সংরক্ষিত শিল্পের অনুরূপ বৈদেশিক শিল্পের দ্রব্যের উপর যে আমদানী শুল্ক আদায় করা হয় তাহা একটি তহবিলে জমা থাকিবে এবং তহবিল হইতে সংরক্ষিত শিল্পগুলিকে প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির কাছ হইতে উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হইবে না।

(খ) **মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থের বাজার—**শিল্পের সৃষ্টি ও প্রসার অর্থের বাজারের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। ভারতীয় মুদ্রা আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের (International Gold Standard) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাই ভারতীয় মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট হারে বিনিময়যোগ্য।

১৯৫৭ সালে ভারতীয় মুদ্রায় দশমিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় হিসাব ইত্যাদি সহজতর হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রামান স্থির রাখিবার জন্ত



সম্পূর্ণ দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া আছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণবীন। এইরূপ অসংহত মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থের বণ্টন শিল্প উন্নতির সহায়ক।

(গ) শিল্প বিষয়ক করের সুবিধা (Tax Allowance to Industries) শিল্প উন্নতির জন্ত করের সুবিধা দেওয়ার যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে ভারত সরকার অধ্যাপক কালডোবের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং শিল্পগুলিকে নিম্নলিখিত সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :—

(১) কতগুলি বিশেষ শিল্পের জন্ত আমদানিকৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হইবে।

(২) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্ত কোন দ্রব্যের উপর পানী শুল্ক হ্রাস অথবা রপ্তানী শুল্ক মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) বিক্রয় কর দুই তরফা আদায় করা হইবে না।

(৪) হুতন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আয়কর বাবদ সুবিধা দেওয়া হইবে।

(৫) আয়কর হইতে যন্ত্রপাতির অপচয় (Depreciation) বাদ দিয়া আয় কর আদায় করা হইবে।

(৬) কোন শিল্প মূলধন জাতীয় ব্যয় (Capital Expenditure) করিলে উহার বাবদ উন্নয়ন রিবেট (Development Rebate) দেওয়া হইবে।

(৭) শিল্পের প্রয়োজনে জনসাধারণের সঞ্চয়বৃদ্ধির জন্ত জনসাধারণের জীবনবীমার প্রিমিয়াম বাবদ আয়করের সুবিধা দেওয়া হইবে এবং গ্রাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, পোস্টাল সেভিংস, প্রাইজবণ্ড ইত্যাদি হইতে প্রাপ্য সুদ বা প্রাইজ-এর উপর আয়কর রহিত করা হইবে।

(ঘ) যানবাহন ব্যবস্থা—শিল্প বাণিজ্যে যানবাহনের সুবিধা না থাকিলে উহা কিছুতেই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দ্রব্য ভোগক্ষেত্রে বন্টনের জন্ত সর্ববিধ যানবাহনের প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশেই যানবাহনের ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে জাহাজ, রেলগাড়ী, বিমান ইত্যাদি সবকারী প্রচেষ্টায় তৈয়ারী হইয়া থাকে। মোটরগাড়ী ইত্যাদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হইতেছে।

(ঙ) পররাষ্ট্রে বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ ও বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি—নিম্নলিখিত বৈদেশিক বাণিজ্যের যুগে আমদানি রপ্তানির বেশীর ভাগ

সাধারণত বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই চুক্তিগুলি সাধারণত ঋণের ভিত্তিতে অথবা বিনিময়ের ভিত্তিতে (Barter) হইয়া থাকে।

রাজ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং বিদেশ হইতে আমদানি ব্যাপারে এই বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice) একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দূতের কার্য বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করা। প্রায় সবদেশেই ভারতবর্ষের বাণিজ্যদূত রহিয়াছে।

(৫) শিল্প সংস্কার (Rationalisation)—বৈদেশিক বাণিজ্যে অথবা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তাহাতে জয়লাভ করিতে হইলে শিল্পগুলিকে সংস্কার করিয়া আধুনিকতম উপায়ে উৎপাদন চালাই- প্রয়োজন। কিন্তু যে সমস্ত শিল্প প্রচুর মূলধন বিনিয়োগে অক্ষম সেই শিল্পগুলির সংস্কারও হইয়া কঠিন। অথচ এই শিল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি এমন শিল্প আছে যাহারা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে। সুতরাং সংস্কার সহযোগিতায় এই শিল্পগুলির সংস্কার হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে শিল্পের সর্কে সর্কে উৎপাদন প্রথা যান্ত্রিক পর্ধ্যয়ে চলিয়া যায়। কলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সরকারী সহযোগিতায় এই বাড়তি শ্রমিকের অগ্রত্ব কর্মস্থান করাইতে না পারিলে শিল্প সংস্কার করা ও অসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সরকার শিল্প সংস্কার ক্ষেত্রে আর্থিক ও বেকার সমস্যা সমাধানে শিল্পগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকে।

৮। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের সাহায্য শিল্পের নানাবিধ সহায়তা, উৎসাহদান ও নিয়ন্ত্রণ।

কোন দেশের শিল্প সমৃদ্ধির মূলে উহার সৃষ্ট পরিচালনা। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নানারূপ চুক্তি হইয়া থাকে। এই চুক্তি বিভিন্ন পক্ষ মানিয়া না চলিলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অচল হইয়া পড়ে ও উহাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং চুক্তিকারী বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে দেশে এমন কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হইয়া থাকে যাহাতে বিভিন্ন পক্ষ এই চুক্তি মানিয়া চলে। বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যও যাহাতে জনস্বার্থে চলে তাহার জন্তও আইন প্রণয়ন করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশীদার বা মালিকদের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্তও বিভিন্ন আইন সহায়তা করে। ভারতবর্ষের এই জাতীয় কতগুলি আইনের উল্লেখ নিম্নে করা হইল।

(ক) ভারতীয় চুক্তি আইন (১৮৭২) (Indian Contract Act 1872)—প্রস্তাব ও সম্মতিতে চুক্তির সৃষ্টি হয়। কে চুক্তি করিতে

পারে, কিভাবে চুক্তি সম্মাদিত হইলে উহা আইনের স্বীকৃতি লাভ করিবে, চুক্তি অমাত্র করিলে অপর পক্ষের কি অধিকার থাকে...ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এই চুক্তি আইনে আছে।

ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে চুক্তি আইন বিশেষ প্রয়োজন। ত্যেক ব্যবসায়ীরই এই আইন জানা থাকা প্রয়োজন।

(খ) ভারতীয় অংশীদারী কারবার আইন ( ১৯৩২ ) ( Indian Partnership Act, 1932 )—অংশীদারী কারবারে কমপক্ষে ২ জন ও সর্বাধিক ২০ জন ( ব্যাঙ্ক ব্যবসায় হইলে ১০ জন ) মালিক থাকে। তবে মালিকদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই ব্যবসা করিয়া লাভ ভাগ করিয়া নেওয়া এবং ঐ ব্যবসা চুক্তির মাধ্যমে সংগঠিত হওয়া চাই। অংশীদার ব্যবসায়ে সকল অংশীদারগণ একযোগে অথবা কোন অংশীদার অপরদের ব্যবসা চালাইতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তিদের নিকট অংশীদারদের দায়ের পরিমাণ অসীম ( Unlimited Liability )।

অংশীদারী কারবার আইনে, কে অংশীদার হইতে পারে, অংশীদারী কারবারের সৃষ্টি হইতে পারে, অংশীদারদের কর্তব্য, অধিকার, দায় ইত্যাদি এবং কিভাবে অংশীদারী কারবার ভাঙ্গা যায়...ইত্যাদি বিষয় বিশদ আলোচনা আছে। অংশীদারী কারবার রেজিস্ট্রী করার প্রয়োজন নাই। তবে রেজিস্ট্রী করিলে কতগুলি সুবিধা ভোগ করা যায় অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া গেলে কিভাবে উহার সম্পত্তি বন্টন হইবে সেই বিষয়ও এই আইনে আলোচনা আছে।

(গ) ভারতীয় কোম্পানী আইন ( Indian Companies Act)—যৌথ মূলধনী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্ত এই আইন সর্বপ্রথমে ১৮৬৬ সালে পাশ হয়। উহা উন্নবিংশ শতাব্দীতে ( ১৮৮২ ) একবার সংশোধিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯১৩ সালে ইহা এমন সংশোধিত হয় যে উহাকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নূতন আইন ও বলা চলে। পরে ১৯৩৬ সালে উহা আবার সংশোধিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই আইন পুনরায় এমনভাবে সংশোধিত হয় যে উহাকে অনেকে 'New Companies Act' আখ্যা দেন। ১৯৬০ সালে আবার উহা সংশোধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। যৌথ মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ। প্রচুর মূলধন লইয়া এই কোম্পানীগুলি গঠিত হয় কিন্তু উহার পরিচালনা ভার থাকে মুষ্টিমুখ কয়েকজন ডাইরেক্টরের উপর। এই আইন শেয়ার-হোল্ডারদের

স্বার্থ রক্ষা করে এবং কোম্পানীর উন্নতির সহায়তা করে। বর্তমান শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। তাই প্রচুর যৌথ মূলধনী কারবারের সৃষ্টি হইতেছে। শিল্প বাণিজ্যে জটিলতাও বাড়িতেছে। তাই এই আইনকে প্রয়োজি মধ্যে সংশোধন করিয়া যৌথ কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

(ঘ) **সম্প্রদেয় পত্র আইন (Negotiable Instrument Act)**— ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই আইন প্রথমে পাশ হয়। **বাণিজ্যবিল (Bill of Exchange)**, **অঙ্গীকার পত্র (Promissory Note)** এবং **চেক (Cheque)**—এই তিনটি ঋণ বিষয়ক পত্র (Credit Instrument) সম্প্রদেয় পত্র। তবে এই আইন দ্বারা স্বীকৃত। এই সম্প্রদেয় পত্রগুলির লেনদেন দ্বারা যাবতীয় বিষয় এই আইনে আলোচিত হইয়াছে।

(ঙ) **শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Industries Development and Regulation Act, 1951)**—১৯৫১ সালে ৪৫টি শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্ত এই আইন পাশ করা হয়। দেশের সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির জন্ত (Balanced Industrial growth) এই আইনের প্রয়োজন খুব বেশী। এই আইন ১৯৫২ সালের ৮ই মে হইতে বলবত হয়। ইহার আয়ত্বাধীন শিল্প সংখ্যা বর্তমানে ৭৯টি। এই আইন অনুসারে যে শিল্পগুলির নাম তালিকাভুক্ত আছে ঐগুলির অধীনে পুরাতন ও নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। এবং নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। তবে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি ১০ লক্ষ টাকার অধিক নহে তাহাদের লাইসেন্স করিবার প্রয়োজন বর্তমানে নাই। এই আইন অনুসারে ১৯৬১ সালের মধ্যে ১৯টি ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (Development Council) এবং একটি লাইসেন্সিং কমিটি গঠন করা হইয়াছে, শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্ত একটি গ্রাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (National Development Council) ও গঠন করা হইয়াছে।

(চ) **রাষ্ট্রীয় শিল্প সাহায্য আইন (State Aid to Industries Act)**—স্বাধীন ভারতে দ্রুত শিল্প উন্নয়নের উপযোগী মূলধন সরবরাহের জন্ত উপযুক্ত শিল্প ব্যাঙ্ক গঠিত হয় নাই। বাণিজ্য ব্যাঙ্কও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিতে অক্ষম। উপরন্তু বেসরকারী ব্যক্তিগত মূলধনেরও অভাব। তাই সরকার এই আইন পাশ করিয়া বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক

সাহায্য ও অন্যান্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। এই আইনের ভিত্তিতেই ফিনান্স করপোরেশনগুলির সৃষ্টি হয়।

(ছ) **Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956**—১৯৫৬ সালে Rural Credit Survey Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী এই আইন পাশ হয়। ইহার ভিত্তিতে National Co-operative Development and Warehousing Board গঠিত হয়, এই বোর্ড পরিকল্পনামূলক কার্য করিবে এবং মালগুদাম সংক্রান্ত তহবিল খরচ করিবার অধিকার ইহার থাকিবে। এই একই আইনের ভিত্তিতে Central Warehousing Corporation সৃষ্টি হয়। ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া গঠিত ৭ কর্পোরেশনের কার্যগুলি নিম্নরূপ :—

(১) কৃষিজাত দ্রব্যের বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণের সুবিধার জুড়ে দেশের মধ্যে অসংখ্য গুদাম তৈয়ারী করা।

(২) অল্প ব্যয়ে দ্রব্য গুদামজাত করিবার সুবিধা দান করা।

(৩) মাল গুদামজাত করিয়া রসিদ (Warehousing Receipt) প্রদান করা। এই রসিদ সম্প্রদায় পত্রের মত কাজ করিবে।

(Warehousing Receipt এর জামিনে ষ্টেট ব্যাঙ্ক সিভিলিউড ব্যাঙ্কগুলি অল্প সুদে এবং সহজেই অর্থ ঋণ দিবে)

(জ) **অন্যান্য আইন (Other Acts)** :—উপরিউক্ত আইনগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত আইনগুলি শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ প্রয়োজনে আসে—

(১) **কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন (Employees' State Insurance Act)**

(২) **ন্যূনতম মজুরী আইন (Minimum wages Act)**

(৩) **কারখানা আইন (Factories Act)**

(৪) **শিল্পবিরোধ আইন (Industrial Disputes Act)**

(৫) **শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act)**

(৬) **ভবিষ্যনিধি আইন (Provident Fund Act)**

(৭) **মজুরী প্রদান আইন (Payment of wages Act)**

(৮) **ট্রেড ইউনিয়ন আইন (Trade Union Act)**

(৯) **রেজিস্ট্রীকরণ আইন (Registration Act)**

- ১০) বীমা আইন ( Insurance Act )
- ১১) ব্যাংক কোম্পানী আইন ( Banking Companies Act )
- দেউলিয়া আইন ( Insolvency Act )
- সালিশী আইন ( Arbitration Act )
- (১৪) পণ্য বিক্রয় আইন ( Sale of Goods Act )
- (১৫) পণ্যবহন সংক্রান্ত আইন ( Carriage of goods Act )
- (১৬) এজেন্সী আইন ( Agency Act )
- (১৭) জামিনদারী আইন ( Bailment Act )
- (১৮) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ( Transfer of Property Act )
- (১৯) আয়কর আইন ( Income Tax Act )
- (২০) ক্রয় কর আইন ( Sales Tax Act )
- (২১) স্ট্যাম্প আইন ( Stamp Act )

..... ইত্যাদি।

### শিল্প-বাণিজ্য ও সরকারী বিভাগগুলি

(Industry & Trade and Govt. Departments.)

নীতি ও আইনকে কার্যকরী করার জন্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই আছে। বর্তমান প্রয়োজনে এই বিভাগগুলির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে কয়েকটি সরকারী বিভাগ ও দপ্তরের উল্লেখ করা হইল। ইহাদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে।

(ক) বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তর ( Ministry of Commerce and Industry )

শিল্পবাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা ও উহাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব এই বিভাগের উপর। এই বিভাগের কার্য এতই বেশী যে কতগুলি উপবিভাগের সাহায্য ছাড়া শুভভাবে ইহার কার্য সম্পাদন করা কঠিন। নিম্নে কয়েকটি উপবিভাগের নাম উল্লেখ করা হইল।

১। আমদানি উপদেষ্টা পরিষদ ( Import Advisory Council ) :—এই পরিষদের সুপারিশমত সরকার প্রতি ৬ মাস অন্তর আমদানি নীতি পরিবর্তন করেন। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই পরিষদ সরকারকে পরামর্শ দেয়।

## ২। রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (Export Advisory Council)

এই পরিষদের সুপারিশ মত সরকার প্রতি ৬ মাস অন্তর রপ্তানি নীতি পরিবর্তন করেন। রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে এই পরিষদ সরকারকে পরামর্শ দেয়।

চীফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট এণ্ড এক্সপোর্টস ( Chief Controller of Imports and Exports ) আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স দেওয়ার মালিক।

৩। শুল্ক কমিশন ( Tariff Commission ) :—কোন শিল্পের সংরক্ষণের ( protection ) প্রয়োজন হইলে এই বিভাগের নিকট আবেদন করে। এই বিভাগ ঐ আবেদন বিচার, বিবেচনা করিয়া কিস্তি কার্য্য করে।

৪। বিভিন্ন নিয়ামক বিভাগ ( Departments of Control ) :—আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা, দ্রব্যের উৎপাদন, দ্রব্যের মূল্য এবং মূল্য... ইত্যাদি নিয়ন্ত্রনের জন্ত বিভিন্ন নিয়ামক বিভাগ রহিয়াছে।

আমদানি-রপ্তানির জন্য Controller of Imports & Exports, বৈদেশিক মুদ্রার জন্ত Exchange Control Department, কাপড় ইত্যাদি উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য Textile Commissioner, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য Controller of Iron & Steel..... ইত্যাদি।

যে দ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সেই দ্রব্য পারমিটের মাধ্যমে স্ববন্টন করা নিয়ামক বিভাগের প্রধান কার্য্য।

## ৫। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কমিশন ( National Industrial Development Corp'n. ) :—

এই সংস্থা শিল্পে ঋণ দান, নূতন শিল্প স্থাপনের নীতি নির্ধারণ ও সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শিল্প সংস্কারে ( Rationalisation ) সাহায্য দান প্রভৃতি কার্য্য করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শিল্প সংস্কারের দায়িত্ব প্রধানত এই সংস্থার উপর দেওয়া আছে।

৬। জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ( National Small Scale Industries Corporation ) :—এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্য ছোট শিল্পে ঋণ দেওয়া, উহাদের ভাড়া খরিদ ( Hire purchase ) ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি দেওয়া, উহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যাপারে সাহায্য করা, উহাদের জন্য

সরকারী অর্ডার সংগ্রহ করা এবং উহাদের বসতির ভূমি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ( Industrial Estate ) তৈয়ারী করা।

**শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (Industrial Advisory Council) :**

যন্ত্রের বিভিন্ন নতুন শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এই পরিষদের কার্য।

৮। **ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিশনার ( Development Commissioner for Small Scale Industries ) :**—ক্ষুদ্র শিল্পে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন করাই ইহার কার্য। Small Scale Industries Service Institute এই বিভাগের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

৯। **লাইসেন্স কমিটি ( Licence Committee ) :**—নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার সরকারী লাইসেন্স প্রয়োজন। লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্ব লাইসেন্স কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

১০। **রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন ( State Trading Corporation ) :**—কোটি টাকা অমুমোদিত মূলধন লইয়া ইহা ১৯৫৬ সালে গঠিত হয়। পরে এই মূলধন ৫ কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এই সংস্থার কার্য বহির্দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা এবং অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করিয়া দেশের অভাব মিটান। দেশের অভ্যন্তরে অত্যাৱশ্যক দ্রব্য বন্টনের ব্যাপারে এই সংস্থা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **রপ্তানি ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন ( Export Risk Insurance Corporation ) :**—৫ কোটি টাকা অমুমোদিত মূলধন লইয়া ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইহার জন্ম হয়। ইহার কার্য রপ্তানি বাণিজ্যে বাকী বিক্রয়ের ঝুঁকির জামিন হওয়া। ঝুঁকির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলে রপ্তানি কারবারী রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

উপরি উক্ত উপবিভাগগুলি ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে আরও কতগুলি উপবিভাগ আছে—যেমন, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংস্থান বিভাগ ( Department of Commercial Intelligence and Statistics ) ইত্যাদি।

(খ) **অর্থমন্ত্রী দপ্তর ( Ministry of Finance ) :**—দেশের মুদ্রাব্যবস্থা, টাকার বাজার, ব্যাংক ব্যবসায়, সরকারী আয়, ব্যয় এবং কয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর। যে কোন দপ্তরের



পরিকল্পনায়ই যদি কোন আর্থিক দায় থাকে তবে উহা অর্থমন্ত্রীদের অমুমোদন ছাড়া কার্যকরী হইতে পারে না। অর্থমন্ত্রী দপ্তরে রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department), অর্থনীতি বিষয়ক বিভাগ (Department of Economic Affairs) এবং ব্যয় বিভাগ (Department of Expenditure)—এই তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। দেশের বাজেট এই দপ্তর বচনা করে। অর্থমন্ত্রী দপ্তরের প্রধান সহায়ক সংস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ইহার পরামর্শ অর্থমন্ত্রীদপ্তর সর্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকে। আমদানি, উৎপাদনকর (Excise) ইত্যাদি উপবিভাগগুলি অর্থমন্ত্রীদপ্তরেরই অন্তর্গত।

(গ) শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Labour & Employment) :—ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রমিক ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। এক পক্ষের স্বার্থে উহা চলিলে সংঘর্ষ অবশ্যই উহাতে শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই দপ্তর মালিকের স্বার্থও দেখে এবং শ্রমিকের স্বার্থও দেখে এবং উভয়ের মধ্যে শান্তি বজা রাখিবার জন্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। ন্যূনতম মজুরী আইন (Minimum wages Act), কারখানা আইন (Factories Act), শিল্প বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act), শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (worksmen's Compensation Act) ট্রেডইউনিয়ন আইন (Trade union Act), ইত্যাদি এই দপ্তরের প্রচেষ্টায়ই হইয়াছে। শ্রমিক বীমা আইন (Employees' state Insurance Act) এই দপ্তরের একটি উল্লেখ যোগ্য কীর্তি।

এই দপ্তরের আর একটি কার্য বেকারদের কর্মসংস্থান। বর্তমান চরম সমস্যার দিনে ইহা একটি অত্যাবশ্যক দপ্তর।

(ঘ) রেলওয়ে মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Railway) :—এই দপ্তর রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে দেশে নূতন রেলপথ নির্মাণ, রেলের ভাড় নির্ধারণ, বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াগন বন্টন এবং রেল সংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য করে। শিল্প বাণিজ্যে রেলওয়ের দান অসীম। উহা সাহায্য ছাড়া কোন দেশেই শিল্প বাণিজ্য অগ্রসর হয় না।

(ঙ) পরিবহন ও সংযোগরক্ষা মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Transport and Communication) :—পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন অফিস ইত্যাদি এই দপ্তরের অধীন। মোটর, জাহাজ ও বিমান পরিবহনও এই দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্যবসা বাণিজ্যে এইরূপ পরিবহন

বিশেষ প্রয়োজন। সরকার এই দপ্তরের মাধ্যমে সংযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহনের উন্নতি করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন বর্তমানে এই বিভাগের অধীন।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Natural Resources and Scientific Research) : দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার, উদ্ধার এবং সুব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কার ইত্যাদির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা এই দপ্তরের কার্য।

(ছ) শিক্ষা দপ্তর (Ministry of Education) : কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য পরিগরী শিক্ষার উন্নয়ন করিয়া শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যত প্রমিত পরিচালক সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা দপ্তর ব্যবসা বাণিজ্যকে সাহায্য করিতেছে।

শিল্প দপ্তরগুলি ছাড়াও আরোও অনেক বিভাগ গোণভাবে শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করে। ভারত সরকার ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর আছে। উহারা নিজ নিজ রাজ্যে অনুরূপ কার্য করিয়া থাকে। শিল্প বাণিজ্য ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র উন্নয়ন করিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা ভারত সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পরপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission), তাই, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির মূলে।

তবে আভ্যন্তরীণ শান্তি না থাকিলে কোন ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। তাই, আভ্যন্তরীণ শাসন মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Home Affairs) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া গোণভাবে শিল্প বাণিজ্যকে সর্বদা সাহায্য করিতেছে।

### Exercise

1. Discuss why state interference in Industry is necessary at the present times ?

(শিল্পে সরকারের হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে কেন প্রয়োজন তাহা আলোচনা কর)

2. What are the different methods by which state exerts influence over Industry and Trade?  
(কি কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সরকার শিল্প বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে?)
3. What do you know about Industrial policy of India?  
(ভারতের শিল্পনীতি সম্পর্কে কি জান?)
4. What is meant by Nationalisation? Put the arguments for and against Nationalisation.  
(জাতীয়করণ বলিতে কি বুঝায়? জাতীয়করণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।)
5. Discuss how the state encourages Private Enterprise. (Discuss in the context of Indian conditions.)  
(বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার কিভাবে উৎসাহ দেয় তত্ত্ব বর্ণনা কর। (ভারতের অবস্থার পটভূমিকায় আলোচনা কর  
(Hints—"9। বেসরকারী উদ্দমকে আর্থিক ও অগ্রপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান।" এই বিষয়টি লিখ।)
6. State how Trade and Industry may be encouraged by tax allowance.  
(করভার লাঘব করিয়া কিভাবে বাণিজ্য ও শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যায় তাহা উল্লেখ কর।)
7. Discuss in the context of Indian conditions the necessity of Laws in Industry and Trade and mention some of the important laws of India.  
(শিল্প বাণিজ্যে আইনের প্রয়োজন সম্পর্কে ভারতীয় অবস্থার পটভূমিকায় আলোচনা কর। এবং ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের উল্লেখ কর।)
8. Mention the different Govt. departments in India which render help to Industry and Trade.  
ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির উল্লেখ কর যাহারা শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করে।

- ৫ Write Notes on—(1) Industrial Finance Corpn.  
(2) Re-Finance Corpn.

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ও রি-ফিনান্স কর্পোরেশনের  
টীকা লিখ।

10. What do you know about—(1) Small scale Industries Corpn. (2) Rehabilitation Industries Corpn.

(স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ  
কর্পোরেশন সম্পর্কে কি জান ?)

---







